৪২ বর্ষ]   [বৈশাখ, ১৩৩১

স্বর্গীয়

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী

প্রতিষ্ঠিত

স্বর্গীয়

প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী

স্মৃতিরঞ্জিত

শ্রীফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী

সম্পাদিত

নব্যভারত কার্য্যালয়, ২১০৷৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ৩৲   প্রতি সংখ্যা ।০

"কুন্তলীন"

সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশতৈল কেন?

আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ ভারতের
সমস্ত বিখ্যাত প্রদর্শনীতে কেশতৈলের
উৎকর্ষের প্রতিযোগিতায়

কুন্তলীন

সর্ব্বদাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার
করিয়া পুরস্কার পাইয়া আসিতেছে

ইহাই কুন্তলীনের শ্রেষ্ঠতার যথেষ্ট প্রমাণ

১। ইহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত বলিয়া ইহাতে তৈলের স্বাভাবিক রজন, ক্ষার, অম্ল, মোম ও গন্ধক নাই। **এই জন্যই ইহার ব্যবহারে চুলের কোনওরূপ অনিষ্ট ও চুলে আঠা হয় না।**

২। ইহাতে 'কৃত্রিম গন্ধ' (Artificial perfume) নাই এবং সেইজন্য কোনওপ্রকার সীসা, পারা বা তার্পিণ তৈল নাই।

৩। ইহার ব্যবহারে চুলে জটা না হওয়ায় কেশ-বিন্যাসের সময় অযথা কেশ কমিয়া যায় না।

৪। সাধারণ কেশতৈলের ন্যায় ইহাতে বাজে **অপরিষ্কার** তৈল ব্যবহার করা হয় না। এই কারণে দুর্গন্ধ দূর করিবার **জন্য** কোনও প্রকার তীব্র গন্ধ ব্যবহার করার দরকার হয় না। **ইহার গন্ধের মধুরতা দুর্লভ।**

৫। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিবার ক্ষমতা 'কুন্তলীনের' বিশেষত্ব।

এইচ্‌. বসু, পারফিউমার

বৌবাজার, কলিকাতা

সূচী

সভ্যতার একটী মাপকাঠি—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	...	...		১
অনন্তআশ্রয়—শ্রীকামিনী রায়	...	...		৩
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস (Guizot)—শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ		...		৪
তরল বায়ু—শ্রীপ্রিয়দা রঞ্জন রায়	...	...		১৭
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	..	...		২৭
শিখ—শ্রীনির্ভয় সিংহ	...	...		৩২
অনন্তের সুরে (Trine)—শ্রীপ্রিয় রঞ্জন সেন ...	...	...		৪৩
গান্ধিজী—শ্রীশান্তিভূষণ দত্ত	...	...		৪৫
মহাত্মাগান্ধীর পত্র ...	...			৪৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শ্রীযুক্ত সুধীশ চন্দ্র পাল মহাশয় আমাদের অন্যতম এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

ম্যালেরিয়া সমস্যার প্রতিকার

যার তার পরামর্শে, যে সে ঔষধ সেবনে আপনার ম্যালেরিয়া আরাম হইবে না। আজ হইতেই আমাদের সর্ব্ববিধ জ্বর-নাশক ও ম্যালেরিয়ার **"অব্যর্থ"** প্রতিকারের **"ফেব্রিনা"** ব্যবহার করুন।

ফেব্রিনার ফল নিশ্চিত।

বড় বোতল ১৸০ ছোট ১৶০,

ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স লিঃ

কেমিষ্টস্ ও ড্রগিষ্টস্

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা টনিক

মহামারী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহৌষধ

অশ্বগন্ধাভিন

দুর্ব্বলের পক্ষে অমৃত

রাণাঘাট

কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

রাণাঘাট, বেঙ্গল

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

শ্রীফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী সম্পাদিত

ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,—৬৫ নং সার্পেন্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জনসাধারণের শত্রু—

আপনার খাদ্যের সহিত যে বিষ মেশায় সে আপনায় শত্রু! * ঠিক নহে? * আপনার পানীয়ের সহিত যে বিষ মেশায় সে আপনার শত্রু! ঠিক নহে? * পচাতেল, চর্ব্বি উগ্রক্ষার আর কতকগুলা কাদামাটির জগাখিচুড়িস্বরূপ বাজে সাবান যে বাহির করে সেও আপনার শত্রু? * ঠিক নহে? কেন না—তাহার সাবানে কাপড় কাচিলে কাপড় হাজিয়া পচিয়া যায়—গায়ে দিলে শরীরের চর্ম্ম জ্বলিয়া যায়।

*　　*　　*　　*

ওঃ সে কি অসহ্য যন্ত্রণা!

নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, পবিত্র সাবান প্রয়োজন?

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস লিঃ

প্রস্তুত

সমস্ত সাবানই অতুলনীয়

কাপড় কাচিতে—

"নির্ম্মলিন"

"শঙ্খ"

"বাঙালী পল্টন"

ও

"বক"

গায়ে মাখিতে—

"টার্কিশ বাথ"

"বকুল"

"ল্যাভেণ্ডার"

"হোয়াইট রোজ'

"চন্দন"

রোগনাশক—

"কার্ব্বলিক"

সূচী

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ	শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	২৪৩
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ	২৪৯
মাধ্বদর্শন	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ..	২৫৬
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৫
বাঙ্গালীর খাদ্যবিচার	শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় . .	২৭৩
হিন্দী সাহিত্য	শ্রীঅনাথনাথ বসু	২৮৩
কবিতার স্বরূপ	শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ..	২৪১

ম্যালেরিয়া সমস্যার প্রতিকার

যার তার পরামর্শে, যে সে ঔষধ সেবনে আপনার ম্যালেরিয়া আরাম হইবে না। আজ হইতেই আমাদের সর্ব্ববিধ জ্বর-নাশক ও ম্যালেরিয়ার "অব্যর্থ" প্রতিকারের "ফেব্রিনা" ব্যবহার করুন।

ফেব্রিনার ফল নিশ্চিত।

বড় বোতল ১৸০ ছোট ১৵০.

ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স লিঃ

কেমিষ্টস্ ও ড্রগিষ্টস

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা টনিক

মহামারী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহৌষধ

অশ্বাভিন

দুর্ব্বলের পক্ষে অমৃত

রাণাঘাট

কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

রাণাঘাট, বেঙ্গল

জ্বরের যম জারমল্লীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,—৬৫ নং সার্পেন্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম্‌ এ কাব্যতীর্থ

প্রণীত

১। বিবেকানন্দচরিত ... ... ।৵০

"Received with many, many thanks the brochure—Vivekananda Charita. It is so very interesting that I read the whole of it at a stretch....................The style of the work from start to finish is pure, elegant and vigorous ....Your review on the assets of Vivekananda in the last chapter of the book is highly laudable and instructive"—

From the Raja Bahadur, Feudatory State of Hindol.

২। আরোগ্য-দিগ্‌দর্শন

বা স্বাস্থ্যনীতি — মহাত্মাগান্ধীর মূল গুজরাতী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ॥০

"Prof. Sen in his lucid style has made the Bengali edition all the more interesting."—Amrita Bazar Patrika, March 25, 1923.

"বইখানির ভিতর সহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাহা সহজেই অনুসৃত হইতে পারে এবং দেহের ও মনের পুষ্টিসাধনের পক্ষে যাহাদের উপযোগিতাও কম নহে। .... আরোগ্য-দিগ্‌দর্শনের অনুবাদকের ভাষা ভাল—বেশ সহজ এবং প্রাঞ্জল, মোটেই অনুবাদের মত মনে হয় না।" প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৯।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, অথবা বিচিত্রা প্রেস, ৩১নং ব্রজনাথ দত্তের লেন, কলিকাতা।

পোলাও মূল্য ১।০

সুকবি বেনোয়ারীলাল প্রণীত। অর্দ্ধশিক্ষিতের জন্য ইহা নহে প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা মৃজাপুর লেন Universal Book Depot ও গাইবান্ধায় আমার নিকট। বঙ্গবাণী জাড়মাজড়িত ভাষায় গাল দিয়াছেন। বঙ্গবাণী হইতে মুক্ত দীনেশ অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক অক্ষয় বলেন "লোকে এখন পোলাও চায় না এখন লোক চায় চানাচুরররর" বঙ্গবাণী, মানসী ও বঙ্গবাসীতে তিনজন সাহিত্যরথ ইহার সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ করিয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ গোস্বামী।

গাইবান্ধা।

সূচী

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২৯৬
এলোরা	শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার	...	...	৩০৫
শিখ	শ্রীনির্ভয় সিংহ	...	...	৩১১
উপায় নির্দ্ধারণ	শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র	...	...	৩১৬
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ	...	...	৩২২
আমেরিকায়—সত্যদেব		...	...	৩২৭
জাতীয় কবি গোবিন্দদাস	শ্রীশিবরতন মিত্র	...	...	৩৩৬
সেকালের রাইয়ৎ	শ্রীবিনয়কুমার সরকার	...	...	৩৩৯

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা টনিক

মহামারী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহৌষধ

অশ্বাভিন

দুর্ব্বলের পক্ষে অমৃত

রাণাঘাট

কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌

রাণাঘাট, বেঙ্গল

তরুণভারত

(ইয়ং-ইণ্ডিয়া বঙ্গানুবাদ)

বার্ষিকমূল্য—২৲ ও ৩৲ টাকা।

কংগ্রেস কমিটী ও সাধারণ পাঠাগারের জন্য—১৷৹, ও জাতীয় বিদ্যালয়ের পক্ষে ১৲ টাকা।

তরুণভারত কার্য্যালয়,

চন্দন নগর।

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌,—৬৫ নং সার্পেন্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম্‌-এ কাব্যতীর্থ

প্রণীত

১। বিবেকানন্দচরিত ... ... ।/০

"Received with many, many thanks the brochure—Vivekananda Charita. It is so very interesting that I read the whole of it at a stretch.....................The style of the work from start to finish is pure, elegant and vigorous ....Your review on the assets of Vivekananda in the last chapter of the book is highly laudable and instructive."—

From the Raja Bahadur, Feudatory State of Hindol.

২। আরোগ্য-দিগ্‌দর্শন

বা মহাত্মাগান্ধীর মূল গুজরাতী

স্বাস্থ্যনীতি পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ॥০

"Prof. Sen in his lucid style has made the Bengali edition all the more interesting."—-Amrita Bazar Patrika, March 25, 1923.

"বইখানির ভিতর সহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাহা সহজেই অনুসৃত হইতে পারে এবং দেহের ও মনের পুষ্টিসাধনের পক্ষে যাহাদের উপযোগিতাও কম নহে। .... আরোগ্য-দিগ্‌দর্শনের অনুবাদকের ভাষা ভাল—বেশ সহজ এবং প্রাঞ্জল, মোটেই অনুবাদের মত মনে হয় না।" প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৯।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, অথবা বিচিত্রা প্রেস, ৩১নং ব্রজনাথ দত্তের লেন, কলিকাতা।

পোলাও মূল্য ১।০

সুকবি বেনোয়ারীলাল প্রণীত। অর্দ্ধশিক্ষিতের জন্য ইহা নহে প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা মৃজাপুর লেন Universal Book Depot ও গাইবান্ধায় আমার নিকট। বঙ্গবাণী জড়িমাজড়িত ভাষায় গাল দিয়াছেন। বঙ্গবাণী হইতে মুক্ত দীনেশ অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক অক্ষয় বলেন "লোকে এখন পোলাও চায় না এখন লোক চায় চানাচুর্‌র্‌র্" বঙ্গবাণী, মানসী ও বঙ্গবাসীতে তিনজন সাহিত্যরথ ইহার সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ করিয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ গোস্বামী।

গাইবান্ধা।

সূচী

মলিয়ার ও তাঁহার নাট্য প্রতিভা	শ্রীকালিদাস নাগ	...	...	৩৪১
বাঙ্গালীর আশুতোষ	শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ	...	...	৩৪৬
সেকালের রাইয়ৎ	শ্রীবিনয়কুমার সরকার	...	...	৩৫৭
স্বামী রামতীর্থ	তীর্থসেবক	...	...	৩৫৬
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ	...	...	৩৭৪
উড়িয়া মন্দির	শ্রীনির্ম্মল কুমার বসু	...	...	৩৮০
পুস্তক পরিচয়		...	...	৩৮২

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা টনিক

মহামারী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহৌষধ

অশ্বাভিন

দুর্ব্বলের পক্ষে অমৃত

রাণাঘাট

কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌

রাণাঘাট, বেঙ্গল

তরুণভারত

(ইয়ং-ইণ্ডিয়া বঙ্গানুবাদ)

বার্ষিকমূল্য—২৲ ও ৩৲ টাকা।

কংগ্রেস কমিটী ও সাধারণ পাঠাগারের জন্য—১॥০, ও জাতীয় বিদ্যালয়ের পক্ষে ১৲ টাকা।

তরুণভারত কার্য্যালয়,

চন্দন নগর।

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌,—৬৫ নং সার্পেন্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম্‌ এ কাব্যতীর্থ

প্রণীত

১। বিবেকানন্দচরিত ... ... ।/০

"Received with many, many thanks the brochure—Vivekananda Charita. It is so very interesting that I read the whole of it at a stretch....................The style of the work from start to finish is pure, elegant and vigorous ....Your review on the assets of Vivekananda in the last chapter of the book is highly laudable and instructive."—

From the Raja Bahadur, Feudatory State of Hindol.

২। আরোগ্য-দিগ্‌দর্শন

বা মহাত্মাগান্ধীর মূল গুজরাতী

স্বাস্থ্যনীতি পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ॥০

"Prof. Sen in his lucid style has made the Bengali edition all the more interesting."——Amrita Bazar Patrika, March 25, 1923.

"বইখানির ভিতর সহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাহা সহজেই অনুসৃত হইতে পারে এবং দেহের ও মনের পুষ্টিসাধনের পক্ষে যাহাদের উপযোগিতাও কম নহে। .... আরোগ্য-দিগ্‌দর্শনের অনুবাদকের ভাষা ভাল—বেশ সহজ এবং প্রাঞ্জল, মোটেই অনুবাদের মত মনে হয় না।" প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৯।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, অথবা বিচিত্রা প্রেস, ৩১নং ব্রজনাথ দত্তের লেন, কলিকাতা।

পোলাও মূল্য ১।০

সুকবি বেনোয়ারীলাল প্রণীত। অর্দ্ধশিক্ষিতের জন্য ইহা নহে প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা মৃজাপুর লেন Universal Book Depot ও গাইবান্ধায় আমার নিকট। বঙ্গবাণী জড়িমাজড়িত ভাষায় গাল দিয়াছেন। বঙ্গবাণী হইতে মুক্ত দীনেশ অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক অক্ষয় বলেন "লোকে এখন পোলাও চায় না এখন লোক চায় চানাচুর্‌র্‌র্‌" বঙ্গবাণী, মানসী ও বঙ্গবাসীতে তিনজন সাহিত্যরথ ইহার সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ করিয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ গোস্বামী।

গাইবান্ধা।

বাংলার কথা-সাহিত্য

কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের

* * * * *

বাংলার বুকের গান

ঠাকুরমার ঝুলি * ঠানদিদির থলে

*

রাজার গান

*

চাষার গান

এত বড় স্বদেশী
আর কি আছে?

— রবীন্দ্রনাথ —

* * *

*

বুড়ার গান

*

শিশুর গান

বাংলার
মায়ের গান

*

ঠাকুরদাদার = ঝুলি =

দাদামশায়ের = থলে =

*

*

- সকল বাংলা -

'HAS MARKED OUT AN EPOCH IN OUR LITERATURE'

The Bande-Mataram

—AUROBINDO—

স্ত্রীর গান

* * *

যুবার গান

বাংলার স্বপ্নপুরী—ঠাকুরমার ঝুলি—১॥০

বাংলার ভোরের পদ্ম

দাদামশায়ের থলে—১॥০

বাংলার পবিত্র বই—ঠানদিদির থলে—১॥০

বাঙালীর মায়ের শঙ্খরব

ঠাকুরদাদার ঝুলি—২৲

বাঙালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা

—কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের বাংলার কথা-সাহিত্য—

৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট—আশুতোষ লাইব্রেরী—কলিকাতা

সূচী

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ	..	...	৩৮৫
সেকালের রাইয়ৎ	শ্রীবিনয়কুমার সরকার		...	৩৯৬
হিন্দুর ধর্ম্ম সাহিত্য	শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	..	...	৪০৩
যবক্ষারজানের জন্মান্তর রহস্য	শ্রীপ্রিয়দা রঞ্জন রায়	...	...	৪১০
দর্শনের কথা	শ্রীরাসবিহারী দাস	...	...	৪১৪
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	৪২২

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা টনিক

মহামারী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহৌষধ

অশ্লাভিন

দুর্ব্বলের পক্ষে অমৃত

রাণাঘাট'

কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌

রাণাঘাট, বেঙ্গল

তরুণভারত

(ইয়ং-ইণ্ডিয়া বঙ্গানুবাদ)

বার্ষিকমূল্য—২৲ ও ৩৲ টাক।

কংগ্রেস কমিটী ও সাধারণ পাঠাগারের জন্য—১৷৹, ও জাতীয় বিদ্যালয়ের পক্ষে ১৲ টাকা।

তরুণভারত কার্য্যালয়,

চন্দন নগর।

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাংলার কথা-সাহিত্য

কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের

* * * * *

বাংলার বুকের গান

ঠাকুরমার ঝুলি * **ঠানদিদির থলে**

রাজার গান

চাষার গান

এত বড় স্বদেশী
আর কি আছে?
— রবীন্দ্রনাথ —

* * *

বুড়ার গান

শিশুর গান

বাংলার

মায়ের গান

*

ঠাকুরদাদার ঝুলি **দাদামশায়ের থলে**

* *

- সকল বাংলা -

'HAS MARKED OUT AN EPOCH IN OUR LITERATURE'

The Bande-Mataram

—**AUROBINDO**—

স্ত্রীর গান * * * যুবার গান

বাংলার স্বপ্নপুরী—ঠাকুরমার ঝুলি—১॥০

বাংলার ভোরের পদ্ম

দাদামশায়ের থলে—১॥০

বংলার পবিত্র বই—ঠানদিদিব থলে—১॥০

বাঙালীর মাযের শঙ্খরব

ঠাকুরদাদার ঝুলি—২৲

আরগেবাঙালীররবপ্রতিষ্ঠৌঙ্গা

—কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের বাংলার কথা-সাহিত্য—

৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট—আশুতোষ লাইব্রেরী—কলিকাতা

সূচী

বৌদ্ধজ্ঞানে উপনিষদের প্রভাব	শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য	...	...	৪২৯
সাম্প্রদায়িক বিরোধ	শ্রীপ্রিয়দা রঞ্জন রায়	...	...	৪৩৯
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ	...	...	৪৪৫
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	৪৫৬
বৈদিকজাতি বা বর্ণতত্ত্ব	শ্রীদ্বিজদাস দত্ত	...	...	৪৮০

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা টনিক

মহামারী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহৌষধ

অশ্বাভিন

দুর্ব্বলের পক্ষে অমৃত

রাণাঘাট

কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌

রাণাঘাট, বেঙ্গল

শ্রীঅনাথনাথ বসুর

মীরাবাঈ

মূল্য এক টাকা।

কারাকাহিনী

(দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মাজীর অভিজ্ঞতার বঙ্গানুবাদ)

মূল্য ৷৷০ মাত্র

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা।

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

কালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাংলার কথা-সাহিত্য
কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের

= বাংলার বুকের গান =

ঠাকুরমার ঝুলি * ঠানদিদির থলে

এত বড় স্বদেশী আর কি আছে?

— রবীন্দ্রনাথ —

রাজার গান

চাষার গান

বুড়ার গান

শিশুর গান

বাংলার মায়ের গান

ঠাকুরদাদার = ঝুলি =

দাদামশায়ের = থলে =

- সকল বাংলা -

'HAS MARKED OUT AN EPOCH IN OUR LITERATURE'

The Bande-Mataram

—AUROBINDO—

স্ত্রীর গান

যুবার গান

বাংলার স্বপ্নপুরী—ঠাকুরমার ঝুলি—১॥০

বংলার পবিত্র বই—ঠানদিদির থলে—১॥০

বাংলার ভোরের পদ্ম দাদামশায়ের থলে—১॥০

বাঙালীর মায়ের শঙ্খরব ঠাকুরদাদার ঝুলি—২৲

বাঙালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা

কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের বাংলার কথা-সাহিত্য

৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট—আশুতোষ লাইব্রেরী—কলিকাতা

সূচী

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	৪৮১
হিন্দু মুসলমান সমস্যা	ঐ	৪৮৭
স্বামী রামতীর্থ	তীর্থ সেবক	৪৯৪
হীরকের সৃষ্টিতত্ত্ব	শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়	৪৯৯
মহাভারত মঞ্জরীর সমালোচনার প্রতিবাদ	শ্রীঅক্ষয় কুমার পাল	৫০২
আঁধারের যাত্রী	শ্রীজীবনময় রায়	৫০৮
আমেরিকার লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের অভ্যুদয়	শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকার ...	৫১০
হিমালয়	শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ বসু	৫১৩
পুস্তক পরিচয়	... ...	৫১৪
জাতীয় শিক্ষা (অতিরিক্ত পত্র)	... ...	১
জন্মনিয়ন্ত্রণ ,,	... ...	৪
চয়ন	... ...	৬

স্বদেশী ও জাতীয়তা—পাতিত্য সমস্যা ও অসবর্ণ বিবাহ—অস্পৃশ্যতা ও বর্ণভেদ—আন্তর্বর্ণ্য ভোজন।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা টনিক

মহামারী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহৌষধ

অশ্বাভিন

দুর্ব্বলের পক্ষে অমৃত

রাণাঘাট

কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌

রাণাঘাট, বেঙ্গল

শ্রীঅনাথনাথ বসুর

মীরাবাঈ

মূল্য এক টাকা।

কারাকাহিনী

(দক্ষিণ আফ্রিকা মহাত্মাজী অভিজ্ঞতার বঙ্গানুবাদ)

মূল্য ॥০ মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

প্লট নং ৪, কালীঘাট পোঃ।

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী

মধ্বাচার্য্য—শ্রীঅমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ ৪৯

প্রাচীনবাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী জীবনের ছায়াপাত—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ ৫৪

নয়নিকা—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা ৬২

প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদ—শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার ... ৬৩

যুগসমস্যা—শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল ৬৫

গুজরাত বিদ্যাপীঠ—শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার ৭৩

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস—শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ ... ৭৭

ইরোকোয়াদের গোষ্ঠী প্রথা—শ্রীবিনয় কুমার সরকার .. ৮৮

ম্যালেরিয়া সমস্যার প্রতিকার

যার তার পরামর্শে, যে সে ঔষধ সেবনে আপনার ম্যালেরিয়া আরাম হইবে না। আজ হইতেই আমাদের সর্ব্ববিধ জ্বর-নাশক ও ম্যালেরিয়ার "অব্যর্থ" প্রতিকারের "ফেব্রিনা" ব্যবহার করুন।

ফেব্রিনার ফল নিশ্চিত।

বড় বোতল ১৸০ ছোট ১৷৵০,

ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স লিঃ

কেমিষ্টস্ ও ড্রগিষ্টস্

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা টনিক

মহামারী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহৌষধ

অশ্বাভিন

দুর্ব্বলের পক্ষে অমৃত

রাণাঘাট

কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

রাণাঘাট, বেঙ্গল

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

শ্রীফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী সম্পাদিত

কালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,—৬৫ নং সার্পেন্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রবর্ত্তক

সম্পাদক—শ্রীমতিলাল রায়

মাঘ মাস হইতে নববর্ষ আরম্ভ হইল। প্রতিসংখ্যায় চিত্রসংযুক্ত প্রবর্ত্তকসঙ্ঘের কার্য্য বিবরণ ও জাতিগঠনের অনুকূল ঘটনার চিত্র, সচিত্র বাহির হইতেছে। এই আট বৎসরে শুধু বাংলা নয় প্রবর্ত্তকের আদর্শ সারাভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

প্রবর্ত্তকের ছত্রে ছত্রে জাতিগঠনের অভ্রান্ত কর্ম্ম নির্দ্দেশ প্রকাশিত হয়।

সঙ্ঘ সৃষ্টির নিগূঢ়মন্ত্র প্রবর্ত্তকের স্বরূপ।

নির্ম্মাণযুগে প্রবর্ত্তক জাতির কর্ণধার

বার্ষিক মূল্য—৩৷৵৹

প্রতিসংক্রান্তিতে বাহির হয়।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস

চন্দন নগর

অদ্ভুত দৈবশক্তি সম্পন্ন মহৌষধ

আমেরিকার সেই বিখ্যাত **ভেনোলা** পুনরায় ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন। নচেৎ বিলম্বে হতাশ হইবেন। প্রত্যহ হাজার হাজার লোক সারিয়া যাইতেছে। ইহাতে যে কোন প্রকারের নূতন ও পুরাতন রোগ হউক না কেন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন। বিশেষতঃ নালী ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারের দূষিত ঘায়ের বিষ নষ্ট করিতে ইহা একমাত্র অদ্বিতীয়। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে আমাদের এই ঔষধে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় না হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিব এবং তজ্জন্য আমরা গ্যারাণ্টি পর্য্যন্ত দিয়া থাকি। প্রত্যেক কৌটার অগ্রিম মূল্য ৪৷৷৹ অথবা ভিঃ পিঃ। সবিশেষ জানিবার জন্য ৵৹ ডাক টিকিট সহ জে, এন, হ্যারিসন এণ্ড কোং কলিকাতা ও বম্বে পোষ্ট বক্স ৪১৮ অনুসন্ধান করুন। সকল প্রকার গৃহশিল্পের ফল আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি। মহিলাদের জন্য চিকনের কল অগ্রিম মূল্য ১২৷৷৹ অথবা ভি পি।

যদি জীবন যুদ্ধে জয়ী হ'তে চান

তাহলে কার্ত্তিক চন্দ্র বসু

সম্পাদিত

স্বাস্থ্য সমাচার

নামক সচিত্র মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হবার জন্য আজই পত্র লিখুন। ১৫ দিনের মধ্যে পত্র লিখিলে এই কাগজের গ্রাহকদের বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হবে। ৩২ শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ২৲ পাঠিয়ে গ্রাহক হ'লে ৩ খানি বিশেষ উপহারের টিকিট ও একখানি সুবৃহৎ যুগপ্রবর্ত্তক নূতন ধরণের "স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকা" বিনামূল্যে উপহার পাবেন। এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না।

কার্য্যাধ্যক্ষ "স্বাস্থ্য সমাচার"

৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

যোগদর্শনে চিত্ত—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	..	...	৯৯
গুজরাত বিদ্যাপীঠ—শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার	..	...	১০৫
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস—শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ		...	১০৮
ইরোকোআদের গোষ্ঠীপ্রথা—শ্রীবিনয় কুমার সরকার		...	১১২
স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরী—শ্রীবিধুভূষণ দত্ত	...	...	১১৭
যুগসমস্যা—শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল	...	...	১২০
প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদ—শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার		...	১২৪
বিপদে—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ	...	...	১২৮
স্বর্গীয় রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীসুন্দরী মোহন দাস		..	১২৯
স্বর্গীয় সার আশুতোষ চৌধুরী—শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী		..	১৩০
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—শ্রীসত্যব্রত বর্ম্মা		...	১৩৪
পরলোকে আশুতোষ—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	..	..	১৩৮
সঙ্কলিকা—	..	.	১৪২

ম্যালেরিয়া সমস্যার প্রতিকার

যার তার পরামর্শে, যে সে ঔষধ সেবনে আপনার ম্যালেরিয়া আরাম হইবে না। আজ হইতেই আমাদের সর্ব্ববিধ জ্বর নাশক ও ম্যালেরিয়ার **"অব্যর্থ"** প্রতিকারের **"ফেব্রিনা"** ব্যবহার করুন।

ফেব্রিনার ফল নিশ্চিত।

বড় বোতল ১৷৹ ছোট ১৶৹,

ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স লিঃ

কেমিষ্টস্ ও ড্রগিষ্টস্

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইন্ফ্লুয়েঞ্জা টনিক

মহামারী ইন্ফ্লুয়েঞ্জার মহৌষধ

অশ্বগন্ধিন

দুর্ব্বলের পক্ষে অমৃত

রাণাঘাট

কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

রাণাঘাট, বেঙ্গল

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

জনসাধারণের শত্রু—

আপনার খাদ্যের সহিত যে বিষ মেশায় সে আপনায় শত্রু! * ঠিক নহে? * আপনার পানীয়ের সহিত যে বিষ মেশায় সে আপনার শত্রু! ঠিক নহে? * পচাতেল, চর্ব্বি উগ্রক্ষার আর কতকগুলা কাদামাটির জগাখিচুড়িস্বরূপ বাজে সাবান যে বাহির করে সেও আপনার শত্রু? * ঠিক নহে? কেন না—তাহার সাবানে কাপড় কাচিলে কাপড় হাজিয়া পচিয়া যায়—গায়ে দিলে শরীরের চর্ম্ম জ্বলিয়া যায়।

* * * *

ওঃ সে কি অসহ্য যন্ত্রণা!

নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, পবিত্র সাবান প্রয়োজন?

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস লিঃ

প্রস্তুত

সমস্ত সাবানই অতুলনীয়

কাপড় কাচিতে—

"নির্ম্মলিন"

"শঙ্খ"

"বাঙালী পল্টন"

ও

"বক"

গায়ে মাখিতে—

"টার্কিশ বাথ"

"বকুল"

"ল্যাভেণ্ডার"

"হোয়াইট রোজ"

"চন্দন"

রোগনাশক—

"কার্ব্বলিক"

সূচী

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়		...	১৪৫
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস—শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ		...	১৫৪
অজন্তা—শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার	...	...	১৫৮
দুর্দ্দম—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	...	...	১৬১
ভাষা সমস্যা—শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়	...	...	১৬১
কবিতার স্বরূপ—শ্রীসমীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়		...	১৬৬
চিন্তা—শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ	...	...	১৬৮
বাইবেল ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম—শ্রীধীরেন্দ্র কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়		...	১৬৯
বংশানুক্রম—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী	...	...	১৭৬
ব্যর্থ—	...	...	১৮৫
সঙ্কলিকা—	...	...	১৮৫

ম্যালেরিয়া সমস্যার প্রতিকার

যার তার পরামর্শে, যে সে ঔষধ সেবনে আপনার ম্যালেরিয়া আরাম হইবে না। আজ হইতেই আমাদের সর্ব্ববিধ জ্বর-নাশক ও ম্যালেরিয়ার "অব্যর্থ" প্রতি-কারের "ফেব্রিনা" ব্যবহার করুন।

ফেব্রিনার ফল নিশ্চিত।

বড় বোতল ১৷৵০ ছোট ১৷৵০,

ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স লিঃ

কেমিষ্টস্ ও ড্রগিষ্টস্

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা টনিক

মহামারী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহৌষধ

অশ্বাভিন

দুর্ব্বলের পক্ষে অমৃত

রাণাঘাট

কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

রাণাঘাট, বেঙ্গল

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

জনসাধারণের শত্রু—

আপনার খাদ্যের সহিত যে বিষ মেশায় সে আপনায় শত্রু! * ঠিক নহে? * আপনার পানীয়ের সহিত যে বিষ মেশায় সে আপনার শত্রু! ঠিক নহে? * পচাতেল, চর্ব্বি উগ্রক্ষার আর কতকগুলা কাদামাটির জগাখিচুড়িস্বরূপ বাজে সাবান যে বাহির করে সেও আপনার শত্রু! * ঠিক নহে? কেন না—তাহার সাবানে কাপড় কাচিলে কাপড় হাজিয়া পচিয়া যায়—গায়ে দিলে শরীরের চর্ম্ম জ্বলিয়া যায়।

* * * *

ওঃ সে কি অসহ্য যন্ত্রণা!

নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, পবিত্র সাবান প্রয়োজন?

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস লিঃ

প্রস্তুত

সমস্ত সাবানই অতুলনীয়

কাপড় কাচিতে—

"নির্ম্মলিন"

"শঙ্খ"

"বাঙ্গালী পল্টন"

ও

"বক"

গায়ে মাখিতে—

"টার্কিশ বাথ"

"বকুল"

"ল্যাভেণ্ডার"

"হোয়াইট রোজ"

"চন্দন"

রোগনাশক—

"কার্ব্বলিক"

সূচী

চীন ও জাপানে ভারতের বাণী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	১৯৩
অজন্তা	শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার	...	...	২০৩
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ	...	...	২০৭
ব্যাঘ্রধর্ম্ম	শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ	...	...	২১৩
পুস্তক পরিচয়	স্বাধ্যায়ার্থী	...	...	২২০
স্বর্গীয় আশুতোষ	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	...	...	২২৯
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২৩৪
নারীর কর্ত্তব্য	শ্রীশ্যামমোহিনী দেবী	...	...	২৪১

ম্যালেরিয়া সমস্যার প্রতিকার

যার তার পরামর্শে, যে সে ঔষধ সেবনে আপনার ম্যালেরিয়া আরাম হইবে না। আজ হইতেই আমাদের সর্ব্ববিধ জ্বর-নাশক ও ম্যালেরিয়ার "অব্যর্থ" প্রতিকারের "ফেব্রিনা" ব্যবহার করুন।

ফেব্রিনার ফল নিশ্চিত।

বড় বোতল ১৸০ ছোট ১৶০.

ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স লিঃ

কেমিষ্টস্ ও ড্রগিষ্টস্

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা টনিক

মহামারী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহৌষধ

অপ্রাভিন

দুর্ব্বলের পক্ষে অমৃত

রাণাঘাট

কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

রাণাঘাট, বেঙ্গল

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম্‌ এ কাব্যতীর্থ

প্রণীত

১। বিবেকানন্দচরিত ... ... ।৵

"Received with many, many thanks the brochure—Vivekananda Charita. It is so very interesting that I read the whole of it at a stretch....................The style of the work from start to finish is pure, elegant and vigorous ....Your review on the assets of Vivekananda in the last chapter of the book is highly laudable and instructive."—

From the Raja Bahadur, Feudatory State of Hindol.

২। আরোগ্য-দিগ্‌দর্শন

বা মহাত্মাগান্ধীর মূল গুজরাতী

স্বাস্থ্যনীতি পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ॥০

"Prof. Sen in his lucid style has made the Bengali edition all the more interesting."—–Amrita Bazar Patrika, March 25, 1923.

"বইখানির ভিতর সহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাহা সহজেই অনুসৃত হইতে পারে এবং দেহের ও মনের পুষ্টিসাধনের পক্ষে যাহাদের উপযোগিতাও কম নহে। .... আরোগ্য-দিগ্‌দর্শনের অনুবাদকের ভাষা ভাল—বেশ সহজ এবং প্রাঞ্জল, মোটেই অনুবাদের মত মনে হয় না।" প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৯।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, অথবা বিচিত্রা প্রেস, ৩১নং ব্রজনাথ দত্তের লেন, কলিকাতা।

পোলাও মূল্য ১।০

সুকবি বেনোয়ারীলাল প্রণীত। অর্দ্ধশিক্ষিতের জন্য ইহা নহে প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা মৃজাপুর লেন Universal Book Depot ও গাইবান্ধায় আমার নিকট। ·বঙ্গবাণী জড়িমাজড়িত ভাষায় গাল দিয়াছেন। বঙ্গবাণী হইতে মুক্ত দীনেশ অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক অক্ষয় বলেন "লোকে এখন পোলাও চায় না এখন লোক চায় চানাচুর্‌র্‌র্‌" বঙ্গবাণী, মানসী ও বঙ্গবাসীতে তিনজন সাহিত্যরথ ইহার সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ করিয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ গোস্বামী।

গাইবান্ধা।

মহাত্মা গান্ধী—১৮৭৮ খৃঃ অব্দে

মহাত্মা গান্ধী

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] বৈশাখ, ১৩৩১ [১ম সংখ্যা

সভ্যতার একটি মাপকাঠি।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে, প্রাতে গোলদিঘি পরিক্রমণ আমার দৈনিক কাজের মধ্যে ছিল। তখন যাঁহাদের সঙ্গে বেড়াইতাম, তাঁহারা অনেকে এখনও সেখানে বেড়ান, আমার যাওয়া প্রায় ঘটিয়া উঠে না।

সেই আগেকার দিনে যখন একদিন বেড়াইতেছিলাম, তখন দেখিলাম, একটি ছেলে বার বার গোলদিঘি পরিক্রমণ করিতেছে। তাহাকে তাহার আগেও ঐখানে অনেক বার দেখিয়াছিলাম। ছেলেটির পরিধানে ছিল চুড়িদার পায়জামা ও কোট, এবং মাথায় একটি দেশী টুপি। তাহার নীচে হইতে ঈষৎ লম্বা চুল ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের ভ্রমণের সঙ্গী একজন থামিয়া কিছুক্ষণ তাহার সহিত তাহার পিতার ও তাহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ইত্যাদি নানা কথা ইংরাজীতে কহিলেন। তাহাতে বুঝিলাম, ছেলেটি বাঙ্গালী নয়;—অবশ্য তাহার পোষাকেও আগেই তাহা অনুমান করিয়াছিলাম।

তাহার পর ছেলেটির ও আমাদের বেড়ান আবার আরম্ভ হইল। তখন যিনি তাহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, ঐ ছেলেটি ছেলে না মেয়ে?" এরূপ প্রশ্নে স্বভাবতই বিস্মিত হইলাম, এবং কৌতূহলেরও উদ্রেক হইল। প্রশ্নকর্ত্তা নিজেই উত্তর দিলেন, "ওটি মেয়ে। উহার পিতা দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা ও মত প্রভৃতি তিনি সাক্ষাৎভাবে অবগত হইতে চান"। একথাও সম্ভবতঃ আমাদের ভ্রমণসহচর বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আমার এখন ঠিক্ মনে নাই, যে, মেয়েটির মাতা জীবিত নাই। যাহাই হউক, তাঁহার নিকট অবগত হইলাম, যে, মেয়েটির পিতা তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া স্বয়ং তাহার শিক্ষকের কাজ করেন। আমি তাঁহাকে ঐ মেয়েটিকে ও তাহার বড় ভাইকে গোলদিঘির দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণের ঘাসের উপর বসিয়া শিক্ষা দিতে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার নাম যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা এখনও মনে আছে, কিন্তু তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি একবার আমার সহিত সাক্ষাৎও করিয়াছিলেন।

মেয়েটি বড় হইয়াছিল, কিন্তু তখনও বিবাহিতা হয় নাই। তাহাকে সঙ্গে রাখাও দরকার। প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যাকে লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন কাজ; বিশেষতঃ সাধারণ গৃহস্থ লোকদের পক্ষে সেই জন্য কন্যাটির পিতা এবিষয়ে নিরুদ্বেগ হইবার নিমিত্ত তাহাকে ছেলে সাজাইয়া সঙ্গে রাখিতেন। ছেলের মত নিঃশঙ্ক চলাফিরায় অভ্যস্ত হওয়ায় মেয়েটিকে মেয়ে বলিয়া বুঝা যাইত না। যখন জানিতে পারিলাম, যে, সেটি মেয়ে, তখনও তাহাকে বালকই মনে হইতে লাগিল।

সম্ভবতঃ অনেকে এই কন্যার পিতাকে ছিটওয়ালা বা খেয়ালী লোক মনে করিবেন। তাহা করুন; সে বিষয়ের আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল সকলকে মনে মনে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিজেই মনে মনে তাহার উত্তর দিতে অনুরোধ করিতেছি, যে, বাংলা দেশে নির্ধন পিতার পক্ষে দেশভ্রমণকালে প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যাকে ছেলে সাজাইয়া সঙ্গে রাখিবার প্রয়োজন কেন হইল? পাশ্চাত্য দেশসকলের কথা তুলিতে চাই না, কারণ আমাদের দেশে এখনও এই মতই প্রবল, যে, পাশ্চাত্য সমাজ বড় খারাপ এবং আমাদের সমাজ বড় ভাল কিন্তু ভারতবর্ষেরই কোন কোন প্রদেশের কথা ভাবিতে বলি, যেখানে বাংলা বিহার আগ্রা অযোধ্যা অপেক্ষা নারীদের বেশী স্বাধীনতা আছে। মহারাষ্ট্রে কোন নির্ধন পিতার কন্যাকে ছেলে সাজাইবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হইত না, কারণ সেখানে অবগুণ্ঠনমুক্ত কোন তরুণী, প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাকে বাড়ীর বাহিরে দেখিলে তাঁহার সম্ভ্রান্ততা বা ভদ্রতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন মনে আসে না; তথায় অতি সম্ভ্রান্ত মহিলারাও পুরুষ সঙ্গী ব্যতিরেকেও রাস্তা ঘাটে বেড়াইয়া থাকেন। বাড়ীর বাহিরে আসিলে বাংলা দেশের মত পুরুষদের কাপুরুষোচিত বিষদিগ্ধ দৃষ্টি মহারাষ্ট্র মহিলাকে সহ্য করিতে হয় না।

বস্তুতঃ, কোন দেশ কতটা সভ্য, তথাকার নারীর অবস্থা দ্বারা তাহা মাপা যাইতে পারে। সে দেশে নারীরা জ্ঞানে কত উন্নত, তাঁহাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার, দায়াধিকার, কিরূপ—এ সকল বিষয়ে তথ্য নির্ণয় করা আবশ্যক বটে; কিন্তু আমি এখন সে সব কথা তুলিতেছি না। আমি এখন কেবল ইহাই বলিতেছি, যে, যে দেশে নারী যেরূপ নিরাপদ, নিরুদ্বেগ, নিঃশঙ্ক জীবন যাপন করিতে পারেন, সেই দেশ সভ্যতায় তত অগ্রসর।

অবশ্য পূর্ণ সভ্য এখনও কোনও দেশ হয় নাই। ইউরোপের জাতিরা আপনাদিগকে সভ্যতম বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই মহাদেশেও যখনই জাতি জাতিতে বিরোধ হইয়া যুদ্ধ হইয়াছে, তখনই আক্রান্ত বা পরাজিত দেশের নিরপরাধ রমণীদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধে, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে লক্ষ লক্ষ নারী এই প্রকারে অত্যাচারিত হইয়াছেন। এই কলঙ্ক হইতে কোন দেশ কোন জাতি সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। মহারাষ্ট্রের ইহা একটা গৌরবের বিষয়, যে, শিবাজীর এবিষয়ে কঠোর আজ্ঞা ছিল এবং এবিষয়ে তাঁহার নিজের আচরণ আদর্শস্থানীয় ছিল। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার তৎকৃত শিবাজীচরিতে লিখিয়াছেন, "His chivalry to women and strict enforcement of morality in his camp was a wonder in that age and has extorted the admiration of hostile critics like Khafi Khan."

আধুনিক কালে ভারতবর্ষের মধ্যে বহু বৎসর যুদ্ধ হয় নাই। মোপ্‌লা বিদ্রোহকে শেষ যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। ইহাতেও স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ না হইলেও দাঙ্গা হাঙ্গামা ও ডাকাইতি এ দেশে এখনও হইয়া থাকে। এবং তাহাতে স্ত্রীলোকদিগকে অত্যাচার ও লাঞ্ছনা খুবই সহ্য করিতে হয়। অত্যাচার হইতে রক্ষা করা পুলিশের কাজ, কিন্তু কখন কখন তাহারাই অত্যাচারী হইয়া থাকে।

বাংলাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জা ও দুঃখের কথা এই যে, এখানে গৃহস্থের বাড়ীর মধ্য হইতে, রাত্রে, সন্ধ্যায় এমন কি দিনে দুপুরে, কখন কখন স্বামী পিতা ভ্রাতার সম্মুখ হইতে অপহৃতা হন।

নারীদের এইরূপ দুর্গতি যে দেশে ও যেখানে হয়, তথাকার কতকগুলা লোক দুর্ব্বৃত্ত ও পশুপ্রকৃতি এবং অন্য কতকগুলা লোক দুর্ব্বল ও কাপুরুষ।

বস্তুতঃ, নারীদিগকে প্রায় সব সময় বা বেশীর ভাগ সময় অন্তঃপুরে রাখিবার সপক্ষে যে যুক্তি দেখান হয়, যে, নতুবা তাহাদের মান ইজ্জৎ সম্ভ্রম থাকিবে না, সেই যুক্তির মধ্যেই ইহা উহ্য রহিয়াছে, যে, দেশের বহুসংখ্যক লোক এরূপ জঘন্য প্রকৃতির যে তাহারা সুযোগ পাইলেই স্ত্রীলোকদিগের অনিষ্ট করিবে, এবং যাহারা অনিষ্ট করিবে না তাহারা এরূপ বলহীন ভীরু ও কাপুরুষ, যে, তাহাদের দ্বারা নারীর রক্ষার আশা নাই। সুতরাং অবরোধপ্রথা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

সমুদয় পৃথিবীতে নরমাংস ভোজনের বিরুদ্ধে যেমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কার ও লোকমত জন্মিয়াছে, নারীর উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তেমনি একটি প্রবল সংস্কার ও লোকমত বদ্ধমূল হইলে বুঝিব, যে পৃথিবীর লোক সভ্য হইয়াছে।

বাংলা দেশের দুর্গতি দূর করিতে হইলে প্রত্যেক সমর্থ পুরুষকে নারীর মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে; এবং যাহারা অবিবাহিত, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবার মত সাহস ও বল তাঁহাদের না থাকিলে তাঁহাদিগকে আমরণ অবিবাহিত থাকিতে হইবে।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

অনন্ত আশ্রয়

বহু দুঃখ দেছ বলি, করি অভিমান
ফিরায়ে কি রব মুখ, হে আমার নাথ,
ঠেলে প্রসারিত বাহু ? সহায়ে আঘাত
অবশেষে এনে যদি থাক অন্ত দান,
আনন্দ কি আশীর্ব্বাদ,—করি প্রত্যাখ্যান
চলে যাব ? না, না, প্রভো, জুড়ি দুই হাত
দাঁড়াইনু নতশির। তব বজ্রপাত
অমৃত বর্ষণ আর সমান কল্যাণ।

আনন্দ দিয়াছ যত সে তো পুরস্কার
নহে মোর কোন পুণ্য, কোন যোগ্যতার ;
বেদনা দিয়াছ যত, তাও সব নয়
আমার পাপের শাস্তি। ওহে পূর্ণজ্ঞান,
পূর্ণপ্রেম, কি বুঝিব তোমার বিধান ?
শুধু জানি তুমি মোর অনন্ত আশ্রয়।

শ্রীকামিনী রায়।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

আমাদের আলোচ্য বিষয় ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস। সভ্যতা-বিকাশের দিক দিয়া ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসের একটা মোটামুটি আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য। এই সভ্যতার মূল কোথায়, কোন্ পথে ইহার উন্নতি হইল, ইহার লক্ষ্য কোন্ দিকে, ইহার প্রকৃতি কি, এই সকল প্রশ্ন সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

"ইউরোপীয় সভ্যতা" বলিয়া যে কথাটি ব্যবহার করিলাম, তাহা নিরর্থক নহে। বাস্তবিক-পক্ষে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভ্যতার মধ্যে এমন একটা ঐক্য আছে, যাহা লক্ষ্য করিলে "ইউরোপীয় সভ্যতা" বলিয়া একটা স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানা-প্রকার স্থান, কাল, অবস্থাভেদ সত্ত্বেও এই সভ্যতা সর্ব্বত্র একই প্রকার ঘটনা সমাবেশে উদ্ভুত হইয়াছে, একই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং প্রায় সর্ব্বত্র একই প্রকার ফল প্রসব করিয়াছে। ইউরোপের এই সার্ব্বদেশিক সভ্যতার দিকেই আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই।

আবার ইহাও সুস্পষ্ট যে, এই সভ্যতার মূল ইউরোপের কোন একটি দেশের ইতিহাসের মধ্যে আবিষ্কার করা যায় না। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস একদিকে যেমন সংক্ষিপ্ত ও অল্পকালব্যাপী, অন্য দিকে ইহার বৈচিত্র্য তেমনি বিস্ময়কর। কোন একটি দেশে ইহা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করে নাই। ইহার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, বহুদূর দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে হইবে। ইহার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য কখনও ফ্রান্স, কখনও ইংলণ্ড, কখনও জার্ম্মাণী, কখনও বা স্পেনে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

তবে ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনার পক্ষে ফ্রান্সের অধিবাসিবর্গের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। কারণ, ফ্রান্স বরাবর ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আসিয়াছে। আমি এ কথা বলিতে চাহি না যে, ফ্রান্স সকল সময়ে এবং সকল দিক্

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য "সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলী"র অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

দিয়া সমগ্র ইউরোপীয় জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। কোন কোন যুগে ইটালী কলা-শিল্পের ক্ষেত্রে ফ্রান্সকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; কখনও বা ইংলণ্ড রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দিক্ দিয়া অধিকতর উন্নতিসাধন করিয়াছে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ যুগে ইউরোপের অন্যান্য জাতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যখনই ফ্রান্স দেখিয়াছে যে, অন্য কোন জাতি তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে, তখনই সে নবীন উদ্যমে অক্লান্ত চেষ্টায় অল্পকালের মধ্যেই সকলের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে—ইউরোপের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, ইহাও দেখা যায় যে, যখনই কোন নূতন ভাব বা প্রতিষ্ঠান দেশবিশেষে উদ্ভূত হইয়া সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্তি ও সফলতা লাভ করিতে চাহিয়াছে, তখনই সেগুলিকে একবার ফ্রান্সের মাটিতে নূতন করিয়া তৈয়ারী হইতে হইয়াছে, এবং এই ফ্রান্স হইতে একপ্রকার নবজীবন লাভ করিয়া তাহারা ইউরোপ জয় করিতে বাহির হইয়াছে। এমন কোন মহান্ ভাব নাই, সভ্যতার এমন কোন মূলসূত্র নাই, যাহা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বে, এইরূপে ফ্রান্সের ভিতর দিয়া যায় নাই।

তাহার কারণ এই। ফরাসী জাতির চরিত্রের মধ্যে এমন একটা সামাজিক সৌহৃদ্যের ভাব আছে, এমন একটা সহানুভূতির ক্ষমতা আছে, যাহাতে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ফরাসী জাতি সহজে ও অবাধে সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের ভাষার গুণেই হউক, তাহাদের চিন্তার বিশিষ্ট ভঙ্গীর দরুণই হউক, বা তাহাদের মার্জ্জিত শিষ্টাচারের দরুণই হউক, এটা নিশ্চয় যে, ফরাসীজাতির চিন্তা ও ভাব অন্যান্য জাতির চিন্তা ও ভাব অপেক্ষা অধিক-পরিমাণে প্রাঞ্জল, সুস্পষ্ট ও জনসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হয় এবং সেই জন্য লোকসমাজে সহজেই প্রসার লাভ করে। এক কথায় প্রাঞ্জলতা, সামাজিকতা ও সহানুভূতিক্ষমতা, এই তিনটি গুণ লইয়াই ফ্রান্সের জাতীয় প্রকৃতির বিশেষত্ব এবং এই গুণেই ফ্রান্স ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে নেতৃস্থান অধিকার করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।

সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে হইলে, ফ্রান্সকেই আমাদের আলোচনার কেন্দ্রস্বরূপ অবলম্বন করিতে হইবে।

এইখানে কতকগুলি গোড়াকার কথা পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। কিছুদিন হইতে একটা কথা উঠিয়াছে যে, বাস্তব তথ্য ও বাস্তব ঘটনাবলীর যথাযথ বিবরণ প্রদান করাই ইতিহাসের একমাত্র কর্ত্তব্য। তথ্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ইতিহাসের পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা। ইহা যথার্থ কথা, সন্দেহ নাই, কিন্তু এটা মনে রাখিতে হইবে যে, সাধারণে আপাতদৃষ্টিতে যে সকল তথ্যকে ইতিহাসের একমাত্র বিষয় বলিয়া মনে করিতে চাহেন, তাহা ছাড়া আরও বহুসংখ্যক ও বহুপ্রকারের তথ্য আছে, যাহা ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য। সকল তথ্যই একশ্রেণীর নহে। এমন অনেক তথ্য ও ঘটনা আছে, যাহা বাহ্য ও সহজে প্রত্যক্ষগোচর—যথা, যুদ্ধ, বিগ্রহ ও রাষ্ট্রশক্তিপ্রবর্ত্তিত নানা বাহ্য অনুষ্ঠান। আবার অনেক তথ্য আছে, যাহা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের তথ্য। যদিও ইহারা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, সহজে বাহির হইতে চোখে পড়ে না, তথাপি ইহারা কাল্পনিক নহে, সম্পূর্ণরূপে বাস্তব।

আবার একদিকে যেমন এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা স্বতন্ত্র, দেশকালনির্দ্দিষ্ট, সংজ্ঞাবিশিষ্ট, তেমনি অপর দিকে এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহারা ব্যাপক, যাহারা কোন বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত নয়, যাহাদের সন তারিখ নির্দ্দেশ করা যায় না, যাহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না, অথচ যাহাদিগকে ইতিহাস হইতে বাদ দিলে, ইতিহাস অঙ্গহীন হইয়া পড়ে।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয় ও যোগসূত্র আবিষ্কার, তাহাদের কার্য্য-কারণবিচার—এক কথায় আমরা যাহাকে ইতিহাসের তত্ত্বাংশ বলিয়া থাকি—এ সমস্তই ইতিহাসের বিষয়ীভূত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বাহ্য ঘটনার বিবরণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকতার হিসাবে কোন অংশে ন্যূন নহে। এই সকল সূক্ষ্ম তথ্যের যথাযথ বিবৃতি ও বিশ্লেষণ করা বা ইহাদিগকে সুস্পষ্ট ও জীবন্ত রঙ্গে ফুটাইয়া তোলা যে অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও শ্রমসঙ্কুল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুরূহ বলিয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার উপায় নাই। কারণ, এইগুলিই ইতিহাসের সারাংশ।

আমরা যাহাকে সভ্যতা বলি, তাহা এইরূপ একটি সূক্ষ্ম, জটিল, ব্যাপক ও নিগূঢ় ঐতিহাসিক তথ্য। ইহার বিবরণ দেওয়া কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার একটি বাস্তব সত্তা আছে, ইতিহাসে স্থান পাইবার অধিকার আছে। আমরা ইহার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারি। এ প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং উঠিয়াছে যে, এই সভ্যতা জিনিষটা ভাল কি মন্দ,—কেহ বা ইহাকে লইয়া আনন্দে উন্মত্ত, কাহারও নিকট বা ইহা আক্ষেপের বিষয়। এই সভ্যতা জিনিষটা কি বিশ্বজনীন, না বিশেষ বিশেষ দেশ বা যুগের মধ্যে ইহার গণ্ডী আবদ্ধ? সমগ্র মানব জাতির এক সাধারণ সভ্যতা, বিশ্বমানবের এক সাধারণ নিয়তি বলিয়া একটা কিছু আছে কি? বিভিন্ন মানবজাতি যুগে যুগে এমন কিছু কি রাখিয়া যাইতেছেন, যাহার বিনাশ নাই, যাহা কালে কালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিশাল হইতে বিশালতর আকার ধারণ করিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত যাহার গতির বিরাম নাই? আমার ত দৃঢ়বিশ্বাস যে, বাস্তবিকই বিশ্বমানবের একটা সাধারণ নিয়তি আছে, মানবসভ্যতা যুগে যুগে নানা জাতির মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতেছে, এবং এই বিশ্বমানব-সভ্যতার বিরাট ইতিহাস লিখিত হইবার যোগ্য। যাহা হউক, এসব বড় বড় প্রশ্ন উত্থাপন করিব না, এটুকু বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যদি আমরা দেশ ও কালের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আমাদের আলোচনা আবদ্ধ করিয়া লই, যদি কোন একটি জাতির নির্দ্দিষ্ট কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস লইয়া আমরা গবেষণায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে এই সভ্যতার ইতিহাস রচনা একেবারে অসম্ভব চেষ্টা হইবে না। শুধু তাহাই নহে, এই ইতিহাসই শ্রেষ্ঠ ইতিহাস, সমস্ত ইতিহাসই এই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে, আপনাদিগের কি ইহা মনে হয় না যে, যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার একমাত্র পরিণতি এই সভ্যতায়। বাণিজ্য বলুন, শিল্প বলুন, যুদ্ধ-বিগ্রহ বলুন, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান বলুন, শাসন-ব্যবস্থা বলুন যখনই তাহাদিগকে সমষ্টিভাবে দেখিবার চেষ্টা করা যায়, যখনই তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যায়, যখনই তাহাদিগকে পরীক্ষা ও বিচার করিবার

সময় হয়, তখনই আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে হয়—ইহারা কে, কি পরিমাণে জাতিবিশেষের সভ্যতাকে গঠিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে, সভ্যতার উপর তাহারা কি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এইরূপেই আমরা জাতীয় জীবনের অঙ্গস্বরূপ এই সকল ব্যাপার সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণা করিতে সমর্থ হই, তাহাদের যথার্থ মূল্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। তাহারা যেন এক একটি নদী, জাতীয় সভ্যতার মহাসমুদ্রে তাহারা কে কতটুকু জল আনিয়া দিল, তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। কথাটা যে কত সত্য, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। রাজশাসনে যথেচ্ছাচারিতা বা অরাজকতা—উভয়ই জাতীয় জীবনের পক্ষে অকল্যাণকর বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন কেহই ইহাদিগকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। কিন্তু যদি কোনরূপে গৌণভাবে এই যথেচ্ছতন্ত্র বা অরাজকতার দ্বারা জাতীয় সভ্যতার কোনরূপ পরিপুষ্টি সাধিত হয়, যদি তাহারা জাতিকে উন্নতির পথে কিছুমাত্র অগ্রসর করিয়া দিয়া থাকে তাহা হইলে, আমরা কিয়ৎপরিমাণে তাহাদিগকে মনে মনে ক্ষমা করিয়া থাকি, তাহাদের অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন আমরা কতক পরিমাণে উপেক্ষা করিয়া থাকি। অর্থাৎ যেখানেই আমরা পরিণামে সভ্যতা দেখিতে পাই, সেখানেই সেই সভ্যতার খাতিরে আমরা পূর্ব্বগামী দুঃখ কষ্ট অপমান সমস্তই ভুলিয়া যাইতে চাই।

আবার কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য আছে, যাহার সহিত সামাজিক জীবনের মুখ্য সম্বন্ধ নাই, যাহা মুখ্যতঃ মানুষের ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ জীবনের সহিত জড়িত, যথা ধর্ম্মবিশ্বাস, দার্শনিক তত্ত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলাশিল্প। মানুষের নৈতিক উন্নতি বা মানসিক তৃপ্তি-সাধন ইহাদিগের প্রধান লক্ষ্য, সামাজিক উন্নতি-সাধন তত নহে।

ধর্ম্ম সর্ব্বদেশে মানুষকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলাশিল্প, ইহারাও অল্পাধিকপরিমাণে এই গৌরবের অংশ দাবী করিয়া থাকে। যখনই আমরা এই দাবী স্বীকার করিয়াছি, যখনই আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা শিল্পের দ্বারা মানব-সভ্যতার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে, তখনই আমরা মনে করিয়াছি যে, এতৎদ্বারা ধর্ম্ম-সাহিত্যাদিরই গৌরববৃদ্ধি হইল। ধর্ম্ম-সাহিত্যাদি স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহাদের মহত্ত্ব বা মূল্য আপেক্ষিক নহে। বাহ্য ফলাফল বিচার করিয়া তাহাদের মূল্য নিরূপণ হয় না। মানুষের আত্মার সহিতই তাহাদের মুখ্য সম্বন্ধ। এমন যে অন্তরঙ্গ বস্তু, সভ্যতার সংস্পর্শে ইহাদেরও মূল্য বৃদ্ধি হয়। শুধু যে মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে; অনেক সময় কেবল সভ্যতার উপর কে কি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বিশেষ ভাবে সেই দিক্ দিয়াই ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্যাদির বিচার করিতে হয় এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে কেবল সভ্যতার দিক্ দিয়াই তাহাদের চূড়ান্ত মূল্য নির্ণয় করিতে হয়।

এখন তাহা হইলে সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একবার দেখা যাউক, এই সভ্যতাবস্তুর স্বরূপ কি?

সভ্যতা (Civilisation) কথাটি বহুকাল হইতে বহুদেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ লোকে যে অর্থে কথাটি ব্যবহার করে, তাহা অল্পাধিক পরিমাণে ব্যাপক ও স্পষ্ট। যাহাই হউক, কথাটির যখন ব্যবহার আছে, তখন ইহার একটা যেমন হউক, অর্থও আছে।

ইহার সর্ব্বজন-প্রচলিত সহজবুদ্ধিগোচর যে লৌকিক অর্থ, তাহাই আমাদিগকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কারণ, এই সকল ব্যাপক শব্দের যে লৌকিক অর্থ তাহা প্রায়ই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার অপেক্ষা সুনির্দ্দিষ্ট হয়। কোন শব্দের লৌকিক অর্থ সমগ্র সমাজের বহুকালার্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ। কিন্তু বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা শব্দের যে সংজ্ঞা প্রস্তুত করিয়া লই, তাহা ব্যক্তিবিশেষ বা অল্পসংখ্যক লোকের অভিজ্ঞতার ফল; বিশেষ কোন একটা সত্যের অনুভূতি হইতে এই সকল সংজ্ঞার উৎপত্তি। সেই জন্য শব্দের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা প্রায়ই লৌকিক সংজ্ঞা অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শী হয়। সুতরাং সমগ্র মানবজাতির সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে এই Civilisation শব্দটির মধ্যে যতগুলি ভাব অনুস্যূত আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা সভ্যতা বস্তুটির প্রকৃত পরিচয়লাভের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিব। সভ্যতা শব্দের একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করিয়া আমরা ততদূর অগ্রসর হইতে পারিব না।

প্রথমে আমি আপনাদের সম্মুখে কতকগুলি কাল্পনিক সমাজের চিত্র ধরিতে চাই। এই চিত্রগুলি একে একে বিচার করিয়া দেখা যাউক যে, লোকসাধারণে সভ্য সমাজ বলিলে যাহা বুঝে, তাহা এর মধ্যে কোন্ চিত্রের সঙ্গে মিলে।

প্রথমে এমন একটি সমাজ কল্পনা করা যাউক, যেখানে বাহ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব নাই, রাজকর পরিমাণে অল্প, বিচার-ব্যবস্থা সুপরিচালিত, এক কথায় যেখানে লোকের বাহ্য জীবনযাত্রা পরমসুখে ও সুনিয়মে পরিচালিত হয়। কিন্তু সেখানে অপর দিকে লোকের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন স্ফূর্ত্তি লাভ করিবার সুযোগ পায় না; এমন কি, এগুলিকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখা হয়, মানুষের বুদ্ধি, বিবেক কল্পনাকে চিরকালের জন্য জড় ও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা হয়। এরূপ সমাজের চিত্র ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে। এমন অনেক অভিজাততন্ত্র রাষ্ট্র দেখা গিয়াছে, যেখানে জনসাধারণ মেষপালের ন্যায় সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত পালিত হইয়াছে, কিন্তু মানসিক বা নৈতিক উন্নতির অবসর পায় নাই। এই চিত্র কি সভ্যতার চিত্র? এই সমাজ কি সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে?

এইবার অন্য একটি সমাজের চিত্র কল্পনা করা যাউক। এখানে লোকের বাহ্য জীবনযাত্রা, তত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত পরিচালিত না হউক, তবু একেবারে দুঃসহ নহে। এখানে কিন্তু নৈতিক ও মানসিক দিকটা অবজ্ঞাত নহে। জনসাধারণকে কিয়ৎপরিমাণে মানসিক ও আধ্যাত্মিক খাদ্য যোগান হইয়া থাকে। তাহাদের মনে উচ্চ ও পবিত্র ভাব অঙ্কুরিত করিয়া দেওয়া হয়। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কতকদূর পর্য্যন্ত বেশ উন্নত ও পরিপুষ্ট, কিন্তু তাহাদের মনে যাহাতে স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের ভাব কোনরূপে স্থান না পায়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। পূর্ব্বোক্ত সমাজে যেমন বাহ্য ও শারীরিক অভাব পূরণের জন্য যথোপযোগী ব্যবস্থা আছে, এখানে তেমনি নৈতিক ও মানসিক অভাব পূরণের জন্য রীতিমত ব্যবস্থা আছে। যাহার যেটুকু প্রাপ্য, তাহাকে সেইটুকু সত্য বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধানে কাহারও অধিকার নাই। স্থাবরতাই এই সমাজের অন্তরঙ্গ জীবনের প্রধান

বিশেষত্ব। এসিয়ার অধিকাংশ অধিবাসিবর্গ এইরূপ সমাজে বাস করিয়া আসিতেছে। যেখানেই দেবতন্ত্র বা যাজকতন্ত্রের দ্বারা জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেইখানেই এই অবস্থা। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দুসমাজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানেও আবার সেই প্রশ্ন করি, এরূপ সমাজে কি সভ্যতার বিকাশ বা পুষ্টি হইতেছে?

এইবার সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকারের এক সমাজের কল্পনা করা যাউক। এ সমাজে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার অবাধ স্ফূর্ত্তি, কিন্তু সাম্য ও শৃঙ্খলার একান্ত অভাব। এখানে দুর্ব্বল সবলের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ। এখানে বল ও আকস্মিক ভাগ্যের রাজত্ব। সকলেই জানেন, ইউরোপকে এই অবস্থার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছে। এটা কি সভ্যতার অবস্থা? অবশ্য ইহার মধ্যে সভ্যতার অনেক মূলতত্ত্ব নিহিত আছে, এবং এই তত্ত্বগুলি হয় ত ক্রমশঃ বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে; কিন্তু সমাজের মধ্যে যে ভাবের প্রধান আধিপত্য, সেটা যে সভ্যতা নহে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশেষে আমি আর একটি সমাজ-চিত্রের অবতারণা করিব। এ সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা খুব বেশী; বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অবস্থার তারতম্যও খুব অল্প অথবা অল্পকালস্থায়ী। কিন্তু এখানে সামাজিক বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল; ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যতীত সকলের সাধারণ স্বার্থ বলিয়া কোন বস্তুর ধারণা নাই। প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তি আপন আপন শক্তি ও প্রতিভা লইয়া স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করে এবং অবশেষে সমাজের উপর কোন প্রভাব বিস্তার না করিয়াই, পশ্চাতে কোন চিহ্ন না রাখিয়াই, সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করে। যুগের পর যুগ পুরুষানুক্রমে তাহারা একই ভাবে জীবন যাপন করিয়া যায়, কোথাও কোন উন্নতি বা পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। অসভ্য জাতিদিগের এই অবস্থা, তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও সাম্য আছে, কিন্তু সভ্যতা নিশ্চয়ই নাই।

এইরূপ আরও অনেক কাল্পনিক সমাজের অবতারণা করা যায়, কিন্তু সভ্যতা শব্দের লৌকিক ও সহজ অর্থ নির্দ্ধারণের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এটা বেশ স্পষ্ট যে, এই সকল কল্পিত সমাজের মধ্যে কোনটিই মানবজাতির সহজ বুদ্ধিতে সভ্যসমাজ বলিয়া গৃহীত হইবে না। কেন গৃহীত হইবে না? কারণ, আমার মনে হয় যে, সভ্যতা কথাটার মধ্যে একটা উন্নতি বা পরিপুষ্টির ভাব অনুস্যূত আছে। সভ্য জাতি বলিলেই একটা পরিবর্ত্তনশীল, উন্নতিশীল জাতির চিত্র মনে আসে। এই উন্নতির কথাটাই যেন সভ্যতা শব্দের অন্তর্নিহিত মূল ভাব। এই উন্নতি জিনিষটি কি? এই পরিপুষ্টি কিসে হয়? এইখানেই যত গোল।

Civilisation শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে একটা বেশ পরিষ্কার ও সন্তোষজনক অর্থ পাওয়া যায়। Civilisation অর্থ Civil lifeএর সম্পূর্ণতা সাধন, সামাজিক জীবনের পুষ্টিসাধন। অর্থাৎ মানুষ মানুষের সঙ্গে যে সকল বিচিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেই সকল সম্বন্ধের পূর্ণতা ও পুষ্টিসাধনই সভ্যতা।

বাস্তবিক পক্ষে Civilisation কথাটি উচ্চারণ করিলেই প্রথমে এই শেষোক্ত ভাবটিই মনে আসে। আমরা তৎক্ষণাৎ মনে মনে এমন একটি আদর্শ সমাজ চিত্রিত করিয়া লই, যেখানে সামাজিক সম্বন্ধগুলি সুপরিব্যাপ্ত, সুনিয়ন্ত্রিত ও ক্রিয়াবান্। সে সমাজে একদিকে

যেমন শক্তি ও সৌখ্য-বিধায়ক পদার্থসমূহ বহুলপরিমাণে উৎপন্ন হয়, তেমনি অপরদিকে সেই সকল পদার্থ সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সুসঙ্গত ও যথাযোগ্যভাবে বণ্টিত হয়।

কিন্তু ইহাই কি যথেষ্ট? সভ্যতা শব্দের মধ্যে কি আর কোন ভাব অন্তর্নিহিত নাই? মানবসমাজ কি তাহা হইলে পিপীলিকা-সমাজ হইতে অভিন্ন? পিপীলিকা-সমাজের যেমন সামাজিক শৃঙ্খলা ও শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই একমাত্র লক্ষ্য, মানব-সমাজেরও কি তাহাই? তাহা হইলে ত অন্নবস্ত্রাদির জন্য পরিশ্রমের মাত্রা যত বাড়ান যাইবে ও পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যসামগ্রী যত ন্যায়মত বণ্টিত হইবে, সমাজের উদ্দেশ্য ততই সুসিদ্ধ হইবে এবং সমাজের উন্নতিও সেই পরিমাণে হইবে।

মানবজাতির লক্ষ্য ও নিয়তি সম্বন্ধে এমন একটা সঙ্কীর্ণ ধারণা করিতে আমাদের মন কিছুতেই সম্মত হয় না। আমাদের মনে সহজেই ধারণা হয় যে, সভ্যতা জিনিষটা এ অপেক্ষা অনেক জটিল ও ব্যাপক।

সভ্যতা শব্দের লোকপ্রচলিত অর্থও আমাদের এই সহজ ধারণাকেই সমর্থন করিতেছে।

প্রথমে রোমের দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। রোমে যখন প্রজাতন্ত্র শাসনের চরমোৎকর্ষ, পিউনিক যুদ্ধ যখন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, রোমান চরিত্রের বিশিষ্ট সদ্‌গুণগুলি যখন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, রোম যখন বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য লাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে, রোমীয় সমাজের অবস্থা যখন নিঃসন্দেহ উন্নতিশীল, একদিকে সেই সময়ের রোমকে ধরুন, অপরদিকে অগষ্টসের সময়ের রোমকে ধরুন। তখন রোমের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে, অন্ততঃ তখন রোমীয় সমাজের উন্নতি বন্ধ হইয়াছে; রাষ্ট্রে ও সমাজে অকল্যাণকর নীতির আধিপত্যের সূচনা হইয়াছে। অথচ এমন কেহই নাই যিনি বলিবেন না যে, অগষ্টসের রোম, প্রজাতন্ত্র রোম অপেক্ষা, ফ্যাব্রিসিয়স্ ও সিন্‌সিনেটসের রোম অপেক্ষা সভ্যতায় উন্নত।

এইবার একবার আল্পস্ গিরিমালার অপর পারে যাওয়া যাউক। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের কথা ভাবুন। সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার দিক্ দিয়া দেখিলে ফ্রান্স তখন ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অথচ সকলেই বলিবেন যে, সভ্যতা-হিসাবে ফ্রান্স তখন ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশ অপেক্ষা উন্নত। ইউরোপীয় সাহিত্যের সর্ব্বত্রই এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এইরূপ আরও অনেক দেশের দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান যাইতে পারে যে, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি সভ্যতার উন্নতি বলিয়া বিবেচিত হয় না।

ইহার অর্থ কি? সামাজিক ও আর্থিক অবস্থায় নিকৃষ্ট হইলেও, অন্য কি গুণে কোন জাতি সভ্য পদবী প্রাপ্ত হইতে পারে?

ইতিহাস বিচার করিলে দেখা যায়, যে এই সকল জাতি সামাজিক জীবনে নহে, অন্যত্র উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইহারা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের, অন্তরঙ্গ জীবনের, সার মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিয়াছে। মানুষের চিন্তা, ভাব ও বৃত্তিসমূহের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের মনুষ্যত্ব অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সামাজিক জীবনের উন্নতির পক্ষে এখনও তাহাদের অনেক কর্ত্তব্য

অবশিষ্ট আছে, কিন্তু মানসিক ও নৈতিক জীবনে তাহারা প্রভূত কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে।

তাহাদের সমাজে অনেক লোক বাহ্যসম্পদ্‌ ও সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত; কিন্তু অনেক বড় লোক সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতেছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা উৎকর্ষের চরমসীমায় উঠিয়াছে। যেখানেই এই সকল লক্ষণ দেখা দিয়াছে, যেখানেই মানুষের অতীন্দ্রিয় ভোগের এই সকল শ্রেষ্ঠ উপাদান সৃষ্ট হইয়াছে, সেইখানেই লোকসাধারণ সভ্যতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে।

তাহা হইলে সভ্যতার দুইটি অঙ্গ। একদিকে সমাজের উন্নতি, অন্যদিকে মনুষ্যত্বের বিকাশ। যেখানেই মানুষের বহিরঙ্গ জীবন সজীব, উন্নতিশীল ও সুশৃঙ্খল; যেখানেই মানুষের অন্তরঙ্গ জীবন অপূর্ব্ব জ্যোতি ও মহিমায় মণ্ডিত; এই দুই লক্ষণ যেখানেই পাওয়া গিয়াছে, সামাজিক অবস্থায় নানা ত্রুটিসত্ত্বেও মানবসমাজ সেইখানেই সমস্বরে সভ্যতার অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছে।

এতক্ষণ আমরা সর্ব্বসাধারণের সহজবুদ্ধি অনুসারে সভ্যতার মূল প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করিলাম। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইব। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যেগুলি সন্ধিক্ষণ বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন, যথা খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থান, সেই সন্ধিক্ষণগুলির বিচার করিলেও আমরা দেখিব যে পূর্ব্বোক্ত দুইলক্ষণের মধ্যে অন্ততঃ একটি সেখানে বিদ্যমান। খৃষ্টধর্ম্মের যখন প্রথম অভ্যুত্থান শুধু তখন নহে, অনেকদিন পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মের সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য কোন উদ্যম প্রকাশ করে নাই। বরং সে স্পষ্টবাক্যে ঘোষণা করিয়াছে যে সামাজিক ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করিবে না। সে ক্রীত-দাসকে বলিয়াছে 'প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া যাও'। সেই যুগের সমাজের অন্যায়, অবিচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সে অস্ত্রধারণ করে নাই। অথচ খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থান যে মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটা সন্ধিক্ষণ তাহা কে অস্বীকার করিবে? কেননা ইহা মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে, মানুষের বিশ্বাস, মানুষের অন্তঃকরণের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে; কেন না ইহা মানুষের চিন্তা ও ভাবরাজ্যে একটা নবজীবন দান করিয়াছে।

আমরা সভ্যতার ইতিহাসে আর একটা বড় সন্ধিক্ষণ দেখিয়াছি। সে ফরাসী বিপ্লব। এ বিপ্লবের উদ্দেশ্য মানুষের অন্তরঙ্গ পরিবর্ত্তন নহে, মানুষের বাহ্য অবস্থার পরিবর্ত্তন। এ সন্ধিক্ষণে মানুষের সমাজ পরিবর্ত্তিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে।

এইরূপ ইতিহাসের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান কর, দেখিবে যে, যে কোন ঘটনাদ্বারা সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে তাহা হয় মানুষের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত জীবন, না হয় বহিরঙ্গ সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

এখন সভ্যতার এই যে দুইটি অঙ্গ পাওয়া গেল ইহার মধ্যে যে কোন একটিই কি সভ্যতার পক্ষে যথেষ্ট? কেবল অন্তরঙ্গ উন্নতি বা কেবল বহিরঙ্গ উন্নতি কি সভ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? একটির আবির্ভাব হইলেই, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক অন্যটির আবির্ভাব কি অবশ্যম্ভাবী?

আমার মনে হয়, তিনদিক্ দিয়া প্রশ্নটির বিচার হইতে পারে। প্রথমে আমরা সভ্যতার এই দুই অঙ্গের প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিতে পারি ইহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত কি না। অথবা আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া দেখিতে পারি যে ইহারা পৃথক্ ও স্বাধীনভাবে আবির্ভূত হইয়াছে, না সর্ব্বত্রই একটির সঙ্গে সঙ্গে অপরটির আবির্ভাব হইয়াছে। অথবা আমরা এক তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিতে পারি। আমরা লোক সাধারণের সহজবুদ্ধির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারি। আমি প্রথমে এই শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে চাই।

যখন দেশের অবস্থার একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, যখন সমাজে সম্পদ্ ও শক্তির পরিপুষ্টি হয়, সামাজিক সম্পদের বণ্টনব্যবস্থায় একটা বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন এই বিপ্লব, এই পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, ইহা অবশ্যম্ভাবী। যাহারা পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন তাঁহারা কি বলেন? তাঁহারা বলেন "মানুষের বাহিরের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিলে কি হইবে? যে পরিমাণে বাহিরের উন্নতি হইবে সেই পরিমাণে কি ভিতরের উন্নতি হইবে, চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইবে? তোমরা যে উন্নতি সাধন করিতে চাও, সে উন্নতি ছলনামাত্র, সে উন্নতি মানুষের চরিত্রের পক্ষে, অন্তরঙ্গ মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর।" যাঁহারা সামাজিক উন্নতির পক্ষপাতী তাঁহারা ইহার বিপক্ষে প্রবল যুক্তিসমূহের অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন সামাজিক উন্নতির সঙ্গে নৈতিক উন্নতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেখানে বহিরঙ্গ জীবন সুনিয়ন্ত্রিত, সেখানে অন্তরঙ্গ জীবনও মার্জ্জিত ও পবিত্র হয়।

এইবার বিপরীত দিক হইতে দেখা যাউক। যখন কোন সমাজে চিত্তবৃত্তিনিচয়ের বিকাশ ও উন্নতি চলিতেছে, তখন সেই উন্নতিমার্গের পথপ্রদর্শকেরা জনসাধারণের কাছে কোন্ আশার প্রলোভন দেখান? সমাজের শৈশবাবস্থায় ধর্ম্মশাসক, ঋষি, মনীষি, কবি প্রভৃতি যে কেহ মানুষের দুর্দ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া কোমল ও মার্জ্জিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা মানুষকে কি বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন? তাঁহারা আশা দিয়াছেন যে চিত্তবৃত্তির বিকাশের দ্বারা সামাজিক অবস্থার উন্নতি হইবে, সমাজের সম্পদ্ আরও সুশৃঙ্খলার সহিত যথাযোগ্যভাবে সকলের ভোগে নিয়োজিত হইবে।

তাহা হইলে দুই পক্ষের এই বাদ প্রতিবাদ হইতে কোন্ সত্য উদ্ধার করা যায়? এই বাদ প্রতিবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে মানুষের সহজ স্বাভাবিক ধারণায় সভ্যতার এই দুই দিক্ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। এই দুইএর মধ্যে একটা দেখিলেই লোকে তাহার সঙ্গেই অন্যটাকেও দেখিতে আশা করে। লোকের মনে এইরূপ ধারণা আছে বলিয়াই দুইপক্ষের লোক পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তির অবতারণা করেন। যাঁহারা সামাজিক বিপ্লব চান না তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করেন যে সমাজের উন্নতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ উন্নতির কোন অনুকূল সম্বন্ধ নাই। অন্য দিকে যাঁহারা অন্তরঙ্গ উন্নতি করিতে চান তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করেন যে অন্তরঙ্গ উন্নতি হইলেই বহিরঙ্গ উন্নতি সাধিত হইবে।

যদি আমরা জগতের ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করি তাহা হইলেও আমরা সেই একই

উত্তর পাইব। আমরা দেখিব মানুষের ব্যক্তিগতভাব ও চিন্তার বিকাশ সমাজের পক্ষেও লাভজনক হইয়াছে; আবার সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তারও বিকাশ হইয়াছে। তবে কখনও বা একটি কখনও বা অন্যটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং সেই সেই যুগের উপর একটা বিশেষ ছাপ দিয়া গিয়াছে। কখনও বা প্রথমটি বিকাশ প্রাপ্ত হইবার অনেক কাল পরে সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া, সহস্র প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া তবে সমাজে সভ্যতার দ্বিতীয় অঙ্গটি পুষ্টিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং পুষ্টিলাভ করিয়া সভ্যতাকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু যদি সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখা যায় তাহা হইলে এই উভয় প্রকারের উন্নতির মধ্যে যে যোগসূত্র আছে তাহা আবিষ্কার করা যায়। বিধির বিধানের গতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। সে কল্য যে বীজ বপন করিয়াছে, অদ্যই তাহার ফল ফলাইবার জন্য ব্যস্ত নহে। ফল তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফলিবেই, হয়ত শত শত বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে নয়। বিধাতার নিকট সময়ের কোন মূল্য নাই। সময়ের দূরত্ব তাঁহার নিকট তুচ্ছ, এক এক পদক্ষেপেই কত কত যুগ অতিক্রান্ত হইয়া যায়। খৃষ্টধর্ম্ম মানুষের নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন নূতন উৎপ্রাণনা আনিয়া দিবার কত শতাব্দী পরে, কত অসংখ্য ঘটনার পরে, তবে মানুষের সামাজিক জীবনে সেই উৎপ্রাণনার যথোপযুক্ত ফল ফলিল। কিন্তু তাই বলিয়া এই ফল যে সে ফলাইতে পারে নাই, তাহা কে বলিবে?

যদি ইতিহাস ছাড়িয়া সভ্যতার ঐ দুই অঙ্গের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা যায় তাহা হইলেও আমরা সেই একই সিদ্ধান্ত পাইব। যখন অন্তরের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, যখন মানুষ নূতন কোন একটা ভাব বা গুণ বা বৃত্তি লাভ করে, এক কথায় যখন তাহার ব্যক্তিগত সত্তা পুষ্টিলাভ করে, তখন সে কি চায়, সে কি অভাব বোধ করে? সে চায় তাহার নূতন ভাব চতুষ্পার্শ্বস্থ মানববৃন্দের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে, সে চায় তাহার অন্তরের বস্তুকে বাহিরের জগতে বাস্তব প্রতিষ্ঠা দিতে। যখনই মানুষ নূতন কিছু পায়, যখনই তাহার অন্তরে বিশ্বাস হয় যে তাহার একটা নূতন পরিণতি লাভ হইয়াছে, তখনই সে সেটিকে নিজস্ব করিয়া ভাবে।

তাহার নিজের জীবনে সে যে নূতন পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য সে একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা অনুভব করে। এই প্রেরণা হইতেই বড় বড় সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। যে সকল শক্তিমান পুরুষ নিজে রূপান্তরিত হইয়া জগতের রূপান্তরসাধন করিয়াছেন, তাঁহারা একমাত্র এই অভাববোধের দ্বারাই প্রেরিত ও চালিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন।

আবার ধরুন সমাজে একটা বিপ্লব, একটা আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সমাজব্যবস্থা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত; সম্পত্তি ও অধিকার এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সমান ভাবে সমাজে সর্ব্বত্র বণ্টিত; অর্থাৎ এখন মানুষের শাসন ব্যবস্থায়, পরস্পর ব্যবহার ন্যায় ধর্ম্ম ও দয়াধর্ম্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপনারা কি মনে করেন সমাজের এই উন্নতি, মানব জীবনের বাহ্যব্যাপারের এই সংস্কার, মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের, মানুষের মনুষ্যত্বের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না? প্রাচীন প্রথা, প্রাচীন দৃষ্টান্ত, মহৎ

আদর্শের প্রভাব সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হয়, তাহা কি এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যে বাহ্যজগতে কল্যাণ ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্তর্জগতেও কল্যাণ ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজে ন্যায়ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইলে মানুষের অন্তরেও ন্যায়ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়, অন্তরঙ্গের দ্বারা যেমন বহিরঙ্গ সংস্কৃত হয়, বহিরঙ্গের দ্বারা তেমনি অন্তরঙ্গের সংস্কার সাধিত হয়, অর্থাৎ সভ্যতার দুই অঙ্গ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ? এই দুই অঙ্গের বিকাশের মধ্যে বহু শতাব্দীর, বহু বাধাবিপত্তির ব্যবধান থাকিতে পারে, একটি অপরটির সহিত যুক্ত হইবার পূর্ব্বে সহস্র রূপে রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইবেই হইবে। ইহাই তাহাদের ধর্ম্ম ও প্রকৃতি, ইহাই ইতিহাসের প্রধান তথ্য, ইহাই মানব জাতির সহজ সংস্কার।

এখন বোধ হয় সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকটা পরিস্কার করা গিয়াছে। সভ্যতা কাহাকে বলে, সভ্যতার সীমা কতটুকু, সভ্যতাসম্পর্কীয় এইরূপ প্রধান প্রধান মৌলিক প্রশ্নগুলি একরূপ মোটামুটি আলোচনা করা গিয়াছে। এইখানে আমরা আর একটি প্রশ্ন তুলিব। প্রশ্নটি ইতিহাসের প্রশ্ন নহে, এটি একটি দার্শনিক সমস্যা। এ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হয় ত মানব বুদ্ধির অতীত, কিন্তু পদে পদে আমাদিগকে এইরূপ সমস্যার একটা না একটা সমাধান করিয়া লইতে হয়, নচেৎ জীবনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

সভ্যতার যে দুইটি অঙ্গের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে কোন্‌টি উদ্দেশ্য, কোনটি উপায়; কোন্‌টি মুখ্য, কোনটী গৌণ? মানুষ কি সামাজিক উন্নতির জন্যই, ঐহিকজীবনের সুখশান্তির জন্যই নিজের অন্তর্বৃত্তি গুলির বিকাশ সাধন করে? না, সমাজ কেবল মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার, মানুষের অন্তর্বৃত্তিগুলির বিকাশ, পরিপুষ্টি ও স্বচ্ছন্দলীলার ক্ষেত্র মাত্র? অর্থাৎ মানুষ সমাজের দাস, না সমাজ মানুষের দাস? এ প্রশ্নের উত্তর পাইলে তবে আমরা বুঝিতে পারিব মানবজীবনের চরম পরিণতি সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ কি না; সমাজের সেবাতেই মানুষের সমস্ত নিজস্ব নিঃশেষিত হইয়া যায়, না, ইহা ছাড়া মানুষের আরও কিছু এমন অমূল্য সম্পদ আছে যাহা পার্থিব জীবন হইতে শ্রেষ্ঠ।

বন্ধুবর রোয়াইয়ে কোলার (Royer Collar) তাঁহার নিজের বিশ্বাস অনুসারে এই প্রশ্নের একটা সমাধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মদ্রোহ অপরাধ আইন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন :—"বিভিন্ন মানব সমাজ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, জীবন ধারণ করে ও জীবন বিসর্জ্জন করে; পৃথিবীতেই তাহারা চরম পরিণতি লাভ করে। কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ মানুষকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সমাজের কার্য্যে নিজের শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত করিবার পরও তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার মহত্তম অংশটুকু, তাহার সর্ব্বোচ্চ মনোবৃত্তিগুলি অবশিষ্ট রহিয়া যায়। এই সকল অন্তর্বৃত্তিগুলির চর্চ্চাদ্বারা সে ভগবানের দিকে, পরলোকের দিকে, এক অদৃশ্য জগতে অজ্ঞাত আনন্দের দিকে উন্নীত হয়।"

আমি একথার উপর আর কিছু বলিব না। আমি স্বাধীন ভাবে এ প্রশ্নের বিচারেও প্রবৃত্ত হইব না। আমি প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াই সন্তুষ্ট। সভ্যতার ইতিহাসে এ প্রশ্নটি মাঝে মাঝে উঠে। সভ্যতার ইতিহাস যখন সম্পূর্ণ হয়, যখন আমাদের ঐহিক জীবন সম্বন্ধে

আর কিছু বলিবার থাকে না, মানুষ তখন জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারে না যে ইহাতেই কি সব শেষ হইল, এইখানেই কি মানবজীবনের চরম পরিণতি? সভ্যতার ইতিহাস আমাদিগকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন করিয়া দেয়, ইহাই তাহার শেষ প্রশ্ন. ইহাই চরম সমস্যা। সমস্যাটির স্থান ও গুরুত্ব নির্দ্দেশ করিয়াই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল মনে করি।

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে সভ্যতার ইতিহাস দুই বিভিন্ন প্রণালীতে, দুই বিভিন্ন প্রকার উপাদান লইয়া, দুই বিভিন্ন দিক হইতে আলোচিত হইতে পারে। ঐতিহাসিক কোন নির্দ্দিষ্ট যুগ বা যুগপরম্পরা ধরিয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট জাতির মধ্যে মানবচিত্তের অন্তরতম প্রদেশে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি মানুষের অন্তরে যত কিছু রূপান্তর, যত কিছু বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহা আলোচনা করিতে পারেন, চিত্রিত ও বিবৃত করিতে পারেন, এবং অবশেষে এইরূপে সেই দেশের ও সেই যুগের সভ্যতার এক ইতিহাস পাইতে পারেন। তিনি অন্য এক প্রণালীও অবলম্বন করিতে পারেন। মানুষের অন্তরঙ্গ সত্তার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া তিনি বহিঃসমাজের মধ্যে আপনার স্থান লইতে পারেন। স্বতন্ত্র ২ ব্যক্তির চিন্তা ও ভাবের বিচিত্র পরিবর্ত্তনের বিবরণ প্রদান না করিয়া তিনি বাহ্য ঘটনার, সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। সভ্যতার এই দুই প্রকারের ইতিহাস পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ; ইহারা পরস্পরের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। অথচ ইহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়; হয় ত পৃথক্ করাই উচিত, কারণ এইরূপে উভয় ইতিহাসের বিস্তৃত ও পরিষ্কার আলোচনা হইতে পারে। আমি বর্ত্তমান গ্রন্থে সভ্যতার অন্তরঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। আমি বাহ্যঘটনা লইয়া, দৃশ্যমান জগৎ লইয়া সমাজ লইয়া আলোচনা করিতে চাই।

আমরা প্রথমে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবাবস্থায়, রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগে ইউরোপীয় সভ্যতার সমস্ত উপাদান গুলি অনুসন্ধান করিতে চাই। সেই সুবিশাল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সমাজের কি অবস্থা ছিল তাহা মনোনিবেশপূর্ব্বক গবেষণা করিতে চাই। সেখান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সে গুলি পাশাপাশি সাজাইতে চেষ্টা করিব। পরে সে গুলিকে গতি দান করিয়া পরবর্ত্তী পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া তাহাদের বিচিত্র গতিপথ অনুসরণ করিয়া যাইতে চাই।

আমার বিশ্বাস এই আলোচনায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই আমাদের দৃঢ় ধারণা হইবে যে সভ্যতা এখনও অপরিণত বয়স্ক, জগতে সভ্যতার জীবনলীলা অবসানোন্মুখ হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। মানবচিন্তা এখনও যথাসম্ভব বিকাশ লাভ করে নাই। মানব জাতির ভবিষ্যৎ পরিণতির সমগ্র ধারণা করিতে এখনও বহু বিলম্ব। প্রত্যেকে যদি নিজের মনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের সঙ্গে বাস্তব জগতের তুলনা করিয়া দেখি, তাহা হইলেই স্পষ্ট ধারণা হইবে যে সভ্যতা ও সমাজ বাস্তবিকপক্ষে এখন অত্যন্ত শিশু; বুঝিতে পারিব যে যদিও তাহারা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তথাপি তাহাদের গন্তব্যপথের তুলনায় সে দৈর্ঘ্য নিতান্ত তুচ্ছ। তাহাতে আমাদের বিষণ্ণ হইবার কোনই কারণ নাই। আমি যখন গত পঞ্চদশশতাব্দীব্যাপী ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী

আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিব, তখন দেখিতে পাইবেন আমাদের সময় পর্য্যন্তও কি সামাজিক ব্যাপারে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষকে কত পরিশ্রম, কত চেষ্টা করিতে হইয়াছে, কত ঝঞ্ঝা বিপ্লব অতিক্রম করিতে হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মানব সমাজকে যেমন ক্লেশ পাইতে হইয়াছে, মানবাত্মাকেও সেইরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। আপনারা দেখিবেন যে কেবল আধুনিক যুগেই মানুষের মন কতকটা শান্তি ও শৃঙ্খলার আভাস পাইয়াছে। সমাজ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। সমাজ যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বের সঙ্গে তুলনায় সমাজ হইতে এখন অন্যায় ও উদ্বেগ অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, যেন নিজেদের উন্নতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা অহঙ্কার ও আলস্যের কবলে নিপতিত না হই। আমাদের মানসিক উন্নতিতে অতিমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা যেন আধুনিক কালের অনায়াসলব্ধ বিলাস ও শান্তিতে আপনাদের মনুষ্যত্ব হারাইয়া না ফেলি।

আমাদের অন্তরের আকাঙ্খা উদ্দাম ও প্রবল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু কার্য্যকালে আমরা হতাশ হইয়া পড়ি, উদ্যমের একান্ত অভাব হইয়া পড়ে। আমাদের এই দুই চরিত্রগত দোষ যেন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া না ফেলে। আমরা যেন পূর্ব্ব হইতে আমাদের শক্তি, জ্ঞান ও যোগ্যতায় যথার্থ পরিমাপ লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকি। যেন আমাদের সাধ্যাতীত কোন বাঞ্ছা বা দুরাকাঙ্খা আমাদিগকে উন্মত্ত না করিয়া তোলে।

অনেক সময় আমাদের দুরাকাঙ্খা চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্য সমস্তই উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হই। অথচ পূর্ব্বকালের বর্ব্বরসুলভ উদ্যম বা কর্ম্মঠতা আমাদের নাই। এইরূপ আমাদের বর্ত্তমানের যে উন্নতি লইয়া গর্ব্ব করি, সেই উন্নতির মূলে যেন আমরা কুঠারাঘাত না করি। ন্যায়পরতা, বিধিপরতন্ত্রতা, প্রকাশ্যতা ও স্বাধীনতা—আমাদের সভ্যতার এই কয়েকটি মূলমন্ত্র যেন আমরা সুদৃঢ়ভাবে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত ধরিয়া রাখি। একথা যেন আমরা মনে রাখি যে আমরা যেমন সমস্ত ব্যাপার স্বাধীনভাবে বিচার ও পরীক্ষা করিয়া লইতে চাই, সেইরূপ আমাদের আচরণের উপরও জগতের দৃষ্টি রহিয়াছে। যথা সময়ে আমরা এই বিষয় আলোচনা করিব।

শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ।

তরল বায়ু

বায়ু জিনিষটির প্রকৃত স্বরূপ অনেকেই অবগত নন। এই রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন পদার্থটির অস্তিত্ব সম্বন্ধেও হয়ত অনেকে সংশয় প্রকাশ করিতেন, যদি ইহা প্রবল ঝটিকারূপে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হইয়া ঘর বাড়ী গাছপালা ভাঙ্গিয়া ও নদীপথে তরী, জাহাজ ও বাষ্পীয়পোত ইত্যাদিকে জলমগ্ন করিয়া তাহার অসাধারণ প্রতাপ আমাদিগকে অনুভব করিতে না দিত। মানুষ স্বভাবতঃ রূপের উপাসক; আকারবিহীন অরূপের কল্পনা বা ধ্যান তাহার পক্ষে সহজসিদ্ধ নয়; কাজেই এই নিরাকার বায়ু জিনিষটির প্রকৃত স্বভাব বা ধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে প্রাচীন রসায়নবিদ অগ্রণী মনীষিগণেরও অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল, নানাবিধ ভ্রমাত্মক তত্ত্ব ইহার সম্বন্ধে প্রচারিত ও প্রচলিত হওয়ার পর, মাত্র ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে আধুনিক রসায়নীবিদ্যার জন্মদাতা মহামতি লেভইশিয়ার (Lavoisier) তাঁহার বিখ্যাত পরীক্ষার ফলে ইহার প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করেন। এই গোপন রহস্যের প্রকাশ হওয়ার পরেই রসায়নীবিদ্যা চরম সত্যের অভিমুখে তড়িৎবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। যদিও বায়ু জিনিষটিকে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু ইহাই আমাদের জীবনের প্রধান সম্বল, খাদ্যের অভাবে মানুষকে প্রায় ৮০।৯০ দিন অবধি বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে, জলের অভাবেও পিপাসী মানবকে কয়েক ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু বায়ুর অভাবে ৫ মিনিট কালও বাঁচিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব, আমরা অহরহই নাকের ভিতর দিয়া দেহাভ্যন্তরে এই বায়ু গ্রহণ করিতেছি, যদি কেহ আঙ্গুলের সাহায্যে নাক দু'টি বন্ধ করিয়া রাখেন, আমাদের দেহরক্ষার জন্য বায়ুর একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন এই বায়ুই আবার শব্দ তরঙ্গের বাহক, ইহার অভাবে আমরা কোনও শব্দ শুনিতে পাইতাম না; সঙ্গীতের মধুর আস্বাদ গ্রহণে আমরা অক্ষম হইতাম, এমন কি একে অন্যের কথাও শুনিতে পাইতাম না, ফলে এই শব্দময় জগতে এক নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা অচল ভাবে বিরাজ করিত।

এই বায়ুরই প্রচণ্ড ঝটিকারূপে বিস্মিত ও ভীত হইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। এমন কি এখনও মহাবীর পবনতনয় শ্রীরাম চন্দ্রের বরে অমরত্ব লাভ করিয়া উত্তরপশ্চিম ভারতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে ইহা পঞ্চভূতের অন্তর্ভূত, এবং সৃষ্ট জগতের একটি প্রধান মৌলিক উপাদানরূপে গণ্য হইয়াছে, এই গেল ইহার প্রথম জীবনের কাহিনী।

লেভইশিয়ারের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে বায়ু একটি মৌলিক পদার্থ বলিয়াই গণ্য হইত, কিন্তু লেভইশিয়ার যখন ইহার প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করিলেন তখন দেখা গেল ইহা অম্লজান (oxygen) ও যবক্ষারজান (nitrogen) নামক দুটি বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে উদ্ভূত, শেষোক্ত পদার্থ দুটীও বায়ুর মত রূপরসগন্ধ ও অবয়বহীন। এই বায়ু সৃষ্ট জগতের চতুর্দ্দিকে

৫০ মাইল উর্দ্ধে অবধি বেষ্টনী স্বরূপ রহিয়াছে, ইহাতেই প্রাণীর জীবন রক্ষা হয়। ইহার প্রথম উপাদান অম্লজানই প্রাণীর দেহরক্ষা করে; ইহাই নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া প্রাণী তাহার দেহাভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলি নিষ্পন্ন করে। দ্বিতীয় উপাদান যবক্ষারজান ইহার সহিত মিশ্রিত থাকিয়া প্রাণী দেহের উপর অম্লজানের ক্রিয়াকে মৃদুভাব ও সমতাপ্রদান করে, নতুবা একমাত্র অম্লজানের ক্রিয়ার প্রখরতায় অত্যধিক আনন্দ ও বীর্য্যোৎসাহে প্রাণীগণের দেহ যন্ত্রটী অচিরেই বিকল হইয়া যাইত। অম্লজানের উপস্থিতির দরুণই আমরা অগ্নি প্রজ্বালন করিতে সক্ষম হইয়াছি; কারণ অম্লজানের অভাবে কোন জিনিষ জ্বলিতে পারে না, এই খানেও বায়ুর যবক্ষারজান অম্লজানের প্রখর ক্রিয়াকে সমতা দান করে। তাহা না হইলে কোন আকস্মিক কারণে সমস্ত জগত পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত যবক্ষারজান উদ্ভিদের দেহরক্ষারও সহায়তা করে; সুতরাং আমরা দেখিতে পাই বায়ু পদার্থটীর অভাবে জীব জগতের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না।

এখন প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের দিকে মনোযোগ করা যাক্। আমাদের বিষয় "তরল বায়ু"। "তরল বায়ু" শব্দটির অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে বায়ু পদার্থটির স্বাভাবিক ও সাধারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, আমরা ইতস্ততঃ সৃষ্টজগতের মধ্যে যে সমস্ত জিনিষ দেখিতে পাই তাহাদিগকে "পদার্থ" নামে অভিহিত করা হয়। এই সকল পদার্থকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর পদার্থ সমূহ স্বকীয় অবয়ববিশিষ্ট; ইহারা ইহাদের অবয়ব ও অধিকারস্থান বাহ্যশক্তির প্রভাব ভিন্ন কখনও আপ না হইতে পরিবর্ত্তন করেনা; যথা—মাটীর ঢেলা, লোহার পিণ্ড, পিতলের থালা, রূপার টাকা, মিশ্রির দানা, মার্ব্বেল পাথরের টুকরা, বরফের খণ্ড, গন্ধকের দানা ইত্যাদি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থ সমূহের কোন স্বকীয় অবয়ব বা আকার নাই। যখন যে আধার বা পাত্রে ইহাদের রাখা হয়, সে আধার বা পাত্রের আকারই ইহারা ধারণ করে, ইহারা সাধারণতঃ চঞ্চল এবং অবকাশ পাইলেই চারিদিকে গড়াইয়া যায়, পাত্রের কোথায়ও ছিদ্র পাইলে উহার মধ্য দিয়া ইহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু উর্দ্ধদিকে ইহারা আপনা হইতে উঠিতে পারে না, উদাহরণ যথা—জল, সরিষার তৈল, দুগ্ধ, সুরা, মধু, পারদ ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণীর দ্রব্য সমূহেরও কোন স্বকীয় অবয়ব নাই। ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল ও গতিশীল, ইহাদের একস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা সহজ নহে, উর্দ্ধে, অধে দক্ষিণে ও বামে ইহারা অনবরত চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। কোন ভাণ্ডে ইহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ইহারা ভাণ্ডের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসে; এবং রন্ধ্র পাইলে ঐ পথে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পালায়। ইহাদের গতি সর্ব্বত্র, ইহারা সবাই স্পর্শগুণহীন, উদাহরণ যথা:—বায়ু, জলীয় বাষ্প যাহা জল গরম করিলে উত্থিত হয়, ধোঁয়া, কোল্‌গ্যাস বা জ্বালানী গ্যাস যাহা কয়লা পুড়িয়া তৈয়ার হয়, এসিটিলিন (acetylen) গ্যাস যাহা এখন গ্রামেও উৎসবাদিতে জ্বালান হয়, গন্ধকাম্লগ্যাস যাহার উৎকট গন্ধ গন্ধক পোড়াইলে পাওয়া যায়, marsh gas যাহা জলা জমী হইতে উত্থিত হয় এবং যাহা অগ্নিসংস্পর্শে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে; ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, পদার্থসমূহের এরূপ বিভিন্নতার কারণ কি? কি কারণে তাহারা এরূপ বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হয়? ইহার

উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে অণুপরমাণুবাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। বহু পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পদার্থমাত্রেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুর সমবায়ে গঠিত। এই অণুও আবার এক বা ততোধিক পরমাণুর সমষ্টি। আমরা এখানে অণুতত্ত্বসম্বন্ধেই শুধু আলোচনা করিব; তাহাতেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা ব্যাখ্যা করিতে পারিব। আমরা দেখিয়াছি পদার্থরূপ ইমারতের এক একখানি ইষ্টক এক একটি অণু। তবে এই অণুগুলি অত্যন্ত চঞ্চল। একটু তাপ পাইলেই ইহারা ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে চাহে, এবং শৈত্যাধিক্যে আবার একত্র জড়ীভূত হইয়া যায়। উপরে যে তিন শ্রেণীর পদার্থের বিষয় বলা হইল পণ্ডিতেরা উহাদের যথা ক্রমে নামকরণ করিয়াছেন—কঠিন পদার্থ (Solid), তরল পদার্থ (Liquids) এবং মারুত পদার্থ (Gas)। আমাদের বায়ু একটি মারুত পদার্থ। এখন অণুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতেই এই তিন প্রকার পদার্থের বিভিন্নতার কারণ আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব, প্রথমতঃ মারুত পদার্থের বিষয় আলোচনা করা যাক। এই জাতীয় পদার্থের অণুসমূহ একে অন্য হইতে দূরে অবস্থিত এবং এই ব্যবধান হেতু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ শক্তির প্রভাব খুব ক্ষীণ, ফলে অণুসমূহ তাহাদের নিজ ধর্ম্মগুণে চারিদিকে অবাধ্য শিশুর দলের মত ছুটিয়া বেড়ায়।

তরল পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে ব্যবধান মারুত পদার্থ হইতে কিছু কম। ফলে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি কিছু জাগিয়া উঠে, এই অবস্থায় অণুসমূহ তাহাদের চিরচঞ্চলতা সত্ত্বেও একে অন্যকে ছড়াইয়া বহুদূর যাইতে পারে না। যাইবার সুযোগ ঘটিলেও পরস্পরের আকর্ষণে সবাই পিপীলিকার দলের মত একসঙ্গে ছুটিতে থাকে। এই জন্যই তাহারা মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অতিক্রম করিয়া সবাই একসঙ্গে ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না, পরস্পরের আকর্ষণ শক্তি তাহাদের চঞ্চলতাকে কথঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে।

কঠিন পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান আরও কম। ফলে তাহাদের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ শক্তির প্রভাব খুব প্রবল, অণুসমূহের চিরচঞ্চলতা এখানে আকর্ষণ শক্তির নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত, কাজেই কঠিন পদার্থের অণুসমূহ একে অন্যকে ছাড়াইয়া যে পথ চলিতে পারে তাহা অতি নগণ্য। এখানে অণুসমূহ সেনাপতির আদেশে ব্যূহবদ্ধ সেনাদলের মত যে যাহার যথাযোগ্য স্থান প্রায় অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সুতরাং ইহারা ইহাদের স্বকীয় অবয়ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।

এমন কেহও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন মারুত পদার্থকে যথাক্রমে তরল ও কঠিন পদার্থে এবং কঠিন পদার্থকে যথাক্রমে তরল ও মারুত পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে কিনা? এইরূপ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক। আমরা দেখিয়াছি অণুসমূহের চঞ্চলতার মাত্রা ও আকর্ষণ শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির উপর পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা নির্ভর করে। এবং যে সব বহিঃশক্তির বলে এই চঞ্চলতা ও আকর্ষণ শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে সেই সমস্ত শক্তির প্রভাব এই অণুসমূহের উপর রীতিমতে প্রয়োগ করিলে অণুসমবায়ে গঠিত পদার্থের অবস্থান্তর অবশ্যম্ভাবী। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় উত্তাপাধিক্যে অণুসমূহের চঞ্চলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং শৈত্যাধিক্যে তাহা ক্রমশঃ কমিতে থাকে, চঞ্চলতা বাড়িলেই তাহারা পরস্পরের আকর্ষণ

শক্তিকে ছাড়াইতে বা অতিক্রম করিতে পারে, সুতরাং উত্তাপের সাহায্যে কঠিন পদার্থকে তরল এবং তরল পদার্থকে মারুতে পরিণত করা যাইতে পারে; অথবা শৈত্যাধিক্যে মারুত পদার্থকে তরল এবং তরল পদার্থকে কঠিনে পরিণত করা যায়। আবার পরীক্ষায় ইহাও দেখা গিয়াছে যে বাহিরের চাপের প্রভাবে মারুতপদার্থের স্থানাধিকারকে সঙ্কীর্ণ করা যাইতে পারে, কাজেই অণুসমূহের ইতস্ততঃ গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান কমিয়া যায়, ফলে আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়, সুতরাং চাপাধিক্যে মারুত পদার্থকে তরলে পরিণত করিবার সুযোগ ঘটে।

জল পদার্থটিকে আমরা ত্রিবিধ অবস্থাতেই সর্ব্বদা দেখিতে পাই, বরফরূপে ইহা কঠিন; জলরূপে তরল এবং জলীয় বাষ্পরূপে ইহা মারুত পদার্থ। কঠিন বরফ খণ্ডকে গরম করিলেই তরল হইয়া পড়ে; এবং তরল জলকে আগুণের উপর ফুটাইয়া তুলিলেই উহা বাষ্পে পরিণত হয়। অন্যদিকে আবার জলীয় বাষ্পকে যদি ঠাণ্ডা করা হয় উহা শিশির বিন্দুরূপে আবার তরল জল হইয়া পড়ে; এবং এই তরল জলই ঠাণ্ডায় জমিয়া কঠিন বরফ হইয়া পড়ে। সুতরাং একই পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা ইহার অন্তর্গত তাপের হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে, বাহির হইতে তাপ দিয়া ইহার অন্তর্গত তাপকে বাড়াইয়া দিলে অণুগণের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায় এবং কঠিন পদার্থের তরল ও মারুত অবস্থায় পরিণতির সুযোগ ঘটে। অন্যদিকে তেমন বাহিরের শৈত্যে যদি ইহার অন্তর্গত তাপকে নিষ্কাশিত করা যায়, তাহা হইলে অণুর চঞ্চলতা হ্রাস পাইয়া আকর্ষণ শক্তির ক্রিয়া প্রবল হইয়া পড়ে, ফলে মারুত পদার্থের তরল ও কঠিন অবস্থায় পরিণতির সহায়তা হয়।

প্রবন্ধের শিরোনামায় "তরল বায়ু" দেখিয়া হয়তঃ অনেকে প্রথম ইহার অর্থগ্রহণে সক্ষম হন নাই। এখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের এই রূপ-রস-গন্ধ ও অবয়ব-হীন বায়ুরূপ মারুত পদার্থকেও জলের মত তরল পদার্থে পরিণত করা কিছুই আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নহে। এখন এই বায়ুকে কিরূপে তরল করা হইয়াছে তাহারই বিস্ময়কর কাহিনী এখানে বিবৃত করিব।

প্রথমতঃ ক্রমশঃ চাপের মাত্রা বাড়াইয়া বায়ু বা তাহার একতম উপাদান অম্লজানকে তরলীভূত করিবার প্রয়াস হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক (Faraday) ফ্যারাডে, বারথেলো (Berthelot) এবং নেটেরার (Natterer) এইরূপ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বায়ু বা তাহার উপাদান অম্লজানকে তরল করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন, কিন্তু অন্যবিধ অনেক প্রকার মারুত পদার্থকে কেবল এইরূপ একমাত্র চাপের প্রভাবেই তরলীভূত করিতে তাঁহারা সমর্থ হইয়াছিলেন, ফলে ফ্যারাডে প্রথম সিদ্ধান্ত করিলেন যে বায়ু ও তাহার উপদানদ্বয় চিরমারুত পদার্থ। ইহারা সর্ব্বাবস্থাতেই মারুত থাকিবে; কোনও প্রকার বাহিরের শক্তির সাহায্যে ইহাদিগকে তরলীভূত করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী পরীক্ষার ফলে Faraday দেখিলেন যে প্রত্যেক মারুত পদার্থের এমন একটি উত্তাপের সীমা আছে যাহার উপরে ইহাকে কেবল মাত্র চাপের সাহায্যে কিছুতেই তরল করা যায় না; এই সীমাকে তাঁহারা "চরম তাপমাত্রা (critical temperature)

বলিয়া নামকরণ করিলেন, সুতরাং বায়ুকে বা তাহার উপাদানদ্বয়কে তরলীভূত করিবার তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত ব্যর্থ প্রয়াসের প্রকৃত কারণ এখন স্থিরীকৃত হইল। বোঝা গেল বায়ু বা তাহার উপাদানদ্বয়ের পক্ষে এই চরমসীমা অত্যন্ত নীচে; ক্রমশঃ শৈত্য প্রয়োগে এই চরম তাপমাত্রা অতিক্রম করিতে না পারিলে তাহাদিগকে কিছুতেই তরলীভূত করা যাইবে না।

এই সঙ্কেত পাইয়া জেনেভানগরবাসী পদার্থবৈজ্ঞানিক পিক্‌টেট Pictet ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বরে ক্রমশঃ শৈত্য প্রয়োগে অম্লজানকে শীতল করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে চাপের মাত্রা ভীষণভাবে বাড়াইয়া বায়ুর একতম উপাদান অম্লজানকে তরলে পরিণত করিতে সমর্থ হন; এই পরীক্ষায় তিনি অম্লজানের উপর সাধারণ বায়ুমণ্ডলের চাপের দুইশত গুণ চাপ (200 atmospheric pressure) প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এবং অম্লজানকে-১৩০°c (সেণ্টিগ্রেড) অবধি ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন। বিযুক্ত—১৩০° ডিগ্রি শৈত্যের মাত্রাটা কত তাহা অনেকেই হয় ত বুঝিতে পারিবেন না। যে তাপ মাত্রায় জল সিদ্ধ হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করে তাহাকে সাধারণতঃ ১০০° ডিগ্রি তাপমাত্রা বলিয়া ধারণা করা হয়। আবার বরফ সংযুক্ত জলের যে তাপমাত্রা তাহাকে সাধারণতঃ ০. ডিগ্রি বা শূন্য তাপমাত্রা বলিয়া ধরা হয়, সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় বরফ এবং জল ফুটিবার মধ্যে যে তাপের ব্যবধান তাহাকে একশত সমান ভাগে বিভক্ত করিলে আমাদের ব্যবহার্য্য এক একটি তাপমাত্রার পরিমাণ পাওয়া যায়। বরফ হইতেও যখন কোন দ্রব্য আরো অধিকতর শীতল হইতে থাকে তখন তাহার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির বা বরফের তাপমাত্রার নীচে নামিতে থাকে। এই রূপে যখন কোন দ্রব্যের তাপ শূন্যের নীচে আমাদের পূর্ব্বোক্ত গণনামতে ১৩০ মাত্রা নামিয়া যায় তখন তাহার তাপের পরিমাণকে বিযুক্ত—১৩০ ডিগ্রি বা মাত্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এতদ্ব্যতীত তাপ পরিমাপের অন্যবিধ প্রথাও প্রচলিত আছে।

১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে, পিকটেটের (Pictet) সমসাময়িক ফরাসী দেশীয় বৈজ্ঞানিক মহামতি কেইলিটেট্ (Caillitet) এক অভিনব উপায়ে বায়ুর উপাদান অম্লজানকে তরলীভূত করিতে কৃতকার্য্য হন। তিনি তাঁহার পরীক্ষার ফল ফরাসী দেশীয় বিজ্ঞান মহাসভায় (French Academy of Science) ২২শে ডিসেম্বর তারিখে জ্ঞাপন করেন, ঐ একই দিনে পিকটেটও তাঁহার পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সভায় প্রেরণ করেন। কেইলিটেট গুরুতর চাপের বলে আবদ্ধ অম্লজানকে পিকটেটের মত কেবলমাত্র বাহ্যিক শৈত্য প্রয়োগে শীতল করিতে প্রয়াস করেন নাই। তিনি এই চাপাবদ্ধ অম্লজানকে তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের রন্ধ্রপথে হঠাৎ উন্মুক্ত করিয়া দেন। অতি সঙ্কীর্ণস্থানে আবদ্ধ অসংখ্য অম্লজান অণু হঠাৎ মুক্তি পাইয়া তাহাদের স্বাভাবিক চঞ্চলতাধর্ম্মবশতঃ চরিদিকে ছুটিয়া পলাইতে থাকে। ঠিক যেন পাঠশালার গুরুমহাশয়ের বেতের ভয়ে বহুক্ষণ যাবৎ আবদ্ধ দুরন্ত শিশুর দল হঠাৎ ছুটি পাইয়া গৃহাভিমুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। গুরুতর চাপের প্রভাবে পূর্ণভাবে বিকাশপ্রাপ্ত পরস্পর অকর্ষণশক্তিকে ছিন্ন করিয়া চারিদিকে ছুটিয়া যাইতে অণুসমূহের প্রচুর তাপশক্তির অপচয় হয়, ফলে তাহারা অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়ে, এই স্বকৃত শৈত্যের প্রভাবে তাহাদের চঞ্চলতা ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং আংশিকভাবে তাহারা তরল অবস্থায় পরিণত হয়।

কিন্তু পিকটেট বা কেইলিটেট কেহই এই তরল মারুতকে কিছুক্ষণ অবধি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে বা অধিক পরিমাণে তৈয়ার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা শুধু পরীক্ষা-মন্দিরে তাঁহাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে যে বায়ু বা তাহার উপাদানসমূহকে তরল অবস্থায় পরিণত করা যাইতে পারে, মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র ইহাই দেখাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে পোলাণ্ডদেশবাসী বৈজ্ঞানিক রবলুইস্কি (Wroblewski) এবং ওলজুইস্কি (Olzewski) পিকটেটের প্রণালী অনুসরণ করিয়া ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে বায়ুর উপাদান অম্লজানকে জলের ন্যায় স্বচ্ছ তরল পদার্থে পরিণত করিতে এবং উহাকে বিন্দু বিন্দু রূপে অল্পপরিমাণে বিশিষ্ট শীতল পাত্রে সংগ্রহ করিতে ও সক্ষম হন।

এখন আমরা এই বায়ুকে কিরূপে প্রচুর পরিমাণে তরলীভূত করিয়া বহুবিধ হিতকর শিল্পকার্য্যে প্রযোগ করা হইতেছে তাহারই কাহিনী বিবৃত করিব। অনেকে হয়ত ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিবেন যে এতকাল এত চেষ্টার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে মাত্র কয়েক বিন্দু রূপে তরল অবস্থায় পাইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাকে যে মণে মণে উৎপন্ন করিয়া শিল্পকার্য্যের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, সম্ভবপর নহে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের বুদ্ধি কৌশলে এই অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হইয়াছে। এবং বর্ত্তমানে তরল বায়ু উৎপাদন একটি বৃহৎ ও আবশ্যকীয় শিল্পে পরিণত হইয়াছে।

যে সমস্ত প্রণালীতে বর্ত্তমানে বায়ুকে বহুল পরিমাণে তরল করা হইতেছে, তাহাদের মূলে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব। দুই প্রকার প্রণালীতে বর্ত্তমানে বায়ুকে তরল করা হইতেছে।

প্রথম প্রণালী কেইলিটেটের প্রণালীরই অনুরূপ। অর্থাৎ গুরুতর চাপাবদ্ধ বায়ুকে হঠাৎ রন্ধ্রপথে পলায়ন করিতে দেওয়া হয়। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি এইরূপ অকস্মাৎ আয়তন প্রসারের দরুণ অণুসমূহের তাপশক্তির বহুল অপচয় হয়। ফলে তাহারা তাহাদের চঞ্চলতা হারাইয়া কথঞ্চিৎ শীতল হইয়া পড়ে, পরস্পর আকর্ষণশক্তির বিরুদ্ধে প্রসারিত হইতে যাইয়া অণুসমূহ তাহাদের স্বকীয় তাপশক্তি হারাইতে থাকে। এইরূপ বারম্বার সঙ্কোচন প্রসারণের ফলে বায়ুর অণুসমষ্টি ক্রমশঃ শীতল হইয়া তরল অবস্থায় পরিণত হয়। এই প্রণালীকে আভ্যন্তরীণ কার্য্যকৃত তরল অবস্থায় পরিণতি এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

১৮৯৫ খৃঃ অব্দে জার্ম্মান অধ্যাপক লিণ্ডে (Linde) এবং তাহার কিছুকাল পরে ইংলণ্ডের হেম্পসন (Hampson) এই প্রণালীপ্রয়োগে বায়ুকে বহুল পরিমাণে তরলীভূত করিবার যন্ত্র আবিষ্কার করেন, বর্ত্তমানে পৃথিবীর অনেক শিল্পকেন্দ্রেই লিণ্ডে কৃত যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। ১নং চিত্রে ইহার একটি সরল প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। আভ্যন্তরীণ "ক" নলের মধ্যদিয়া গুরুতর চাপের অধীনে দমকলের সাহায্যে বিশুদ্ধ, শুষ্ক এবং শীতল বায়ুকে প্রেরণ করা হয়। বিশুদ্ধ ও শুষ্ক বলিবার বিশেষ কারণ আছে। বায়ুতে সাধারণতঃ বহুল পরিমাণে জলীয় বাষ্প বর্ত্তমান থাকে, একটু ঠাণ্ডা পাইলেই ইহা জমিয়া জল বা বরফ হইয়া পড়ে। বরফ হইলে কলের রন্ধ্রপথ ইত্যাদি আটকাইয়া পড়ে। সুতরাং ইহাকে পূর্ব্বেই বায়ু হইতে ছাড়াইয়া লইতে হয়। বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ইহাকে সহজেই বায়ু হইতে

অপসারিত করা যায়। এতদ্ব্যতীত বায়ুতে যথেষ্ট অঙ্গারাম্ল মারুত বা (Carbon dioxide gas) বর্ত্তমান থাকে। ইহাও অধিক শৈত্যের প্রভাবে বায়ু তরলীভূত হইবার অনেক পূর্ব্বেই তরল ও কঠিন হইয়া পড়ে। কঠিন হইলে জলীয় বাষ্পের মত ইহাও কলের যাবতীয় পথ বন্ধ করিয়া দেয়, সুতরাং ইহাকেও পূর্ব্বে বিশিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যের সহায়তায় বায়ু হইতে ছাড়াইয়া লইতে হয়। দমকলের প্রভাবে বায়ু গরম হইয়া পড়ে। সুতরাং দমকল হইতে বিনির্গত চাপাবদ্ধ বায়ুকে ঠাণ্ডাজলের সাহায্যে শীতল করিয়া পাঠান হয়, এই চাপাবদ্ধ শীতল বিশুদ্ধ ও শুষ্ক বায়ু "ক' নলের এক প্রান্তে "গ" চিহ্নিত রন্ধ্রপথে বাহির হইতে থাকে। এইরূপ ভাবে হঠাৎ মুক্তি পাইয়া পূর্ব্বোক্ত কারণে তাপশক্তির অপচয়ে ইহা ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। এই শীতল ও মুক্ত বায়ু "খ" চিহ্নিত বহির্নল ও আভ্যন্তরীণ "ক' নলের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া বিপরীত ভাবে পুনরায় দমকলে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই শীতল ও মুক্ত বায়ুর শৈত্যাবরণ হেতু রন্ধ্রাভিমুখী চাপাবদ্ধ বায়ুও ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতলতর হইতে থাকে। বারংবার এইরূপ গমন ও প্রত্যাগমনের প্রভাবে ক্রমশঃ শীতলতর বায়ু রন্ধ্রপথে মুক্ত হইয়া আরো শীতল হইয়া পড়ে। পরিশেষে এমন একসময় উপস্থিত হয় যখন রন্ধ্রপথ হইতে মুক্ত হওয়া মাত্রই অত্যধিক শৈত্যপ্রভাবে ইহা আংশিকভাবে তরলাবস্থায় পরিণত হয়। এই তরল বায়ু বিন্দু বিন্দু রূপে "ঘ" চিহ্নিত ভাণ্ডে সঞ্চিত হয়। ভাণ্ডের নিম্নস্থ রন্ধ্রবিশিষ্ট নল "ঙ" খুলিয়া ঐ তরল বায়ু ভাণ্ড হইতে বাহির করা যাইতে পারে।

এখন দ্বিতীয় প্রণালীতে যে বায়ুকে বর্ত্তমানে বহুল পরিমাণে তরল করা হইতেছে তাহার বিষয় আলোচনা করিব। আমরা দেখিয়াছি পরস্পর আকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করিতে যাইয়া বায়ুর অন্তর্গত তাপশক্তির হ্রাস ঘটে। এইরূপে অন্য কোন বাহ্যিক কাজ করিলেও অণুসমূহের শক্তির অপচয় হয় ইহাও পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, অর্থাৎ আমাদের যেমন কোন কাজ করিতে শক্তি ব্যয় করিতে হয় এবং গুরুতর কাজের দরুণ অধিক শক্তি ব্যয় করিলে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি, বায়ু বা অন্য কোন মারুত পদার্থের অনুসমূহের কোন কাজ করিতে হইলে ঠিক তদ্রূপ শক্তি ব্যয় হয়। এবং তাহাদিগকে দিয়া বহুক্ষণ যাবৎ গুরুতর কাজ করাইলে শক্তির অতিঅপচয়ে তাহারাও শ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহারা তখন তাহাদের স্বাভাবিক চঞ্চলতা হারাইয়া তরল পদার্থের অণুর মত কথঞ্চিৎ জড়ভাবাপন্ন হয়। এই অবস্থায় তাহাদিগকে তরলপদার্থের অণুর মত এক স্থানে ধরিয়া রাখা সম্ভব হয়, অর্থাৎ তাহারা তরল অবস্থায় পরিণত হয়। চালকবিহীন গাড়ী লইয়া ঘোড়া যখন দৌড়াইতে থাকে তাহাকে তখন ধরিয়া রাখা সহজ নহে; কিন্তু দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন সে অনায়াসেই ধরা দেয়। সেইরূপ স্বাভাবিক চঞ্চল ও গতিশীল বায়ুর অণুও ঘোড়ার মত কাজ করিতে করিতে শক্তি ব্যয় করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে। বাহ্যিক কাজ করিতে যাইয়া বহুল পরিমাণে তাপশক্তির ব্যয়ে যখন তাহারা অত্যন্ত শীতল বা জড় হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের তরল অবস্থায়ও পরিণতি ঘটে। প্রথমোক্ত প্রণালীতে বায়ুর অণুসমূহ শুধু পরস্পর আকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করিয়া থাকে, কোন বাহ্যিক আবশ্যকীয় কাজ তাহাদিগের নিকট হইতে আদায় করা হয় না, এই জন্যই প্রথম প্রণালীকে বৈজ্ঞানিকগণ "আভ্যন্তরীণ কাজের ফলে বায়ুর তরলাবস্থায়

পরিণতি" এই নাম দিয়েছেন; কিন্তু সহজেই দেখা যায় যে দ্বিতীয় প্রণালীতে বায়ুকে তরল করিবার অনেক সুবিধা আছে। প্রথমতঃ বায়ুর অণুসমূহের উপর গুরুভার কাজ চাপাইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদিগকে তরল করা যাইতে পারিবে, এবং এক ঢিলে দুই পাখী মারার মত বায়ুকে তরল করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার নিকট হইতে আমাদের আবশ্যকীয় অনেক কাজও আদায় করা যাইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ প্রথমোক্ত প্রণালীর মত ইহাতে বায়ুকে গুরুতর চাপের অধীনে প্রথমে আবদ্ধ করিতে হয় না, অল্পচাপ প্রয়োগেই সুফল পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাতে যথেষ্ট শক্তির অপচয় নিবারণ ও ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে। বহুকাল যাবৎ অনেক বৈজ্ঞানিক এই সুবিধার প্রণালীতে বায়ু তরল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, লিণ্ডেও তাহার মধ্যে একজন। কিন্তু কলকৌশল ও তাহার পরিচালনের নানাবিধ অসুবিধাহেতু তাঁহারা কেহই সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে লিণ্ডে প্রথমোক্ত প্রণালীতে বায়ুকে তরল করিবার উপায় আবিষ্কার করেন, কিন্তু ফরাসী দেশীয় বৈজ্ঞানিক ক্লাদ (Claude) বহুবৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও গবেষণার ফলে ১৯০২ খৃঃ অব্দে এই প্রণালীতে বায়ুকে বহুল পরিমাণে ও অতি সহজে তরল করিতে সক্ষম হন। তিনি পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ অসুবিধা নানা চেষ্টা ও উদ্ভাবনার সাহায্যে অতিক্রম করিয়া সফলতা অর্জ্জন করেন। ২নং চিত্রে "ক্লাদ" উদ্ভাবিত যন্ত্রের একটি সরল প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। এই প্রণালীতে বাহ্যিক কাজের ফলের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ কাজের ফলেরও সহায়তা পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা ইহাকে **"বাহ্যিক কাজের ফলে বায়ুর তরলাবস্থায় পরিণতি"** এই নাম দিয়াছেন। পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্রসমূহে লিণ্ডের ন্যায় ক্লাদের যন্ত্রের০ এখন বহুল ব্যবহার হইতেছে। এমন কি অনেক স্থলে পূর্ব্ব ব্যবহৃত লিণ্ডের যন্ত্রের পরিবর্ত্তে এই অধিক শক্তিশালী ক্লাদের যন্ত্র স্থান পাইতেছে। দমকলের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ "ক" নলের মধ্য দিয়া স্বল্প চাপে প্রেরিত শুষ্ক, বিশুদ্ধ ও শীতল বায়ু "গ" চিহ্নিত মটর যন্ত্রে প্রবেশ করিয়া বাহ্যিক কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই বাহ্যিক ও সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ কাজের ফলে মুক্ত বায়ু শীতল হইয়া পড়ে। তৎপর এই প্রসারিত মুক্ত শীতল বায়ু বিপরীত দিকে "খ" চিহ্নিত বহির্নল ও আভ্যন্তরীণ "ক" নলের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া দমকলাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে। মটরযন্ত্রাভিমুখী চাপাবদ্ধ বায়ু ইহার শৈত্যাবরণ হেতু ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে, এবং বাহ্যিক কাজের পর মটরযন্ত্র হইতে বহির্গত হইয়া আরো শীতল হইয়া পড়ে। বারংবার এই প্রণালীতে অন্তর ও বহির্গমনের ফলে বায়ু এতই শীতল হইয়া পড়ে যে পরিশেষে ইহা তরলাবস্থার "ঘ" চিহ্নিত ভাণ্ডে জমিতে আরম্ভ করে, তখন ভাণ্ডনিম্নস্থ রন্ধ্রমুখ খুলিয়া উহা বহির্পাত্রে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কি পরিমাণে এই তরল বায়ু নানাবিধ শিল্পের জন্য বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই তরল বায়ু হইতে সহজেই বায়ুর একতম উপাদান যবক্ষারজানকে (Nitrogen) বিভিন্ন করিয়া লওয়া হয়। এবং এই যবক্ষারজান অপর্য্যাপ্তপরিমাণে কৃত্রিম সার (উদ্ভিদের খাদ্য) প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। সারপ্রস্তুতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানা নরওয়ে দেশের অড্ডা (Odda) নামক

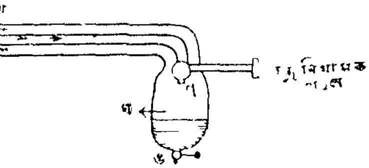

১ম চিত্র

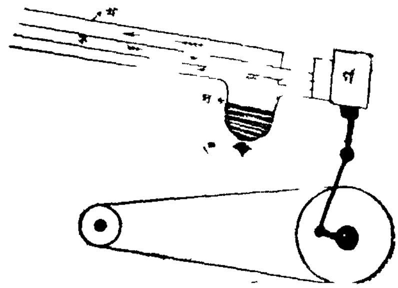

৩ নং চিত্র।

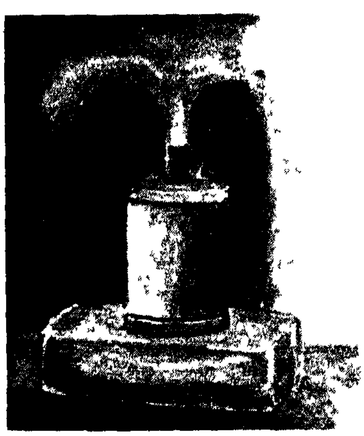

৪ নং চিত্র।

৫ নং চিত্র।

৬নং চিত্র।

৭নং চিত্র।

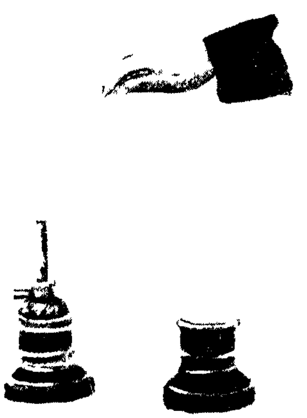

৮ নং চিত্র।

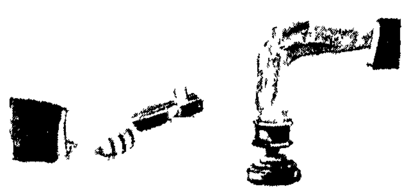

৯ নং চিত্র।

স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে বায়ু তরলীকরণের যে যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে উহাতে দৈনিক ১০০ টন ওজনের (১ টন আমাদের ২৭ মণের সমান) তরল বায়ু প্রস্তুত হয়।

তরল বায়ুর অদ্ভুত গুণাবলীর কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিয়া আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

তরলবায়ুর তাপমাত্রা বিযুক্ত ১৯৩·৫° ডিগ্রি (—193·5° c) অর্থাৎ বরফের যে শীতলতা তাহা অপেক্ষাও ইহার শৈত্য ১৯৩·৫ ডিগ্রি অধিক। আমাদের সাধারণ বায়ুমণ্ডলের তাপ ২৫° ডিগ্রি হইবে—অবশ্য খুব শীতপ্রধান দেশে নহে। কাজেই তরল বায়ু যখন আমাদের সাধারণ বায়ুর সংস্পর্শে আসিবে তখন জ্বলন্ত তপ্তলৌহের উপর প্রক্ষিপ্ত জলের ন্যায় মুহূর্ত্তেই ইহা উড়িয়া যাইবে, এখন আপনারা নিঃসন্দেহই এ প্রশ্ন করিবেন) তাহা হইলে কি করিয়া ইহাকে সঞ্চয় করা হয়। ৩ নং চিত্রে তরল বায়ু সংরক্ষণের পাত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। ইহারা সকলেই দ্বিপর্দ্দারূপ অঙ্গবিশিষ্ট কাচের পাত্র, দুই পর্দ্দার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পূর্ব্বেই বায়ুবিহীন করিয়া এই সমস্ত পাত্র গঠিত হয়। বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া লওয়া হয়। অধিকন্তু পর্দ্দা দুইটীর ভিতরের দিক্ উজ্জ্বল রৌপ্যাস্তরণে আবৃত করা হয়। ইহাদের নাম ডেওয়ারের (Dewar's Vacuum Vessel) বায়ুহীন পাত্র। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে তাপ শক্তি বা তাপতরঙ্গ জড় পদার্থের অণুর সহযোগ ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হইতে পারে না, এবং উজ্জ্বল মসৃণ পাত্রের ভিতর দিয়া ইহা প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পাত্রে তরল বায়ু সংগ্রহ করিলে বাহিরের তাপ পাত্রের মসৃণ গাত্র ভেদ করিয়া এবং পর্দ্দাভ্যন্তরস্থ বায়ুবিহীন অবকাশের মধ্য দিয়া তরল বায়ুতে পৌঁছিতে পারে না অতএব এইরূপে তরল বায়ু সংরক্ষণ করিলে উহা সহজে বাষ্পীভূত হইয়া পলায়ন করিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিযুক্ত ১৯৩·৫ ডিগ্রীর তাপে (—193·5 c) বা শৈত্যে তরলবায়ু জলের মত ফুটিতে থাকে। সুতরাং কোন সাধারণ পাত্রে তরল বায়ু রাখিয়া উহার চারিদিকে বরফ ঢালিয়া দিলেও উহা ভীষণ ভাবে ফুটিতে থাকিবে এবং উহা হইতে সজোরে বাষ্পীভূত বায়ু বিনির্গত হইতে থাকিবে। ৪নং চিত্রে এইরূপ পরীক্ষার নমুনা প্রতিকৃতির সাহায্যে দেখান গেল। পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন প্রকাণ্ড বরফের স্তূপের উপর স্থিত তরলবায়ুর পাত্র হইতে কিরূপ সজোরে বাষ্পোদ্গম হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের বহির্গাত্রের উপর বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প শৈত্য প্রভাবে জমিয়া বরফের আবরণ উৎপন্ন করিয়াছে। সাধারণতঃ এই পরীক্ষাকে "ঐন্দ্রজালিক বা মায়াময় কেতলি বা পাত্র" বলা হইয়া থাকে। কারণ এ যেন বরফের উপর বসাইয়া জল ফুটান হইতেছে।

কাজেই আমরা দেখিতে পাই বায়ু মণ্ডলের তাপে সাধারণ যে কোন পাত্রে তরলবায়ু সংরক্ষণ অসম্ভব। যদি পাত্রের মুখ ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয় তবে মুহূর্ত্তমধ্যেই সেই ছিপি বাষ্পীভূত বায়ুর বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ৫নং চিত্রে উহাই দেখান হইতেছে।

তরল বায়ু এতই শীতল যে যদি উহা হাতের উপর ঢালা যায় তবে আমাদের হাত জমিয়া পাথর হইয়া যাইবে বা আগুনে ঝল্‌সিয়া যেরূপ অসাড় হয় সেইরূপ দেখাইবে। এইরূপ অনুমান খুব স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই তরল বায়ু নির্ব্বিবাদে

হাতের উপর ঢালা যাইতে পারে; এমন কি মুহূর্ত্ত কাল অবধি ইহাতে আঙ্গুল ডুবাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিম্বা জলের মত কোন নলের সাহায্যে টানিয়া মুখ গহ্বরে লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে কোনই কষ্ট অনুভূত হয় না। তবে আঙ্গুল যদি অধিকক্ষণ ডুবাইয়া রাখা হয় তাহা হইলে আর রক্ষা নাই; উহা জমিয়া একটি শুষ্ক হলদে রংএর পদার্থের মতন দেখাইবে, এবং এতই ভঙ্গুর হইবে যে সজোরে আঘাত দিলে উহা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইবে, সেইরূপ মুখে টানিয়া লইবার সময় যদি হঠাৎ খানিকটা তরল বায়ু গিলিয়া ফেলা যায় তবে উহা পেটে যাইয়া দেহাভ্যন্তরীন উত্তাপে হঠাৎ বাষ্পীভূত হইয়া এমন বাড়িয়া উঠিবে পরীক্ষাকারীর উদর বেলুনের মত ফুলিতে থাকিবে এবং তৎক্ষণাৎ বিশেষ উপায়াবলম্বনে উহাকে নাকে মুখে বাহির করিয়া না দিলে বিপদ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে, তবে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য যে নির্ব্বিবাদে ইহাকে হাতের উপর ঢালা বা মুখের অভ্যন্তরে গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। অতিশীতল তরলবায়ু হাতের নিকটে আসিলেই শরীরের তাপে তখনই আংশিক ভাবে বাষ্পীভূত হইয়া পড়ে, সুতরাং হাতের চামড়ার সহিত তাহার সংস্পর্শ ঘটেনা। তবে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঢালিতে থাকিলে তরলবায়ুর নৈকট্য বশতঃ হাতও ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে, তখন ইহার সহিত শীতল বায়ুর সহজ সংস্পর্শ ঘটে। তখনত বিপদ অবশ্যম্ভাবী। একই কারণে মুখের অভ্যন্তরেও ইহাকে মুহূর্ত্তমাত্র রাখা যাইতে পারে, এখানেও দেরীতে বিশেষ বিপদ ঘটে; এ যেন ঠিক উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লোহার উপর শীতল জলের বিন্দু নিক্ষেপ করা হইতেছে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন এইরূপ অবস্থায় জল বিন্দুটি কিছুকালের জন্য লোহার সংস্পর্শে না আসিয়া উহার কিঞ্চিৎ উপরে শুধু নৃত্য করিতে থাকে, অবশ্য পরিশেষে অত্যধিক উত্তাপে উহা সম্পূর্ণ বাষ্পীভূত হইয়া যায়। ইহার কারণ, পড়িবা মাত্রই জ্বলন্ত লোহার প্রখরতাপে জলবিন্দুর কিয়দংশ বাষ্পীভূত হইয়া লৌহ ও উহার মধ্যে একটি ব্যবধান তৈয়ার করিয়া রাখে, তাহাতে জলবিন্দুটি কিছুক্ষণের জন্য লৌহ তাপ হইতে রক্ষা পাইয়া অবস্থিতি করিতে পারে, ৬নং ও ৭নং চিত্রে পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের পরীক্ষার প্রতিকৃতি দেখিতে পাইবেন।

আর একটি বিস্ময়কর পরীক্ষার বিবরণ উল্লেখ করিব। একটি নলসংযুক্ত ধাতু গোলক তরলবায়ুর ভিতর কিছুকালের জন্য ডুবাইয়া শীতল করিয়া যদি পুনরায় উহাকে কোন অগ্নি-শিখার ভিতর ধরিয়া রাখা হয় তবে কিছুকাল যাবৎ এই অগ্নিশিখার ভিতর উহার চারিদিকে ক্রমশঃ বরফের আবরণ পড়িতে থাকিবে, সত্যই ইহা বৈজ্ঞানিকের ইন্দ্রজাল! ইহার কারণ বিশেষ দুর্ব্বোধ্য নহে। তরলবায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া ধাতব গোলকটি প্রায় বিযুক্ত ১৯৩·৫ ডিগ্রির শৈত্য মাত্রায় শীতল হয়। তখন ইহাকে অগ্নিশিখার মধ্যে ধরিলে অগ্নিশিখাজাত জলীয় বাষ্প উহার সংস্পর্শে বরফ হইয়া উহার চারিদিকে জমিতে থাকে, অবশ্য কিছুক্ষণ পরে অগ্নিশিখার তাপে যখন ঐ ধাতব গোলকও পুনরায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে তখন এইরূপ অদ্ভুত দৃশ্য আর দৃষ্টিগোচর হইবে না। ৮ নং চিত্রে ইহাই দেখান হইতেছে।

আমাদের নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী, ফল ফুলুরি যেমন আঙ্গুর কমলালেবু ইত্যাদি জিনিষকে যদি তরলবায়ুতে ধুইয়া লওয়া হয় তবে উহা এতই শক্ত হয় যে উহা চিবাইয়া নরম

করা ত দূরের কথা, কাহারো মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। এক একটি আঙ্গুরফল যেন এক একটি মার্ব্বেল পাথরের বল বা গোলা হইয়া পড়ে, অবশ্য এই অবস্থা চিরস্থায়ী নহে, কিছুক্ষণ পরেই উহারা উহাদের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। খানিকটা পারদ যদি একটি কাচের নলে ঢালিয়া তরলবায়ুর মধ্যে ডুবাইয়া রাখা যায়, তবে উহার ভিতর পারদ জমিয়া এতই কঠিন হয় যে ঐ কঠিন পারদ নল হইতে বাহির করিয়া হাতুড়ির মত কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। ৯ নং চিত্রে এইরূপ পারদের হাতুড়ির সাহায্যে পেরেক পোতা হইতেছে ইহাই দেখান যাইতেছে।

আর একটি মাত্র অদ্ভুত পরীক্ষার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। একটি মৃদুভাবে জ্বলন্ত বা দীপ্ত দেশলাইএর কাঠি যদি তরলবায়ুতে ডুবান যায় অনেকেই মনে করিবেন যে অতিমাত্র শৈত্যের সংস্পর্শে উহা তৎক্ষণাৎ একেবারেই নিবিয়া যাইবে, কিন্তু ঠিক বিপরীত দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ নির্ব্বাণোন্মুখ দেশলাই কাঠি ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠে। অধিক উত্তাপ ও ভীষণ শীত যেন এই দৃশ্যে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া আছে দেখিতে পাইবেন। কথায় বলে ভাল মন্দ সবকিছুরই একই চরম পরিণতি ঘটে—Extremities meet! এইরূপ ঘটিবার কারণ নির্দ্দেশ কিছুই কঠিন নহে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি বায়ুর একতম উপাদান অম্লজান (oxygen) অগ্নিপ্রজ্বালনের প্রধান সহায়। তরল বায়ুতে ঐ অম্লজানও তরল অবস্থায় ঘনীভূত হইয়া আছে। এই ঘনীভূত অম্লজানের প্রভাবে অগ্নিশিখা সহজেই প্রবল হইয়া উঠে।

অন্তকার মত বায়ুর জীবন কাহিনী এই খানেই শেষ করি।

এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত চিত্র ক্লাদে কৃত Liquid Air নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়।

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(৭)

বঙ্কিম চন্দ্র

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের আলোচনার সময় বঙ্কিমের উপন্যাস সমূহের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়াছে। এখন কেবল কলাকৌশলের দিক্ দিয়া তাঁহার উপন্যাসাবলীর কালানুক্রমিক বিচার করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙ্গালা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে যে ক্ষীণতা, কল্পনাদৈন্য, ও ভাবগভীরতার অভাবের পরিচয় পাই, তাহার চিহ্ন বঙ্কিমের উপন্যাসে লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সব কয়টী উপন্যাসের মধ্যেই একটা সতেজ ও সমৃদ্ধ ভাব খেলিয়া যাইতেছে, জীবনের গভীর রস ও বিকাশগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে,

ও জীবনের মর্ম্মস্থলে যে নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহার উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। অবশ্য আধুনিক বাস্তব-প্রবণতার জন্য উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের রুচি ও আদর্শের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা যেরূপ নিখুঁত বাস্তবতার দাবী করি, রোমান্সের আকাশ বাতাসে পরিবর্দ্ধিত বঙ্কিম ততখানি দাবী পূরণ করেন না। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে একটা সাধারণ সত্য ধারণা দেওয়া যদি ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব হয়, এবং বাস্তবতা যদি সেই সত্যলাভের অন্যতম উপায়মাত্র হয়, তাহা হইলে আধুনিক বাস্তবাতিশয়ের অভাব বঙ্কিমের গুরুতর দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবে না ; কেননা, তাঁহার সমস্ত উপন্যাসের উপরই একটা বৃহত্তর সত্যের ছাপ বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তথ্যের রন্ধ্রগুলি তিনি কল্পনার দ্বারা পূরণ করিয়াছেন ; কিন্তু মোটের উপর তাঁহার জীবন চিত্রণ সত্যানুগামী হইয়া উঠিয়াছে ; জীবনকে বিচিত্র রসে পূর্ণ ও কল্পনার ইন্দ্রজালে বেষ্টন করিয়াছেন বটে কিন্তু সত্যের সূর্য্যালোকের পথ অবরুদ্ধ করেন নাই। ইহাই তাঁহার চরম কৃতিত্ব ; তিনি সত্যকে রসহীনতা ও নির্জ্জীবতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, জীবনের সত্য চিত্র দিতে গিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলেন নাই, পরন্তু বিচিত্র রসের উৎসারের মধ্যেই ইন্দ্রধনুবর্ণরঞ্জিত সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। এ সমস্ত বিষয়ের সাধারণ আলোচনা পরে হইবে ; এখন আমরা বঙ্কিমের প্রত্যেক উপন্যাস বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা কতদূর পর্য্যন্ত মানবহৃদয়ের গভীরস্তরে প্রবেশ করিয়াছে, ও জীবন সম্বন্ধে সত্য ধারণা ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস। ইহা ১৮৬৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। শচীশ বাবু তাঁহার বঙ্কিমজীবনীতে লিখিয়াছেন যে বঙ্কিমের ভ্রাতারা দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করেন নাই, এবং অনেকটা তাঁহাদের প্রতিকূল মন্তব্যে নিরুৎসাহ হইয়াই বঙ্কিম উহার মুদ্রাঙ্কণ কিছুদিন স্থগিত রাখেন। অবশ্য তাঁহাদের প্রতিকূল সমালোচনার হেতু কি ছিল, তাহা আমরা জানিনা ; কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই বিরুদ্ধ মত আমাদের নিকট একটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। আজকাল যুগান্তর শব্দটী আমরা যখন তখন ও নিতান্ত সামান্য কারণেই, অনেকটা ভাষাতে তীব্রতা যোজনার জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকি ; কিন্তু ইহা বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে দুর্গেশনন্দিনী বাস্তবিকই বঙ্গ-উপন্যাস-জগতে একটী যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আলালের ঘরের দুলালের সঙ্গে ইহার ব্যবধান বিস্তর ; আলালের ঘরের দুলালে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস সম্পূর্ণ দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, উপন্যাসের উপাদানগুলি অনেকটা বিক্ষিপ্ত ও আকস্মিক ভাবেই উপস্থিত থাকিয়া একটী রসমূলক ও মনস্তত্ত্বমূলক যোগসূত্রের প্রতীক্ষা করিতেছিল ; বিশেষতঃ ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্র উপন্যাসের নিকট রুদ্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এক মুহূর্ত্তে ইতিহাসের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়া উপন্যাসের সীমা, বিস্তার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আশ্চর্য্য ভাবে বাড়াইয়া দিলেন ; ইতিহাসের ঘটনাবহুল, উদ্দীপনাময় ক্ষেত্র হইতে বিচিত্র রস ও বর্ণ সংগ্রহ করিয়া, জীবনকে রঞ্জিত করিলেন, তাহার সাধারণ গতিবেগ বর্দ্ধিত করিলেন ও আমাদের দৈনিক হৃদয়-স্পন্দনকে দ্রুততর করিয়া দিলেন। ইতিহাসের সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তগুলিতে জীবনে যে অসাধারণ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঞ্চার হয়, আমাদের

সাধারণ জীবনের শীর্ণ নদীতে যে প্রবল স্রোতোবেগ প্রবাহিত হয়, তাহার পরিচয় দিলেন অতএব দুর্গেশনন্দিনী আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে একটী নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে; যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটী অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত পক্ষে রোমান্সের রাজপথ, এবং বঙ্গউপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম রচনায় অপরিণতির চিহ্ন অনেক। ইহার ঐতিহাসিক আবেষ্টনের বিরলসন্নিবেশের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। মোগল পাঠানের যুদ্ধ বৃত্তান্ত নিতান্ত ক্ষীণ রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে; ঐতিহাসিক পুরুষগুলির— মানসিংহ, কতলুখাঁ প্রভৃতির চরিত্রও বিশেষ গভীরতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সহিত চিত্রিত হয় নাই। ঐতিহাসিক প্রতিবেশ রচনা বঙ্কিমের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, বর্ণিত যুগের বিশেষত্ব ফুটাইয়া তোলাতেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না; তবে ঐতিহাসিক বিপ্লব একজন সাধারণ দুর্গস্বামীর ভাগ্যের উপর কিরূপ অতর্কিত বজ্রপাতের মত আসিয়া পড়ে, তাহার একটী জ্বলন্ত চিত্র আমরা উপন্যাসটিতে পাই। কয়েকটী ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদের মধ্যেই বঙ্কিম এই প্রলয় ঝটিকার প্রথম আবির্ভাব হইতে শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন; ইহাদের মধ্য দিয়া ঘটনা পুঞ্জ আশ্চর্য্য দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দিগ্গজ বিমলার সমস্ত লঘু হাস্য পরিহাসের অবাস্তবতাকে ছাপাইয়া এক অজ্ঞাত অথচ আসন্ন বিপদের শঙ্কা ঘনাইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুর্গজয়ের বিবরণ, ওসমানের কৌশল বিমলার সপ্রতিভতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বীরেন্দ্রসিংহের উন্মত্ত যুদ্ধচেষ্টা জগৎসিংহের বীরত্ব সমস্তই একটা প্রকৃত যুদ্ধের ভীষণতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। বীরেন্দ্রসিংহের বিচারের দৃশ্যে তাঁহার দৃঢ় তেজস্বিতা ও বংশ গৌরব সম্বন্ধে প্রচণ্ড অভিমান অতীতের উত্তেজনাময় ক্ষেত্রে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎক্ষেপের মত মানব মনের যে উদ্দাম বিকাশ হইয়া থাকে, তাহার একটী সুন্দর উদাহরণ। কতলুখাঁর হত্যার দৃশ্যটীও অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসময় ভাষার সাহায্যে একটী মদির মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অবশ্য এখানে বঙ্কিম উপন্যাস অপেক্ষা গীতিকাব্যেরই অধিকতর উপযোগী গুণের পরিচয় দিয়াছেন। কারাগারে আয়েষার প্রেমাভিব্যক্তিটীও চমৎকার কলাকৌশলের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে: একটা অপ্রত্যাশিত বিকাশের বিস্ময় আমাদের মনকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। এখানে বঙ্কিমের প্রণালী বাস্তব ঔপন্যাসিকের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; তিনি আয়েষার মনে প্রথম প্রণয় সঞ্চার ও উহার ক্রমবৃদ্ধির কোন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন নাই; তাহার সেবা ও সহানুভূতি যে কোন গোপন মুহূর্ত্তে প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল, বা ওসমানের প্রতি স্নেহের সহিত এই নবজাত প্রেমের কোন বিরোধ সংঘর্ষ হইয়াছিল কি না তাহার কোন পরিচয় দেন নাই; একেবারে পূর্ণবিকশিত অপ্রতিরোধনীয় প্রেমের বিকাশ দেখাইয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন, ও ইহার রহস্যময় প্রকৃতিটীর একটি নূতন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছেন। অবশ্য পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাসে আমরা এই সমস্ত ভাব বিকাশের একটি সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ, একটী প্রকৃতিমূলক ব্যাখ্যা আশা করিয়া থাকি; এবং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার পরবর্ত্তী দুই একখানি উপন্যাসে—'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষে' এইরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রথম উপন্যাসে, কতকটা ঐতিহাসিক ঘটনা বাহুল্যের জন্য, ও কতকটা একটা অপ্রত্যাশিত পরিণতির অবতারণার দ্বারা গল্পাংশের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার জন্য, এরূপ মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অবশ্য মনস্তত্ত্ব আলোচনার দিক্ হইতে ইহাকে একটি ত্রুটি বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

চরিত্র সৃজনের দিক্ দিয়াও বঙ্কিম এই উপন্যাসে খুব উচ্চ অঙ্গের কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই; চরিত্র ফোটাইয়া তোলা এখানে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল বলিয়াও মনে হয় না। ঘটনার প্রবল প্রবাহের মধ্যে তিনি কোথাও অধিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পান নাই, ঐতিহাসিক স্রোতের মধ্যে দীর্ঘ ও গভীর চরিত্র বিশ্লেষণের অবসর পান নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অনেকগুলি চরিত্র স্বল্প দুই একটা রেখায় বেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। দুই তিনটী দৃশ্যের মধ্যেই বীরেন্দ্র সিংহের চরিত্রের অসাম দার্ঢ্য ও অহঙ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওস্মানের হৃদয়ে একটী অনির্ব্বাণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তীব্র হিংসার বিকাশ দেখাইয়া বঙ্কিম তাহাকে একটী বাস্তব মূর্ত্তি করিয়া তুলিয়াছেন, একটা বিশেষত্বহীন আদর্শমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে দেন নাই। এই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ক্রোধেই তাহাকে একটা বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, একটী দেশ্‌কালোচিত উপযোগিতা আনিয়া দিয়াছে। স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে, তিলোত্তমা, বিমলা, ও আয়েষার রূপ ও প্রকৃতির বিভিন্নতা বঙ্কিম কেবল একটী অদ্ভুত শব্দসম্পদের দ্বারাই ফুটাইয়াছেন, 'তিলোত্তমা' ও 'আয়েষা' প্রায়ই নীরব, নিতান্ত স্বল্পভাষী, অথচ কেবল মাত্র নিপুণ শব্দচয়নের দ্বারা লেখক তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রকৃতিগত প্রভেদটী এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিলোত্তমার বালিকাসুলভ, ব্রীড়াবনত প্রেম-বিহ্বলতা, ও আয়েষার মহীয়ান্ গাম্ভীর্য্য ও গভীর আত্মসংযম, ইহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন যে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধে ভুল করিবার আমাদের কোনও অবসর থাকে না।

'দুর্গেশ-নন্দিনী' উপন্যাসে ঘটনা বৈচিত্র্য গল্পাংশের আকর্ষণই প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে; বিশ্লেষণ ও কথোপকথনের দ্বারা চরিত্র চিত্রণের তাদৃশ চেষ্টা হয় নাই। তথাপি দুই একটী স্থলে কথোপকথনেও বঙ্কিম বেশ দক্ষতা ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ শৈলেশ্বর মন্দিরে বিমলা ও জগৎসিংহের যে দুইবার কথোপকথন হইয়াছে, তাহার মধ্যে লেখকের যথেষ্ট শক্তি ও কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য কেবল গল্প রচনার দিক্ দিয়াও নবীন লেখকের যে দুই একটী ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া যায় না, এমন নহে। বিমলা ও বীরেন্দ্রসিংহের মধ্যে সম্বন্ধটী অনাবশ্যক জটিলতা ও রহস্যে আবৃত করা হইয়াছে; এবং বিমলার দীর্ঘ আত্মপরিচয়পত্রে কতকগুলি ব্যাপারের অসম্ভাব্যতা, পাঠকের বিদ্রোহোন্মুখ মনকে পীড়িত করিতে থাকে। দিগ্‌গজ-উপাখ্যানের সমস্তটাই, স্থানে স্থানে প্রকৃত রসিকতা থাকা সত্ত্বেও, মোটের উপর আতিশয্য ও অতিরঞ্জনের দ্বারা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক উপন্যাসেই যে সন্ন্যাসী জাতীয় একটা জীব প্রবর্ত্তন করিয়া অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করিবার পথটী খুলিয়া রাখেন, তাহার প্রথম নিদর্শন আমরা অভিরামস্বামীতে পাইয়া থাকি। অভিরামস্বামীর আখ্যায়িকার মধ্যে বিশেষ কোন কার্য্য নাই; তিনি কেবল বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের গোপন সম্বন্ধের একটা জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপই উপন্যাস মধ্যে স্থান লাভ

করিয়াছেন ; আর বীরেন্দ্রসিংহকে মোগল পক্ষ অবলম্বনের প্রবৃত্তি দিয়া গল্পের tragedy কে আসন্নতর করিয়া দিয়াছেন। তবে বঙ্কিম এই প্রথম উপন্যাসে তাঁহার সন্ন্যাসীকে একেবারে রমানন্দ স্বামী বা সত্যানন্দের মত আদর্শলোকের কুহেলিকার মধ্যে লইয়া যান নাই ; তাঁহাকে এক জ্যোতিষজ্ঞান ছাড়া আর কোন অতিমানবগুণের অধিকারী করিয়া দেখান নাই ; এমন কি তাঁহার যৌবনের পদস্খলনের পরিচয় দিয়া বাস্তবতার দিক হইতে যথেষ্ট সাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টের আর একটী লক্ষণও 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সূচিত হইয়াছে। বঙ্কিম তাঁহার প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই বাস্তব বর্ণনার মধ্যে একটা অতিপ্রাকৃতের ছায়াপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন উপন্যাসে এই অতিপ্রাকৃতের ছায়া সম্ভব অসম্ভবের সীমা রেখা অতিক্রম করিয়া যায় না ; মানুষের মানসিক অবস্থার সহিত একটা গূঢ় সাঙ্কেতিকতার সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে ; ইউরোপের নিতান্ত আধুনিক গল্প নাটকে যে একটা symbolism, একটা রহস্যের ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অনেকটা তাহারই অনুরূপ। ইহা প্রায়ই স্বপ্ন বা অন্য কোন গুরুতর মানসিক বিকারের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, এবং কোন কোন স্থলে ইহার একটী সন্তোষজনক মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর ও 'রজনী'তে শচীন্দ্রের স্বপ্ন উল্লেখ করা যাইতে পারে ; শৈবলিনীর বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কের নরক বিভীষিকার প্রতিচ্ছায়া ইহার চরম দৃষ্টান্ত। যোগবলের দ্বারা শৈবলিনীর অমানুষিক শক্তিলাভও চন্দ্রশেখরে স্থান পাইয়াছে ; আনন্দমঠে গ্রন্থশেষে যে মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই, তিনি যে অতিমানবেরও অনেক উর্দ্ধে তাহা স্বীকার করিতে আমাদের অণুমাত্রও দ্বিধা থাকে না। অবশ্য উপন্যাসের বাস্তবতার দিক্ দিয়া ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই অগ্রাহ্য ও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, বাস্তব জগতের শেষসীমা বা চরম সম্ভাবনার মধ্যেও তাহাদিগকে স্থান দিতে পারি না। কিন্তু সম্ভব হউক, অসম্ভব হউক, উপন্যাসের পক্ষে উপযুক্ত হউক, অনুপযুক্ত হউক, এই আলো-ছায়া-মিশ্র, রহস্য-সঙ্কেত-পূর্ণ বাস্তব-অবাস্তবের সীমান্ত প্রদেশের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের একটী স্বাভাবিক প্রবণতা ও দৃঢ় আকর্ষণ ছিল সন্দেহ নাই। তাঁহার সমস্ত অবাস্তব-ব্যাপারের মধ্যেও এমন একটা দৃঢ় সংযম ও সঙ্গতি, এমন একটা আন্তরিকতা ও অভ্রান্ত কল্পনা সমৃদ্ধির পরিচয় পাই, যাহাতে সেগুলিকে একটী উচ্চ সৃজনী-শক্তির ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য হই ; তাহারা যে কেবল কল্পনার বিলাস-বিভ্রম, বা অসংযত উচ্ছ্বাস-চাপল্য নহে, লেখকের অন্তঃকরণের একটী গভীর স্তরে যে তাহাদের মূল আছে, তাহা আমাদের স্বতঃই প্রতীতি জন্মে। বঙ্কিমের মধ্যে যে সুপ্ত কবিটী কবিতার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই, তিনিই যেন প্রতিশোধ লইবার জন্য ঔপন্যাসিকের বাস্তব-চিত্রগুলির উপর কল্পলোকের এক অসম্ভব আলোক নিক্ষেপ করিয়া উপন্যাসগুলিকে রহস্য-জটিল ও দুরধিগম্য করিয়া তোলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিলোত্তমা আরোগ্যলাভের পর জগৎসিংহের নিকট তাঁহার রুগ্নশয্যার যে স্বপ্নবিবরণটী বলিয়াছেন, তাহা এই নিগূঢ় সৌন্দর্য্যের আলোকে প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছে, অথচ উপন্যাসোচিত বাস্তবতার সীমাও লঙ্ঘন করে নাই। এই একটী ক্ষুদ্র বর্ণনাতেই তাঁহার কল্পনাশক্তির অসাধারণ ভবিষ্যৎ বিকাশের বীজটী পাওয়া যায়।

'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে আমাদের মতামতের একটা সংক্ষিপ্তসার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 'দুর্গেশনন্দিনী' ঐতিহাসিক উপন্যাস; সুতরাং চরিত্রাঙ্কণ অপেক্ষা ঘটনাবৈচিত্র্যের দিকেই লেখকের অধিক মনোযোগ। গল্প-রচনাতে নবীন লেখক যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন; ঐতিহাসিক বিপ্লব যে দুর্দ্দমনীয় বেগের সহিত সাধারণ জীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, কয়েকটি অধ্যায়ে তাহা বিশেষ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। চরিত্রাঙ্কণের দিক্ দিয়া খুব গভীর বাস্তবতা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিচয় পাই না; তবে গুরুতর বাহ্যঘটনার অভিভবের মধ্যে যতটুকু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকশিত হওয়া সম্ভব, বঙ্কিমচন্দ্র ততটুকু সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। বিমলা, জগৎসিংহ, কতলুখাঁ, বিদ্যাদিগ্‌গজ, আয়েসা, তিলোত্তমা—ইহাদের চরিত্রের খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ না হইলেও, লেখক ইহাদের গভীরতম বাস্তব স্তর স্পর্শ না করিলেও, ইহাদিগকে ছায়াময় বা প্রাণহীন বলিয়া কখনই মনে হয় না। বীরেন্দ্রসিংহ ও ওস্‌মানের ক্ষেত্রে, চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের জন্য, তাঁহাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আর একটু স্ফুটতর হইয়াছে। গভীর বিশ্লেষণ-শক্তির অভাব জন্য বঙ্কিমকে দোষ দিবার পূর্ব্বে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে সাধারণতঃ জীবনের যে অংশ আলোচিত হয়, তাহা খুব বাস্তব স্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না। কিন্তু একটা বাহ্য চাকৃচিক্য ও আদর্শ উজ্জ্বলতায় আপনাকে প্রকাশ করে—যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদের মধ্যে যেমন চিরন্তন পারিবারিক সুখ দুঃখের কথা চাপা পড়ে, সেইরূপ ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষের প্রাথমিক বাস্তব গুণগুলি একটা বীরোচিত প্রকাশ, একটা আদর্শ জ্যোতিঃমণ্ডলের অন্তরালে ঢাকা থাকে। এই হিসাবে বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস তাঁহার প্রতিভার অনুপযুক্ত দান হয় নাই ও পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাস সমূহের তুলনায় ইহা যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিখ

(১)

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অপচার রোধ করিবার উপায়রূপে অহিংস অসহযোগকে ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা, সমস্ত ভারতবর্ষ গান্ধীজীর বাণী শুনিয়া যখন এই প্রশ্নের কোন সত্য সমাধান করিতে পারিতেছিল না, তখন এই ভারতেরই এক প্রান্তে পঞ্চনদবিধৌত পাঞ্জাবে সমরকুশল শিখগণ তাহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের অপচার রোধ করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় ও পৌরাহিত্যের প্রবল শক্তিমান স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। অহিংসাকে এরূপ ব্যাপকভাবে জাতি বা ধর্ম্মহিসাবে নিজেদের সমগ্র জীবনে গ্রহণ করা ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালে কখনও হয় নাই। য়ুরোপের ইতিহাসের খৃষ্টীয়শতকের প্রথম যুগে পরাক্রান্ত রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান মুষ্টিমেয়, খৃষ্টের বাণীমুগ্ধ ভক্ত খৃষ্টিয়ানদিগের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে।

এতদিন সকলে জানিত সকল প্রকার অত্যাচারের প্রতিরোধের পন্থা হিংসামূলক আঘাতমূলক বিদ্রোহ ; সুতরাং শিখদের এই অহিংস সংগ্রামে সমস্ত ভারতবর্ষের উৎসুক দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িয়াছে।

তাহারা জয় লাভ করিয়াছে ; যদিও তাহাদের এ সংগ্রাম শেষ হয় নাই, যদিও রক্তবীজ-প্রাণ অপচার একের পর একটী করিয়া জন্ম লাভ করিতেছে, নূতন আকারে দেখা দিতেছে, তবুও একটী সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া, বিরোধের এই অভিনব পন্থা যে শ্রেয় এবং কাম্য, ইহা প্রমাণ করিয়া শিখগণ আজ জগতের ইতিহাসে এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু যে জাতি বৃটিশ বাহিনীতে নির্ভীক সমরকুশল শ্রেষ্ঠ সৈন্য যোগাইয়া আসিয়াছে, যে জাতি গুরুগোবিন্দের নেতৃত্বে মুসলমান অত্যাচারে, রণজিৎসিংহ ও ফুলাসিংহের অধীনে ইংরেজশক্তির সশস্ত্র প্রতিকূলতা করিয়া জয়লাভ করিয়াছে, যাহাদের জীবনে অহিংসা অপেক্ষা হিংসা এবং আঘাতই সহজবোধ্য ও সহজগ্রাহ্য, তাহারা কোন্ শক্তির প্রেরণায় এই অভিনব পথ গ্রহণ করিল এবং তাহাদের ধর্ম্মে ও সমাজধর্ম্মে কি এমন ছিল, যাহার জন্য তাহারা এই প্রতিকূল আবেষ্টনের ভিতরেও জয় লাভ করিল, এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে।

আজিকার দ্বিধাসঙ্কুল, সংশয়ক্ষুব্ধ রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের দিনেও এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাইলে অনেক সংশয় দূর হইতে পারে।

ইহার উত্তর পাইতে হইলে শিখধর্ম্মের ও জাতির ইতিহাস আলোচনা করার প্রয়োজন।

যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, ভারতের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে যে বিবিধ বিচিত্র ঐশ্বর্য্যে সম্পদবান করিয়া, যে একটী অখণ্ড জ্ঞানের তপস্যার ভারতবর্ষ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ হইয়া আমরা সে গুলির প্রতি উদাসীন আছি। তাই ভারতবর্ষের অখণ্ড মূর্ত্তিটী আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, তাই মারহাট্টার অভ্যুদয়, শিখের জাগ্রতি আমাদের ভারতের ইতিহাসে আগ্নেয়-গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতেরই মত বিচ্ছিন্ন, পৌর্ব্বাপর্য্যহীন বলিয়া মনে হয়।

আজ যে শিখ জাগিয়াছে, তাহার এ জাগ্রতি আকস্মিক নহে এ কথাটা বুঝিতে হইলে তাহাদের ধর্ম্ম ও জাতীয়তার কি ভাবে ক্রমবিকাশ হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাসের লুপ্তপ্রায় অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক দীন বেদিক্ষত্রিয়ের গৃহে জন্মলাভ করিয়া গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮) ভারতের ভূমিতে এই যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন, তেগ্‌বাহাদুর এই জাতিপ্রতিষ্ঠার যজ্ঞে নিজের জীবনাহুতি দিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ শিখধর্ম্মের ও জাতীয়তার যে উদ্বোধনে শস্ত্রপাণি ঋত্বিকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শিখ ধর্ম্ম ও জাতি ভারতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব স্থান গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। নানক আসিয়া দেখিলেন ভারতবর্ষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জাতীয়তাবোধহীন, গৃহকলহরত, ধর্ম্মবিমুখ, শতবন্ধনে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ; দেশ তখন পদে পদে সকল লাঞ্ছনা অবনতশিরে গ্রহণ করিয়া জয়চাঁদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ; ইহার প্রতিকারের কোন চেষ্টাই নাই।

তিনি প্রচার করিলেন এক পরব্রহ্মের উপাসনা, তিনি সৎ, শ্রী, অকাল। ব্রাহ্মণের

আভিজাত্যের ও দেশের শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তির পথ দেখাইবার জন্য, শিখ ও পন্থের সৃষ্টির সূত্রপাত করিয়া তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে মিলাইবার আয়োজন করিয়া গেলেন। তিনি জাতিভেদ মানিলেন না; সহস্রকোটী দেবতা মিলিয়া অজ্ঞ হিন্দুর মনে ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া যে তাহাদের জীবন বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, যে গুণকর্ম্মবিভাগজাত জাতিভেদের আদর্শের ব্যভিচারে ব্রাহ্মণ্যের অন্যায় অত্যাচার হইতেছিল, তাহা হইতে দেশকে মুক্তি দিবার জন্য তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরের দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলমান নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, সকলেই সমান"।

"শিখ" কথাটীর ব্যুৎপত্তি শাস্ ধাতু হইতে, তাহার অর্থ শিষ্য, শিখের জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে, দুঃখের সহিত, আভিজাত্যের সহিত, অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিতেই তাহার জন্ম, তাহার জীবন গুরুর কঠোর অনুশাসনে শাসিত। তাহার নিকট ব্যক্তিগত মুক্তিই একমাত্র কাম্য নহে, সমষ্টির মুক্তিও তাহার নিকট একান্ত সত্য, "পন্থ" তাহার জীবনে অনেকখানি স্থান পায়।

ভারতবর্ষে নানকের পূর্ব্বে অনেক সংস্কারকই আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের যুগের প্রয়োজনানুযায়ী পথনির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা অধিকাংশস্থলেই ব্যক্তির জন্য; সমগ্র দেশ বা জাতির জন্য তাহা প্রযুজ্য নহে; সমাজ, রাষ্ট্র তাঁহাদের নিকট অনেকটা অপ্রয়োজন। সংসার মিথ্যা; সমাজ, রাষ্ট্র সকলই মিথ্যা। ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া ন্যায় কি অন্যায়, সে বিচারের এখন প্রয়োজন নাই; যখন সমাজ ও সমাজধর্ম্মের মধ্যে ব্যভিচার প্রবেশ করে, যখন ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির আয়োজন চাই, একথা একান্ত সত্য।

সেই ব্যক্তির মুক্তিকেই যখন চরম এবং একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্র ও সমাজধর্ম্মের কথা ভুলিয়া যাই তখন তাহাতেও একটা মিথ্যার সৃষ্টি হয়। সমাজও যেমন একান্তভাবে সত্য নহে, ব্যক্তিও তেমন একান্তভাবে সত্য নহে; সেভাবে সত্যের সাধনা সমাজের ধ্বংসেরই কারণ হয় এবং সামাজিক যে শক্তি অল্পশক্তিমান্ জনসাধারণকে বিধৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহা নষ্ট হইলে পরিণামে ব্যক্তিরই ক্ষতি হয়; সত্যের এরূপ বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা হয়ত দুএকজন মেধাবী লোকের পক্ষে সহজ হয়, কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিলে তাহা সাধারণগ্রাহ্য নয় বলিয়াই ঈপ্সিত নহে। প্রাচীন ভারত বুঝিয়াছিল ব্যক্তির উপরেই সমষ্টির সৃষ্টি এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে কোন একটাকে বাদ দিলে অন্যায়ই বাড়িয়া চলে। তাই ভারত ব্যক্তির ও সমষ্টির জীবনের মধ্যে একটী সাম্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, গৃহস্থাশ্রমকেও জীবনের একটী একান্ত সত্য অনুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, সে কোন দিন সমাজকেও ছোট করে নাই, ব্যক্তিকেও ছোট করে নাই।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে কবীর, নানক, রামানন্দ, দাদু, মীরা প্রভৃতি যে বিচিত্রভাবে জীবন ও সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে নানকের উপলব্ধির বৈচিত্র্য —এই ব্যক্তি ও সমষ্টিকে মিলাইয়া নূতন জীবনের সৃষ্টির চেষ্টায়।

They (the reformers before Nanak) aimed chiefly at emancipation from priest-craft or from grossness of idolatory and poly-

theism. They formed pious associations of contended quietists or they gave themselves up to the contemplation of futurity in the hope of approaching bliss, rather than called upon their fellow-creatures to throw aside every social as well as religious trammel and to arise a new people free l from the debasing corruption of ages. They perfected forms of dissent rather than planted the germs of nations and their sects remain to this day as they left them. It was reserved for Nanak to perceive the true principles of reform and to lay those broad foundations which enabled his successor Gobind to fire the minds of his countrymen with a new nationality and to give practical effect to the doctrine that lowest is equal with the highest in race as in creed, in political rights as in religious hopes."

(Cunnigham—History of the Sikhs Chap II)

তিনি দেখিলেন ভারত যে শুধু অন্তরের দৈন্যে, মিথ্যা আভিজাত্যের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতেছে তাহা নহে; যখন জাতি মরণোন্মুখ হয় তখন বাহির হইতেও শত্রু আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত করিয়া দেয়। বাবর তখন দেশের জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া ভারতবর্ষ জয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন; বাবরের সেনার সংহত শক্তির নিকট ভারতবর্ষ পরাজয় স্বীকার করিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিবার শক্তিটুকুও ভারতবর্ষের নাই। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অস্বীকার করিয়া যে পাপের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহারই ফলে ভারতবর্ষ এই লাঞ্ছনাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। তাই তিনি যে আচারগুলি, যে জাতিভেদপ্রথা, মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন।

তিনি বলিলেন, "ধর্ম্ম শুধু কথার কথা নহে, যে সকলকে সমান দেখিয়াছে, সেই ধর্ম্মকে জানিয়াছে; সমাধি প্রদক্ষিণ করা, শ্মশানে বাস করা, নানা আসন সাধনা করাই ধর্ম্ম নহে; দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান, পবিত্র স্থান দর্শন করাই ধর্ম্ম নহে; এই বিশ্বের মিথ্যার মধ্যে সত্যকে ধরিয়া দাঁড়াও, ধর্ম্মের পথ খুঁজিয়া পাইবে।"

তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিলেন দেশের ভাষায়; দেশের বাণীকে উপেক্ষা করিয়া জনসাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য মৃতভাষাকে তিনি গ্রহণ করিলেন না; এই ভাবে দেশকে, দেশের ভাষাকে ভালবাসিতে শিখাইয়া জাতীয়তার উদ্বোধন করিলেন।

নানক সন্ন্যাস স্বীকার করেন নাই; পবিত্র গৃহস্থ জীবনই সাধারণ মানবের লক্ষ্য সেটাকে নিজের জীবনে প্রমাণ করিতে তিনি নিজে গৃহধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

মানুষ কি ভাবে বড় হইয়া উঠিবে তাহাই তিনি প্রচার করিলেন—

"আগুণের দহনে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া উঠিবে; পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠা রাখিয়া ধৈর্য্য তাহাকে গড়িবে; দুঃখের দহনে, ভগবৎভীরুতার প্রেমের আগুণে সে গড়িয়া উঠিবে; সাধারণজ্ঞান ও ভগবৎবাণী তাহাকে পথে চালাইয়া লইয়া যাইবে।"

তিনি নিজের দৈবশক্তির দাবী করিলেন না; যদিও পরবর্ত্তীকালে ভক্তগণ

তাঁহার উপর নানা দৈবী ক্রিয়ার আরোপ করিয়াছেন ; তিনি প্রতিদিনের জীবনে যে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তাহাই পরিমার্জ্জিত করিয়া অধ্যাত্মজীবনের সহায় করিয়া লইতে বলিলেন।

পন্থের সৃষ্টি করিয়া দুর্দ্ধর্ষ মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার আয়োজন এই ভাবে নানক করিয়া গেলেন।

পন্থ শিখজাতির ইতিহাসে তাই একটা খুব বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

তাঁহার পরে একে একে নয় গুরু আসিয়া নানকের এই মানসী প্রতিমাকে নানা ঐশ্বর্য্যে সাজাইয়া গিয়াছেন।

নানকের আদর্শ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্ উদাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া ভারতবর্ষের প্রচলিত ধারার অনুসরণ করিলেন ; তিনি বলিলেন, সন্ন্যাসই জীবনের পরম সাধনা ; সমাজধর্ম্ম, রাষ্ট্রধর্ম্ম নহে।

শিখেদের মধ্যে প্রথম বিরোধের অঙ্কুর এইভাবে সৃষ্টি হইল।

কিন্তু শিখসাধারণ ও নানক শ্রীচন্দ্‌কে স্বীকার করিলেন না ; প্রিয় শিষ্য লেহনাকে 'অঙ্গদ'—নিজ অঙ্গ হইতে সম্ভূত—নাম দিয়া নানক দ্বিতীয় গুরুর পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া গেলেন।

অঙ্গদ (১৫৩৯—১৫৫২) শিখকে গুরুর প্রতি পরমনির্ভরশীলতা শিখাইয়া দিয়া যান। তৃতীয় গুরু অমরদাস (১৫৫২—১৫৭৪) সন্ন্যাসবাদী উদাসী সম্প্রদায় শিখধর্ম্মের বিরোধী এটা স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিয়া যান। তিনি প্রচার করিয়া গেলেন সংযম ও সাম্য। নারীকে তিনি পুরুষের সমান আসন দিয়া গেলেন।

"এই দেহ তাঁহার মন্দির, তাঁহার দুর্গ ; বিশ্বের সকল মানবই তাঁহার প্রতিচ্ছবি। সুতরাং কাহাকেও ছোট করিও না।

অমরদাস (১৫৭৪—১৫৮১) তাঁহার জামাতা রামদাসকে গুরুর পদে অভিষিক্ত করিয়া যান। রামদাস শিখকে অভয় সেবার ব্রতে উদ্বোধিত করিয়া গেলেন ; শিখকে গুরু বলিলেন "সকল কুসংস্কার, সকল ভয় দূর করিয়া দাও, ভগবান্ ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করিবার নাই ; যে পাপচারী সেই শুধু ভীরু ; সত্যকে যে জানিয়াছে তাহার আর ভয় নাই।" (শ্রীরাগ)

রামদাসই লঙ্গরের সৃষ্টি করেন ; সেখানে সকলেরই সমান অধিকার, সমান আদর। প্রত্যেক শিখই তাহার উপার্জ্জনের কিছু অংশ পরের সেবায় উৎসর্গ করিবে, রামদাসের সময় এই ভাব শিখধর্ম্মে স্থান লাভ করে। এই ভাবে শিখধর্ম্মে গণতন্ত্রবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। রামদাস অমৃতসর নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে শিখধর্ম্মের কেন্দ্র করেন।

গুরু নানকের জন্মস্থানকে শিখধর্ম্মের কেন্দ্ররূপে শিখগণ কোনদিনই স্বীকার করেন নাই এবং যেদিন হইতে অমরদাস 'উদাসী' সম্প্রদায়কে শিখ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রচার করিলেন, সেইদিন হইতে শিখগণ নানকানা গুরুদ্বার সম্বন্ধে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই।

শিখগণ শুধু সংসারকে স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কি ভাবে মানুষের নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তি আসিতে পারে তাহার চেষ্টাও তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন।

রামদাসের পরবর্ত্তী গুরু অর্জ্জুন (১৫৮১—১৬০৬) ব্যবসায় করাকে গুরুমর্য্যাদার হানিকর মনে করেন নাই।

অর্জ্জুন দীনকে, তাহার কায়িক পরিশ্রমকে উচ্চ আসন দিয়া গিয়াছিলেন। তাহার জীবনের মর্য্যাদা তিনি প্রচার করিলেন ; তিনি বলিলেন,

"ভগ্ন কুটীরে জীর্ণকন্থায় যে দিন কাটাইতেছে, জাতির সম্মান, শ্রদ্ধা যে পায় না, যে গৃহহারা, বন্ধুহীন, আত্মীয়স্বজনহীন, প্রিয়হীন, শ্রী ও সৌন্দর্য্য যাহাকে বরণ করিয়া লয় নাই, তাহার হৃদয়ে যদি ভাগবতপ্রেম থাকে, সে-ই বিশ্বের সম্রাট"। (জয়ৎশ্রীকি বর)

গুরু অর্জ্জুন শিখদের ধর্ম্মগ্রন্থ "আদিগ্রন্থ" সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন ; তাহাতে তিনি হিন্দু মুসলমান সাধকগণের বাণীকে সাদরে স্থান দিয়াছিলেন, মুসলমান জোলা কবীর, নামদেব চর্ম্মকার, রুইদাস সকলেরই দোঁহা ও শবদ গ্রন্থসাহেবে সংকলিত হইয়াছে।

অর্জ্জুন ত্যাগের বাণী প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন্ নাই, যাহাদিগকে তিনি সেবাব্রত অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন তাহাদের সঙ্গেই তিনি নিজের জীবনে সে ব্রত সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। তরণতারণে তিনি কুষ্ঠরোগীদের সেবার জন্য একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিত্তকে বড় করিয়া দেখেন নাই, কিন্তু তাহাকে ছোট করেন নাই ; বিত্ত মায়া নহে, কাঞ্চন পাপ আনে না, "ধার্ম্মিক যে, সে যদি ভগবানের পথে চলে তবে তাহার পক্ষে বিত্ত অর্জ্জন পাপ নহে" (সারঙ্গকী বর)। অর্জ্জুনের "সুখমণি" শিখদের অন্যতম ধর্ম্মগ্রন্থ, মানব-জীবনের ভবিষ্যৎ আশার বাণীতে উদ্দীপ্ত ; শ্রান্ত ক্লান্ত পান্থ তাহা পাঠে যথেষ্ট সান্ত্বনা লাভ করে।

গুরু হরগোবিন্দ পরবর্ত্তী গুরু (১৬০৬—১৬৪৫) তিনি শিখজাতিকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে শিক্ষা দেন ; তিনিই শিখজাতিকে এক অপূর্ব্ব শক্তিমান সামরিক জাতিতে পরিণত করিবার সূত্রপাত করেন। হরগোবিন্দের সময়েই শিখদের অপূর্ব্ব জয় ধ্বনি "সৎ, শ্রী, অকাল" এর জন্ম হয়। শিখমণ্ডলীর মুখে যে কেহ এই জয় ধ্বনি উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছে সেই জানে কতখানি প্রাণ ঢালিয়া দিয়া শিখ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে।

"সৎ শ্রীঅকাল" অর্থে বিশ্বের দেবতা যিনি তিনি সৎ, শ্রীমান্ সর্ব্বশ্রীমণ্ডিত এবং অকাল, কালাতীত, কাল তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না।

এ যে অভয় মন্ত্র ; মানবের আত্মা কালকে অতিক্রম করিয়া চলে, মৃত্যু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কোথায় তাহার ভয় ? শত্রুর অসি তাহাকে আঘাত করিতে পারে না, কোন অত্যাচারই তাহার পরম শ্রী কাড়িয়া লইতে পারে না।

হরগোবিন্দের পরে হররায় (১৬৪৫—১৬৬১) গুরুর আসন লাভ করেন। যে কমনীয়-তার অভাবে শৌর্য্য অত্যাচারী হইয়া উঠে, হরগোবিন্দ শিখজাতিকে সেই কমনীয়তা শিক্ষা দেন ; কিন্তু তিনি ভীরু ছিলেন না। দিল্লীশ্বর আরঙজেব তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলে তাঁহার অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

তৎপরবর্ত্তী গুরু হরকিষণ (১৬৬১—১৬৬৪) অতি অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করেন ? কিন্তু তিনি শিখদের মধ্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন দ্বারা গুরুগ্রহণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গণবাদের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া যান। হরকিষণের পর তেগবাহাদুর ৫২ বৎসর বয়সে ১৬২১

খৃঃ অব্দে গুরুপদে অভিষিক্ত হন। তখন আরঙ্‌জেব দিল্লীর সম্রাট। হিন্দু ভারতবর্ষ তখন আরঙ্‌জেবের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া তেগ্‌বাহাদুর স্বজাতির এই চরম দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। মুসলমান অত্যাচার হইতে দূরে থাকিবার জন্য তেগ্‌বাহাদুর অমৃতসর ত্যাগ করিয়া শতদ্রুতীরে আনন্দপুর গ্রামে বাস স্থাপন করেন।

তেগ্‌বাহাদুর নিজের শোণিত দিয়া শিখধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া দিয়া যান। কথিত আছে লোকপরম্পরায় আরঙ্‌জেব তেগ্‌বাহাদুরের সম্পর্দ্ধ বাণী—সম্রাট গুরুদিগকে কোনদিনই মুসলমান করিতে পারিবেন না—শুনিয়া তাঁহাকে রাজসভায় নিমন্ত্রণ করেন। তেগ্‌বাহাদুর আরঙ্‌জেবের নিকট আসিলে আরঙ্‌জেব তাঁহাকে মুসলমান করিবার জন্য নানা প্রলোভন দেখান; তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেন। শিরশ্ছেদন করিবার পরে দেখা গেল তাঁহার কণ্ঠসংলগ্ন একটী পত্রে লেখা রহিয়াছে—"শির দিয়া ত সের ন দিয়া"=শির দিলাম তবুও ধর্ম্ম দিলাম না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গুরু তেগ্‌বাহাদুরের এই অমর বাণী শিখকে অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ধর্ম্মের জন্য প্রাণবলি দিতে শিখাইয়াছে।

দিল্লীতে যখন গুরু তেগবাহাদুরকে হত্যা করা হয় তাহা শিখদিগের তীর্থস্থান হইয়া আছে। সীস্‌গঞ্জ গুরুদ্বার তেগবাহাদুরের মৃত্যুর স্মৃতিরঞ্জিত হইয়া আজও দাঁড়াইয়া এই অভয়বাণী প্রচার করিতেছে;— "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য।

পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার সংকল্প বুকে লইয়া তরুণ গোবিন্দ সিংহ গুরুর আসন গ্রহণ করেন।

তিনি শিখদের শেষ গুরু।

তাঁহার সময়েই শিখজাতি প্রবলতম হইয়া উঠে; মুসলমানের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি শিখজাতিকে এমন এক সুদৃঢ় সংগঠিত জাতিতে পরিণত করেন যাহার বিক্রমে একদিন দিল্লীর সিংহাসনও টলমল হইয়া উঠিয়াছিল এবং যাহা ধর্ম্মের একাগ্রতা শৌর্য্যে ও বিশ্বস্ততায় পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ক্রমওয়েলের অজেয় বাহিনীরই তুলনীয় হইতে পারে।

শিখের নিকট গুরুর আসন অতিপবিত্র। তাহার জীবনে গুরু ও গুরুর বাণীর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা বিরাজ করে অন্যকোন সম্বন্ধের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। বিশ্বের দেবতা ও তাঁহার বাণী মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছে গুরুর মধ্যে। 'বাণীর' গ্রন্থ সাহেবের আসনের নিম্নেই গুরুর আসন। শিখেদের নিকট গুরু একমাত্রই; তিনি বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দশগুরুর রূপ ধারণ করিয়াছেন। গ্রন্থ সাহেবে বিভিন্ন গুরুর রচিত উপদেশ নানকের নামেই সংকলিত হইয়াছে।

গুরু গোবিন্দই প্রথম, গুরুরা মানবমাত্র, তাঁহারা যে পন্থের প্রতিনিধি, এইটী প্রচার করিয়া শিখের আত্মসম্মান আত্মনির্ভর জাগাইয়া দেন। এতদিন গুরুর পাদস্পৃষ্ট জলে শিখের দীক্ষা হইত কিন্তু গুরু গোবিন্দ কৃপাণস্পৃষ্ট জলে অভিষেকের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি শিখকে 'সিংহ' উপাধি দেন।

গণতন্ত্রবাদকে শিখধর্ম্মের মূলমন্ত্র করিবার জন্য গুরু গোবিন্দ পন্থ নির্ব্বাচিত 'পাঁচ পিয়ারার (পঞ্চ প্রিয়তমের) হস্তে দীক্ষা লন। পন্থ এবং খালসাকে এইভাবে তিনি গুরুর আসন দেন।

গোবিন্দসিংহ, শিখকে বীর্য্যের পাঁচটী সাধন গ্রহণ করিতে বলেন। কেশ, কঙ্ক, (বেণীর মধ্যে রক্ষিত চিরুনী) কড়া, (হস্তের লৌহবলয়) কৃপাণ, (ক্ষুদ্রতরবারী) কছ (জাঙ্গিয়া) ; প্রকৃত শিখ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নানা অত্যাচার মাথায় বহিয়া শেষ গুরুর এই অনুশাসন মানিয়া আসিয়াছে। এগুলি শিখের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। ইহার একটীরও জন্য শিখ প্রাণপণ করিয়া আসিয়াছে। এই কেশ রক্ষার জন্য তরুণবীর তরুসিংহ বেণীর সহিত মাথা দিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল।

গোবিন্দসিংহের সময়ে যখন মোগল সুবেদারের আদেশে সৈন্যগণ শৃগালের মত শিখ খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিতেছিল তখন তাহাদের পরিচয় ছিল এই পঞ্চ 'ক'। এইগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সত্য শিখ স্বেচ্ছায় স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিয়া রাজপুতনার মরুভূমিতে, পর্ব্বতে, অরণ্যে, উপত্যকায় শত কষ্ট, শত অত্যাচার সহ্য করিয়া অনিদ্রায়, অনাহারে দিন কাটাইয়া দিয়াছিল। যে ভীরু সেই দুর্দ্দিনে প্রকৃত শিখ বলিয়া পরিচয় না দিয়া, বেণী কাটিয়া, পঞ্চ 'ক' ত্যাগ করিয়া মাথা বাঁচাইয়াছিল তাহারা আজও 'সহজধারী' নামে পরিচিত, আর যাহারা শত অত্যাচার সহ্য করিয়া ধর্ম্মের অঙ্গহানির অপমান হইতে নিজেকে বাঁচাইয়াছিল, প্রাণ দিয়াছিল, তবুও ধর্ম্ম দেয় নাই, তাহারাই, 'অমৃতধারী' এই গৌরবময় বিশেষণে ভূষিত হইয়াছিল।

গুরুগোবিন্দ আজীবন মোগলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছিলেন ; একমুহূর্ত্তের বিশ্রামও তিনি গ্রহণ করেন নাই। কি ভাবে শিখকে শৌর্য্যে বীর্য্যে অতুলনীয় করিয়া তুলিয়া জগতে এক অপূর্ব্ব জাতির সৃষ্টি করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার ধ্যান। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, তাহার উপরে যে দেবতা আছেন তাঁহারই সেবা করিতে হইবে। সময় বহিয়া যাইতেছে,—কই তোমার সেবা ত' অপূর্ণ রহিয়া গেল, তোমার জীবন ব্যর্থ হইল ; তোমার দেহকে মন্দির কর, বিবেকের অচঞ্চল প্রদীপ তাহাতে জ্বালাও। সত্যজ্ঞানের সম্মার্জ্জনী হাতে লইয়া ভীরুতার আবর্জ্জনা ঝাড়িয়া ফেল।

শুধু তাঁহারই প্রেমের প্রেমিক হও ; সে প্রেমের জন্য যে কষ্ট মাথায় পাতিয়া লয় স্বর্গ তাহারই।

সত্যের নিষ্কম্প দীপ শিখা যাহার হৃদয়ে জ্বলিতেছে, সেই একমাত্র দেবতাকে যে ভুলিয়া যায় নাই—দেবতার প্রেমে ও বিশ্বাসে যাহার হৃদয় পূর্ণ সেই খালসার প্রকৃত সভ্য, সেই-ই প্রকৃত "শিখ"।

গোবিন্দ এই শিক্ষা দিয়া গেলেন।

তাঁহার পর আর কেহ গুরু হয় নাই। গুরুর আসন তিনি খালসাকে দিয়া গিয়াছিলেন।

এই ভাবে একে একে দশ গুরুর হাতে দুই শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে এক অপূর্ব্ব জাতির সৃষ্টি হইল, যাহা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সত্যাগ্রহকে বরণ করিয়া

লইয়াছে, যাহা কোনদিনই পার্থিব ক্ষতির ভয়ে অত্যাচারের নিকট মাথা নত করে নাই, শত লাঞ্ছনাও যাহা সত্যে আলোকে প্রদীপ্ত মুখের হাসি দিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

শিখের নিকট গুরুর আসন কত বড় সেটা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। গুরু গোবিন্দের সময়ে কিরূপে ধীরে ধীরে পন্থই গুরুর আসন গ্রহণ করিল তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

শিখধর্ম্ম মূলতঃ গণতান্ত্রিক ; এবং শিখের ধর্ম্ম রাজনীতি অর্থনীতি সমাজ ও ব্যষ্টি সকলেই মিলাইয়া লইয়াছিল। সুতরাং তাহাদের প্রতিনিধি সভা এই খালসা—ইহারও এইসকল অধিকারই ছিল। সে অধিকার যে কত প্রবল তাহা আমরা কয়েকটি ঘটনা হইতে বুঝিতে পারি। গুরুগোবিন্দকেও একবার নিয়মচ্যুতি অপরাধে খালসার হস্ত হইতে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পরাক্রমশালী মহারাজ রণজিৎ সিংহকেও একবার অকাল তখ্‌তের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিচার ভিক্ষা করিয়া দণ্ডগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

এই পন্থের আসন ছিল গুরুদ্বারগুলিতে। এই গুরুদ্বারগুলিকে কেন্দ্র করিয়া শিখের ধর্ম্ম, রাজনীতি এবং সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। গুরুদ্বারগুলির অসীম ক্ষমতা ছিল ; এবং অকাল তখ্‌ত, আনন্দ পুর সাহিব, পাটনা সাহিব এবং হজুর সাহিব এই চারিটি মুখ্য গুরুদ্বারের অনুশাসনে সমস্ত শিখ জাতি বদ্ধ ছিল। তাহাদের মধ্যে আবার অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত অকাল তখ্‌তই সর্ব্বপ্রধান ছিল। গুরু হরগোবিন্দ ১৬০৯ খৃ: অব্দে অকাল তখ্‌তএর প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃপাণ দীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া যান।

গুরু নানককে যখন কতকগুলি যোগী অতি-প্রাকৃত কোন কিছু দেখাইয়া, তাঁহার ব্রহ্ম দর্শনের সত্যতা প্রমাণ করিয়া, তাঁহার প্রচারিত নবধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন, তখন নানক সে অনুরোধ অস্বীকার করিয়া বলেন যে তিনি 'বাণী' ও পন্থ রাখিয়া যাইতেছেন তাহাই নবীন ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবে। গুরু নানক ও পরবর্ত্তী গুরুগণ বিভিন্নস্থানে সঙ্গতের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেগুলিকে শিখ জীবনের কেন্দ্র করিয়া দিয়া যান। এই সঙ্গতগুলিও প্রথম প্রথম প্রচার কার্য্য করিয়া আসিয়াছিল। ধীরে ধীরে এই মসনদ বা সঙ্গতগুলি পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। এই মসনদগুলি শিখজাতিকে সংহত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতি বৎসর দীপালি উপলক্ষে 'সরবৎ খালসা' অর্থাৎ সমস্ত শিখজাতি মিলিত হইয়া তাহাদের সত্তা উপলব্ধি করিত।

যেখানেই সঙ্গত ছিল, সেইখানেই গুরুদ্বার গড়িয়া উঠিয়াছিল। গুরুদ্বারগুলি শিখের জীবনে এক অপূর্ব্ব স্থান লাভ করিয়াছে। তাহার প্রাণের উৎস এই গুরুদ্বার ; প্রেমিকের সমস্ত একাগ্রতা লইয়া তাহারা গুরুদ্বারে নিজের জীবন, অর্থ সম্পদ উৎসর্গ করিত। শিখের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য, কি ভাবে সে নিজের গুরুদ্বারটীকে সাজাইয়া তুলিবে! গুরুগোবিন্দ সিংহের সময় হইতেই প্রত্যেক শিখকে তাহার আয়ের দশমাংশ গুরুদ্বারের ও লঙ্গড়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইত। প্রতি শিখ আনন্দের সহিত এ গুরুভার গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। এইরূপে শিখ তাহার জীবনের ক্ষীরটুকু গুরুদ্বারকে দিয়া আসিয়াছে।

এইজন্য গুরুদ্বারগুলি ধনী হইয়া উঠিতেছিল। শিখের নিকট গুরুদ্বার কত বড়, তাহা

একটী ঘটনা হইতে বোঝা যাইবে। একবার মহারাজ রণজিৎ সিংহ এক বহুমূল্য মুক্তামালা উপহার পান, তিনি সে হার কণ্ঠে ধারণ করিতে অস্বীকার করিয়া, এ হার গুরুরই উপযুক্ত বলিয়া তাহা স্বর্ণ-মন্দিরে প্রেরণ করেন।

কিন্তু যেখানেই ধনের কেন্দ্রীকরণ, সেইখানেই অধিকারের ব্যভিচার ঘটে। স্থানে স্থানে গুরুদ্বারগুলির মোহন্তগণ যথেচ্ছাচারী, বিলাসী, আচারভ্রষ্ট, আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছিল। স্থানীয় সঙ্গত গুলির উপর পর্য্যবেক্ষণের ভাব ছিল। গুরু গোবিন্দ ব্যভিচারী মোহন্তকে অধিকারচ্যুত করিবার অধিকারও সঙ্গতগুলিকে দান করিয়া, কতকগুলি মোহন্তকে পদচ্যুত করেন।

যখনই সঙ্গত বা পন্থ কোন গুরু দ্বারের শাসনে অন্যায় দেখিতে পাইয়াছে, তখনই গুরুদ্বারের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য কঠোর হস্তে সকল অন্যায় দূর করিয়াছে। এইরূপে অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দির, আনন্দপুর সাহিব প্রভৃতি গুরুদ্বার সমূহ প্রথমে উদাসীগণের হস্তে ছিল, কিন্তু পন্থ তাহাদের হস্ত হইতে সে ভার লইয়া সিংহদের হস্তে অর্পণ করেন।

গুরুদ্বারগুলির পবিত্রতার সহিত শিখেদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম জীবনের পবিত্রতার গূঢ় যোগ ছিল বলিয়াই শিখগণ গুরুদ্বারগুলির ভাল মন্দ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই এতটা সচেতন ছিলেন।

মোগল শাসনের সময় পর্য্যন্তও গুরুদ্বারগুলির উপর সঙ্গতগুলির এই অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু বৃটীশ শাসনের সময়েই তাহাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ হয়।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি গুরুদ্বারের ভার নিজে লইলেন, কতকগুলি গুরুদ্বারকে আইনে মোহন্তগণের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। এতদিন ধরিয়া সেবকের হৃদয়-শোণিত দানে যে গুরুদ্বারগুলি সম্পদশালী হইয়া উঠিতেছিল, যাহাদের উদ্দেশ্য ছিল শিখ জাতির পবিত্রতা রক্ষা করা, সেগুলি আজ মোহন্তগণের বিলাসের ব্যভিচার লীলানিকেতন হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু শিখসঙ্গত নিরুপায়। আইনের দ্বারে তাহার প্রতিকারের উপায় নাই। অবশ্য কোনস্থানে অন্যায় লক্ষিত হইলে মোহন্তকে পদচ্যুত করিবার ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু সে ব্যবস্থা বিধি নিষেধের নাগপাশে কার্য্যতঃ অকর্ম্মণ্য হইয়াই দাঁড়াইয়াছিল।

অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দির ও তরণ তারণের পবিত্র গুরুদ্বার গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল।

কোন কোন স্থানে মোহন্তগণ আইন বাঁচাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যে গুরুদ্বারের সম্পত্তি নিজস্ব করিয়া লইয়া, তাহাতে বিলাস লালসার ইন্ধন যোগাইবার জন্য যথেচ্ছাচারী হইয়া গুরুদ্বার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে লাগিল।

তাহারা যে শুধু সম্পত্তি বিষয়েই যথেচ্ছাচারিতা আরম্ভ করিল তাহা নহে, তাহারা অম্লান বদনে অকুণ্ঠিত চিত্তে শিখধর্ম্মবিরোধী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনও করিতে লাগিল।

কিন্তু এই আদর্শচ্যুতি একদিনেই হয় নাই, বহুবর্ষ পূর্ব্ব হইতেই তাহার ক্রিয়া চলিতেছিল।

যতদিন গুরুগণ জীবিত ছিলেন এবং যতদিন শিখের বিষয়বাসনা পার্থিবসম্পদলিপ্সা প্রবল হইয়া উঠে নাই, ততদিন শিখ ধর্ম্মের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ ছিল। গণতান্ত্রিক শিখধর্ম্মে প্রভুত্ব কোন দিনই বংশানুক্রমিক হইতে পারে নাই, বরং মোহন্ত এবং গুরুর পদ যে নির্ব্বাচন দ্বারা স্থিরীকৃত হইত তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু গুরুগণের তিরোধানের পর সে প্রথারও পরিবর্ত্তন ঘটিল।

যতদিন গুরুগোবিন্দ ও তৎনির্ব্বাচিত পাঁচ পিয়ারারা ছিলেন ততদিন আদর্শ ঠিক ছিল। কিন্তু তাঁহারা চলিয়া গেলে শিখ সাধারণের উপর সমস্ত ভার আসিয়া পড়িল। সেই সুযোগে গুরুদ্বারগুলি কতগুলি সম্প্রদায়বিশেষের অধীন হইয়া পড়িল।

শিখধর্ম্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া, এই আদর্শ—সাঙ্কর্য্য আসিবার আর একটি কারণ হইয়াছিল মুসলমানদিগের সহিত বিরোধ। এতদিন হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকলকেই সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে

শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, বহু মুসলমানও যে শিখধর্ম্মে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিল, শিখধর্ম্মের ইতিহাসে তাহার বহু প্রমাণ আছে। কিন্তু মুসলমান বাদসাহগণের সহিত বিরোধ ক্রমে মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি বিরোধে রূপান্তরিত হইয়া উঠিল। শিখ ধর্ম্ম তাহার ঔদার্য্য হারাইল। ধর্ম্ম যখন তাহার ঔদার্য্য হারাইয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন তাহার মধ্যে নানা ব্যভিচারের সৃষ্টি হয় এবং সমাজদেহে একটী রোগ দেখা দিলে ধীরে ধীরে অন্য রোগ আসিয়া পড়ে।

সহজধারী শিখের অভ্যুদয় এই আদর্শের ব্যাভিচারের প্রথম স্তর। কিন্তু শিখধর্ম্মের আদর্শ প্রবলতম আঘাত পায় মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময়। গণতন্ত্রবাদের ধ্বংসের উপর তিনি সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেন। সাম্রাজ্যের মূল কথা প্রভুত্ব ও অধিকারের এককেন্দ্রীকরণ। রণজিৎ যদিও সাম্রাজ্যবাদের সহিত সনাতন শিখ ধর্ম্মের আদর্শ মিলাইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে সে চেষ্টা লোপ পাইল। এবং শিখ ধর্ম্মের বিশেষত্ব যে গণতন্ত্রবাদ তাহা নষ্ট হইয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া মোহন্তগণ নিরঙ্কুশভাবে যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল।

এইরূপে যে আদর্শের ব্যভিচার গুরুদ্বারে হইতে লাগিল, সমগ্র শিখ জাতির উপর তাহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিল।

সুতরাং ধর্ম্মকে ও জাতিকে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, মুক্তিলাভ করিবার জন্য সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া উঠিল, এবং সেই প্রয়োজন বোধ হইতেই শিখের জীবনের সত্যাগ্রহের সুপ্ত আদর্শ আবার জাগিয়া উঠিতেই মুক্তির সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল।

আকালী ও নির্ম্মল সম্প্রদায়

এই স্থলে আকালী ও নির্ম্মল সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন। গুরুগোবিন্দ সিংহের সময় অমৃতধারী শিখের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তিনি আবার দুইটী বিভাগ করেন—'আকালী' ও নির্ম্মল।

গুরুগোবিন্দ ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা ও ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ়তর করিবার জন্য সংস্কৃত ভাষা ও দেশের প্রাচীনরীতিনীতিজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ কতগুলি লোক তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতেই 'নির্ম্মল' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি; কতগুলি শিখকে নির্ব্বাচিত করিয়া তিনি কাশীতে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়া দেন; তাহাদেরই উপর পরে পৌরহিত্যের ভার অর্পণ করা হয়; তাহারা ছিল "নির্ম্মল", তাহাদের দৃষ্টি ও জীবন ছিল "নির্ম্মল"; বুদ্ধি ও জ্ঞান ছিল সবল; গুরুর মৃত্যুর পর ধর্ম্ম ব্যাখ্যার ভার তাহাদের উপরই পড়ে।

'আকালী' কথাটীর অর্থ—কালাতীত; যাহারা কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া চলে; মৃত্যু যাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় করিতে পারেনা, যাহারা অমর। সমস্ত দুর্দ্দিনে তাহারাই ছিল গুরুর সঙ্গী; শৌর্য্যে অতুলনীয়, অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই আকালী শিখজাতি ও ধর্ম্মকে সকল অপমান, সকল লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তাহাদের সরল সবল ঋজু উন্নত দেহ, বেণীবদ্ধ শির, কৃষ্ণ উষ্ণীষ, নির্ভীক প্রশান্ত দৃষ্টি, কোষে কৃপান, হস্তে লৌহবলয়। ছায়ার ন্যায় সুখে দুঃখে গুরুর অনুসরণ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারাই শিখ আদর্শকে জাগাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

শ্রীনির্ভয় সিংহ।

অনন্তের সুরে

পূর্ণশান্তি, পূর্ণশক্তি, পূর্ণৈশ্বর্য্য

প্রস্তাবনা

আশাবাদীও ঠিক ; নৈরাশ্যবাদীও ঠিক। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর, ঠিক যেন আলো আঁধারে প্রভেদ ; তবু, দুইই ঠিক। নিজের নিজের দিক হইতে দেখিলে প্রত্যেকেই ঠিক, আর এই দেখিবার দিক্,—প্রত্যেকের জীবনের ধারণা স্থির করিয়া দেয়। জীবন সবল হইবে না দুর্ব্বল হইবে, বীর্য্যবান হইবে না বীর্য্যহীন হইবে, শান্তিময় হইবে না ব্যথাময় হইবে, সফল হইবে না বিফল হইবে তাহা স্থির হয় এই দেখিবার দিক্ হইতে, মানুষ কি ভাবে জগৎ দেখে তাহা হইতে।

জগৎকে সমগ্র ভাবে দেখিবার, বিষয় গুলির পরস্পর সম্বন্ধ অব্যাহত রাখিয়া দেখিবার ক্ষমতা আশাবাদীর আছে। নৈরাশ্যবাদীর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, একদেশদর্শী। একের বুদ্ধি জ্ঞানালোকে আলোকিত, অন্যের বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রত্যেকেই তার জন্য নিজের নিজের ভিতর হইতে সৃষ্টি করিতেছে, আর প্রত্যেকের দেখিবার দিক্ এই সৃষ্টির ফল নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে। আশাবাদী, তাঁহার উন্নত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে, নিজের স্বর্গ নিজে গড়িয়া নিতেছেন, আর যে পরিমাণে নিজের স্বর্গ গড়িতেছেন, সেই পরিমাণেই অন্য সকলের স্বর্গও গড়িতেছেন। আর সেই নৈরাশ্যবাদী, তাঁহার সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়া নিজের নরক নিজে গড়িতেছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবসমাজের নরক গড়িতেও সাহায্য করিতেছেন।

তোমার আমার মধ্যে, আশাবাদীর প্রধান প্রধান গুণ দেখা যায়। আমরা ত তবে প্রতি ঘণ্টায় নিজেদের স্বর্গ, নিজেদের নরকও গড়িতেছি, আর সেই সঙ্গে জগতের স্বর্গ, জগতের নরকও গড়িতে সাহায্য করিতেছি।

ইংরাজী heaven কথাটার অর্থ শৃঙ্খলা। ইংরাজের hell কথাটা আসিয়াছে প্রাচীন ইং hell হইতে ; hell অর্থে চারিদিকে এক দেওয়াল দেওয়া, পৃথক করা ; to be helled অর্থে হইত অন্য হইতে পৃথক করা। শৃঙ্খলা বলিয়া যদি কোন জিনিষ থাকে তবে এমন কিছুই নিশ্চয় আছে যাহার সঙ্গে ঠিক সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে ; কারণ, কোনও জিনিষের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই সে বিষয়ে শৃঙ্খলা হইল। আর helled বা স্বতন্ত্র বা পৃথক বলিয়া যদি কোন ও জিনিষ থাকে তবে যাহার সঙ্গে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ সেই বস্তুটির অস্তিত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে।

বিশ্বের বড় কথা

বিশ্বের মূল কথা, বড় কথা,—সেই অনন্ত প্রাণের আধার সেই অনন্তশক্তির আধার মহাপ্রাণ, যিনি সকলের পশ্চাতে, যিনি সকলের প্রাণদাতা, যিনি সকলের মধ্যে, সকল বিষয়ের অন্তর দিয়া প্রকাশিত ; সেই স্বয়ংসিদ্ধ প্রাণশক্তি যাহা হইতে সকলে আসিয়াছে, এবং শুধু আসে নাই, আসিতেছেও বটে। ব্যক্তির জীবন বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে অনন্ত জীবনের এমন আধার নিশ্চয় আছে, যাহা হইতে ইহা আসিয়াছে। প্রেম বলিয়া কোনও গুণ বা শক্তি যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার মূলে অনন্তপ্রেমের উৎস নিশ্চয় আছে। জ্ঞান যদি থাকে তবে তাহার পশ্চাতে সর্ব্বজ্ঞানময় কোনও আধার অবশ্যই আছে, যাহা হইতে ঐ জ্ঞানের উৎপত্তি। শান্তির সম্বন্ধেও ঐ কথা, শক্তির সম্বন্ধেও ঐ কথা, জড়বস্তু বলিয়া যাহা বুঝাই সে সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

তাহা হইলে সকলের পশ্চাতে এই অনন্তপ্রাণময়, অনন্তশক্তিময় আত্মা আছেন, তিনিই সকলের নিদান। এই অনন্তশক্তি সৃজন করিতেছেন, কর্ম্ম করিতেছেন, শাসন করিতেছেন, মহা অপরিবর্ত্তনীয় বিধির সাহায্যে, শক্তির সাহায্যে। সমস্ত বিশ্বজগৎ দিয়া এই সব বিধি ও শক্তি চলিয়াছে, ইহারা আমাদের আশেপাশে একেবারে বেষ্টন করিয়া আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম ঠিক এই সব বিধান ও শক্তির অনুসারেই চালিত হয়। পথের ধারে যে ফুলটি ফোটে তাহা ফোটে, বাড়ে, হাসে, ঝরিয়া পড়ে—কতকগুলি মহা অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অনুসারে। যে তুষার কণাটুকু স্বর্গ মর্ত্ত্যের অন্তরালে খেলা করে, তাহা গড়িয়া উঠে, পড়ে, গলিয়া যায়—কতকগুলি মহা অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অনুসারে।

এক দিক দিয়া দেখিলে এই বিপুল বিশ্বে নিয়ম ছাড়া আর কিছুই নাই। একথা সত্য হইলে, এ সবার পিছনে এমন একটি শক্তি নিশ্চয়ই আছে যাহা এই সমস্ত নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা এই সমস্ত নিয়ম হইতে অধিক শক্তিমান্। সকলের পিছনে এই যে অনন্তপ্রাণময় অনন্তশক্তিময় আত্মা আছেন, ইঁহাকেই আমি ঈশ্বর বলি। যে নামই দাওনা কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, "পরং জ্যোতিঃ" "সর্ব্বশক্তিমান্" "পরমাত্মা" ইত্যাদি। যতক্ষণ মূল কথাটি, বড় কথাটি লইয়া আমাদের কোনও গোল নাই, ততক্ষণ যে নামই দেওয়া হোক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

ভগবানই সেই অনন্তস্বরূপ পরমাত্মা যিনি একাকী সমস্ত বিশ্ব পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহা হইতেই সকলের জন্ম, তাঁহাতেই সকলের স্থিতি, তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই। বাস্তবিক্ সত্য কথাই ত এই যে, তাঁহাতেই আমাদের জীবন তাঁহাতেই আমাদের গতি ও স্থিতি। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, প্রাণশক্তিই তিনি। তাঁহার নিকট হইতে আমরা আমাদের জীবন পাইয়াছি ও পাইতেছি। ভগবত জীবনের অংশ আমরা পাইয়াছি ; যদিও আমরা জীবাত্মা এবং তিনি পরমাত্মা, আমরা এবং অন্য সকলেই তাঁহার অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আমরা তাঁহা হইতে ভিন্ন, তথাপি ভগবানের জীবন ও মনুষ্যের জীবন মূলে সমান, সুতরাং এক। উভয়ের প্রভেদ মূলে নয়, গুণে নয়, পরিমাণে।

এমন অনেক জ্ঞানী মহাপ্রাণ ছিলেন ও আছেন, যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন এবং করেন যে আমরা দৈবস্রোতের মত আমাদের জীবন ভগবানের কাছ হইতে পাইয়াছি। এ রকমও অনেকে ছিলেন ও আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন এবং করেন যে মানব জীবন ও ভাগবত জীবন তুল্যমূল্য,- সুতরাং মানুষ ও ভগবান এক। কোনটি ঠিক ? দুই ই ঠিক, ঠিক করিয়া বুঝিলে দুই ই ঠিক।

প্রথম পক্ষের কথা,—যদি সকলের পিছনে "ভগবান" নামধেয় এক অনন্ত আত্মা থাকিয়া থাকে, এবং সেই আত্মা যদি সকলের নিদান হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন এই অনন্ত উৎস হইতে এই দিব্যস্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনশক্তি যদি আমরা পরমাত্মা হইতে পাইয়া থাকি, যদি আমরা অনন্ত স্বরূপের অংশ হই, তবে প্রত্যেকের জীবনে যে পরিমাণে পরমাত্মার প্রকাশ, তাহা গুণতঃ সেই আদিকারণের সমান হইবে, ঠিক যেমন সাগরের একবিন্দু জলও গুণে, প্রকৃতিতে, সাগরের সমান। আর অন্যথাই বা কি করিয়া সম্ভবে ? কিন্তু শেষোক্ত বিষয়ে ভুলের সম্ভাবনা :—মানবজীবন ও ভাগবত জীবন একই উপাদানে গঠিত হইলেও পরমাত্মা জীবাত্মাকে এতদূর ছাড়াইয়া গিয়াছেন যে তিনি সর্ব্বব্যাপী। অর্থাৎ—গুণতঃ ইহারা এক, পরিমাণ সম্বন্ধে তাহাদের প্রভেদ অতি বিশাল।

এই ভাবে দেখিলে কি স্পষ্ট বোঝা যায় না যে দুই মতই সত্য, দুই মতই এক ? কেবল মাত্র একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি বিশদ করা যাইতে পারে।

এক পাহাড় তাহার পাশে এক উপত্যকা, উপত্যকায় একটা জলাধার, তাহাতে

পাহাড়ের উপরে এক অফুরন্ত উৎস আছে তাহা হইতে জল আসে। তাহা হইলে কথা ত সত্য যে, উপত্যকায় পাহাড়ের উৎস হইতে জল প্রবাহের গুণে জল আসে? এ কথা ও ত সত্য যে, উপত্যকার ক্ষুদ্র জলাধার ও তাহার মূল উৎস এই উভয়ে প্রকৃতিগত, লক্ষণগত ও গুণতঃ কোনও প্রভেদ নাই? শুধু এইটুকু প্রভেদ, যে—পাহাড়ের গায়ে যে জলাধার আছে তাহার পরিমাণ নীচে যে জল আছে তাহার পরিমাণ অপেক্ষা এত অধিক যে ঐরূপ অসংখ্য জলধার পূর্ণ করিলেও তাহার কিছুমাত্র হ্রাস ঘটে না।

মানুষের জীবনেও সেই কথা। অন্যান্য সকল বিষয়ে আমাদের যতই মতান্তর থাকুক, এ বিষয়ে যদি আমরা একমত হইয়া থাকি যে সকলের পশ্চাতে এই অনন্তস্বরূপ পরমাত্মা আছেন, ইনি সকলের প্রাণশক্তি, ইনিই সকলের আদিকারণ, তাহা হইলে ব্যক্তিবিশেষের জীবন, তোমার আমার জীবন, এই অনন্ত উৎস হইতে দৈবস্রোতে নিশ্চয় ভাসিয়া আসিয়াছে। আর একথা সত্য হইলে, মানুষের কাছে যে জীবনী শক্তি এই দৈব স্রোতে ভাসিয়া আসে, তাহার ও এই অনন্ত স্বরূপ প্রাণশক্তির মধ্যে উপাদানগত ঐক্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রভেদ অবশ্য আছে, কিন্তু যে প্রভেদ মূলের প্রভেদ নয়, তাহা পরিমাণের প্রভেদ।

যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা কি ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি না যে এই দৈবস্রোতের সম্মুখে মানুষ যতই গা ঢালিয়া দিবে, ততই সে ঈশ্বরের কাছে যাইবে? একথাও আমরা ইহা হইতে পাই যে ভগবানের কাছে মানুষ এইভাবে যতটা অগ্রসর হইতে পারিবে, ততই সে দৈবশক্তি অর্জ্জন করিতে পারিবে। আর দৈবশক্তি যখন অসীম, তখন মানুষের গন্তী কি তাহার স্বকৃত নয়, তাহার আত্মজ্ঞানের অভাব জন্য নয়?

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত।

গান্ধিজী

সে আজ প্রায় দুই বৎসরের কথা। ১৯২২ সালের মাসে লণ্ডনপ্রবাসকালে জনৈক বন্ধু তথাকার সুবিখ্যাত হোর্বন রেস্তরাঁতে চা পান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন দেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা বহিতেছে। এবং তাহার ঘাত প্রতিঘাত সুদূর ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদিগের নিকট পর্য্যন্তও পৌছিয়াছে। সেই দিন সেই রেস্তরাঁয় সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া মনে হইতেছিল,—এই সেই ঘর, এই খানেই একদিন যুবক গান্ধী তেজের সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার বহিরাবণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তাহা বহন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার জীবনের গতি একদিক হইতে অন্যদিকে পরিচালিত হইয়াছিল। তখন যাহার অঙ্কুর, আজ তাহারই পূর্ণ বিকাশ, এই অসহযোগ আন্দোলনে প্রকাশ পাইতেছে।

সেই সময়ে লণ্ডনস্থ এক ভারতীয় ছাত্রাবাস (Shakespeare Hut) হইতে পরিচালিত "Indus" নামক পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর যৌবন কালের এক প্রতিকৃতি বাহির হয়। সেই ছবি দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক হইয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম এই কি সেই? প্রৌঢ়াবস্থায় যাহার কৌপীন সম্বল, এই কি তাঁহার যৌবনের বেশ!

যৌবনের প্রারম্ভে গান্ধী বিলাতী বেশে সজ্জিত হইয়া সেই সভ্যতায় নিজেকে সুসভ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জীবনসন্ধ্যায় আবার কৌপীন ধারণ করিয়া "আত্ম শক্তির" (soul force) বীজমন্ত্র প্রচার করিলেন। আজ ক্ষীণদেহী কৌপীনধারী গান্ধী

মহাত্মাজীকে ভারতের আপামর সাধারণ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে। ইউরোপবাসী অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহাকে জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া সম্মান করেন। এমন কি কেহ কেহ তাঁহাকে যীশু খ্রীষ্টের সহিত তুলনা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। মানবের এ কি প্রভূত প্রভাব। সেই হোবর্ণ রেস্তরাঁতে বলিয়া মনে হইতেছিল—মানুষের জীবনের এ কি পরিবর্ত্তন!

ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয় যে, খদ্দরমণ্ডিত মহাত্মাগান্ধী এককালে বিলাতে অবস্থানের সময়ে thorough gentleman হইবার জন্য শিক্ষকের নিকট নিয়মমত বেহালা বাদন শিক্ষা করিতেন ও বিলাতী নৃত্যকলাকুশল হইবার জন্য যথারীতি নাচের lesson নিতেন। পরে এই হোবর্ণ রেস্তরাঁতেই তাঁহার কুহক ভাঙ্গিয়াছিল এবং সেই দিনই তিনি তাঁহার সখের বেহালাটী চুরমার করিয়াছিলেন ও নৃত্যবিদ্যা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই দিনই তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে পরিচালিত হইল।

যাহারা গান্ধীর জীবনের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত তাঁহারা এ সমস্ত খবর জানেন। যেদিন গান্ধী লণ্ডনে টিলবারী ডকে জাহাজ হইতে নামিলেন, সেদিন তাঁহাকে তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ী যাওয়ার জন্য লণ্ডনের রাস্তা দিয়া অনেকটা পথ হাঁটিতে হইয়াছিল। তাঁহার গায়ে ভারতে প্রস্তুত বিলাতী পোষাক, তাহা খাটি বিলাতী হাল ফ্যাসান মতন নহে। সেই পোষাকে একটী কৃষ্ণ মূর্ত্তিকে রাস্তায় যাইতে দেখিয়া সকলেই তাঁহার দিকে তাকাইতেছিল। এমন ভাবে সকলে তাকাইতে ছিল—(যাহাকে ইংরেজী ভাবিয়া rude বলা চলে) যে তাঁহার নিকট তাহা নিতান্ত অশোভন মনে হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে যাহারা বাঁধা বেশ ভূষার প্রতি একটা অনুরক্ত যে বিদেশীর গায়ে তাহার এতটুকু ব্যতিক্রমও ক্ষমা করিতে পারেনা, তাহাদের সভ্যতা নিতান্তই বহির্ম্মুখী; রাস্তায় যাইতে যাইতেই সেই সভ্যতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অনেকটা কমিয়া গেল।

কিন্তু লণ্ডনবাসী যে বন্ধুর নিকট তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, তিনি তাঁহাকে অন্য শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইলেন। "ইংলিশ জেণ্টলম্যান" হইতে হইলে তাঁহাকে যে আদবকায়দা-দুরস্ত হইতে হইবে গানবাজানা শিখিতে হইলে, বেহালাবাদনপটু হইতে হইবে, নৃত্যকলা-কুশল হইতে হইবে। যুবক গান্ধী তাহাই মানিয়া নিলেন ও তাহার শিক্ষানবীশী আরম্ভ করিলেন। মাতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে মদ্য মাংস রমণী স্পর্শ করিবেন না। সে প্রতিজ্ঞা অবশ্যই তিনি রক্ষা করিলেন। কিন্তু একদিনের এক ঘটনায় তাঁহার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। একরাত্রিতে হোবর্ণ রেস্তরাঁ গৃহে ডিনার খাইবার জন্য তাঁহার বন্ধু এক ভোজের আয়োজন করিলেন। ডিনার টেবিলে ভৃত্য সুপ পরিবেষণ করিয়া গেল। সুপ মাংসে প্রস্তুত, মনে এ শঙ্কা হওয়াতে গান্ধী ভৃত্যকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। বন্ধুপ্রবর তাঁহারা এই এটিকেটভঙ্গের জন্য ভৎসনা করিলেন। গান্ধীর তাহা অসহনীয় মনে হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ ভোজন টেবিল পরিত্যাগ করিলেন। সেই রাত্রি হইতেই ইংলিশ জেণ্টলম্যান হওয়ার বাসনা তাঁহার চিরকালের জন্য ঘুচিয়া গেল। তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল।

তারপর যে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনের গতি পরিচালিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনীপাঠকমাত্রেই জানেন। অনেক চিন্তা ও সাধনার ফলে তিনি তাঁহার "আত্মশক্তি" ও "অসহযোগ" মন্ত্রে উপনীত হইয়াছেন। যে মন্ত্র প্রচার করিবার ফলে তিনি কারাবাসী হইয়াছিলেন, আজ কারামুক্ত হইয়াও সেই মন্ত্রেই অটল বিশ্বাসী রহিয়াছেন। তাঁহার রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে অনেক মতভেদ হওয়া সম্ভব। অসহযোগ মন্ত্র হয়ত অনেকে মনের সহিত গ্রহণে অসমর্থ কিন্তু তাঁহার প্রভূত চরিত্রবল ও ঐকান্তিক সাধনা প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট শ্রদ্ধা ও পূজার সামগ্রী। তাঁহার বিচারকালে কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও বিচারপতি বলিয়াছিলেন,—even those who differ from

you in politics look up to you as a man of high ideals and leading noble and even saintly life. একথা প্রত্যেক ভারতবাসী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া জানেন। বিদেশী যাঁহারা তাঁহার মতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও তাঁহার সততায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে এই কৌপীনধারী ক্ষীণদেহী ভারতবাসীকে প্রবল প্রতাপশালী বৃটিশগভর্ণমেণ্টেরও সমীহ করিয়া চলিতে হয়। এ ভক্তি সম্মান আহরণ করিতে তাঁহাকে কোন প্রকার বাহিরের চাকচিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। ভিতরের তেজ ও গরিমা তাঁহাকে জগতবাসীর চক্ষে সম্মানের আসনে স্থান দিয়াছে।

শ্রীশান্তিভূষণ দত্ত।

মহাত্মাগান্ধীর পত্র

(১১)

রবিবার
চৈত্র কৃষ্ণা দ্বিতীয়া

কল্যাণীয় মণিলাল,

* * * * * মিঃ কোলেনবেক এখনই শোননা কেন, তোমার নিয়ম ভঙ্গ করা উচিত নয়। ভোজন সম্বন্ধেও এই নিয়ম রক্ষণ করা উচিত। যে কথাটা তুমি বুঝিতে পার নাই তাহার অর্থ যাহারা শুধু আইনের জন্য অর্থাৎ আইনের ভয়ে কোন কাজ করে তাহারা অভিশপ্ত। কিন্তু যাহারা আবার আইনঅনুযায়ী কাজও করে না তাঁহারা অধিকতর অভিশপ্ত (বাইবেল)। ইহার অর্থ, শুধু পড়াশুনা করিলেই মোক্ষলাভের পথ পাওয়া যায় না। গীতাতেও এইরূপ কথিত হইয়াছে ; শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"।

ইহার অর্থ এই নয় যে তুমি শাস্ত্রবিহিত কার্য্য একেবারেই করিও না। সেটা ত' করিতেই হইবে ; কিন্তু সেখানে থামিলে চলিবে না ; তাহার নিগূঢ় অর্থটী বুঝিয়া, তাহার মূল কারণ জানিয়া, নিজেকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে ইহাই তাহার অর্থ। যে বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শুষ্ক ব্রহ্মবাদী হয়, তাহার "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট" গতি হয়। সে শাস্ত্রের সাহায্য ত পায়ই না, জ্ঞানের আশ্রয়ও হারায়, এমনি তাহার দশা হয়। সেই জন্যই সেণ্টপল গোলিশিয়ন্‌সদের বলিয়াছিলেন—"তোমরা শাস্ত্রানুসারে কাজ করিয়া যাইতে পারো, কিন্তু যদি যীশুর প্রতি শ্রদ্ধা না রাখ, তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী না চল, তাহা হইলে তোমাদের জীবন অভিশপ্ত হইবে।" শাস্ত্রের নামে শত শত পাপের অনুষ্ঠান হইতেছে। পঞ্চম রোম্যান্সের ২০ শ্লোকের অর্থত' সহজ। "শাস্ত্রজ্ঞতা যেমন যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে, পাপও সেই অনুপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে" ; কিন্তু যখন পাপের জঞ্জাল জড় হইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়াছে, তখন ভগবানের কৃপা হইয়াছে। সার কথা এই যে এই কলিকালে শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞানের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এমন মানুষ আসিবে যে ভক্তিমার্গের সাহায্যে শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিবে। এটাও ভগবানের দয়া।

জীবনে পরিবর্ত্তনের আগে বিচার করিও। কিন্তু একবার পরিবর্ত্তন করার পর নূতনকে জোঁকের মত ধরিয়া থাকিতে হইবে। মিঃ কে—র ভক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু যেখানে তাঁহার কোন দোষ বা দৌর্ব্বল্য দেখিবে, সেখানে দূরে থাকিও। তুমি জীবনে যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছ তাহা খুব বুঝিয়া কর নাই। মিঃ কে—যাহা কিছু করিবেন সকলই

যে তোমায় করিতে হইবে এটা কিছু নয়। নিজে স্বতন্ত্র বিচার করিয়া তদনুযায়ী চলাই তোমার উচিত। সেটা করিবার সময় যদি কখনও কিছু ভুল হয় তাহার জন্য ভয় নাই; নির্ম্মল চিত্তে বিচার করিয়া তদনুযায়ী চলার অধিকার তোমার আছে।

নৈতিক দৃষ্টিতে যেটা তোমার কাছে ভাল বলিয়া মনে হইবে সেটা করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি মুক্তির অর্থ বুঝিয়া মুক্তিকামী হও ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু যতক্ষণ না তোমার স্বতন্ত্র বিচার করিবার শক্তি ও দৃঢ়তা আসিবে, ততক্ষণ তুমি তাহার উপযুক্ত হইবে না। এখন তোমার অবস্থা কতকটা লতার মত। লতা যে গাছকে আশ্রয় করে তাহার মতই তাহার আকৃতি হয়। কিন্তু আত্মার স্বরূপ এরূপ নহে, আত্মা স্বতন্ত্র ও সর্ব্বশক্তিমান্।

(১২)

ভাইশ্রী

শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে যাইতেছিলেন তখন দশরথ তাঁহাকে বলিলেন কৈকেয়ীর নিকট যে সত্য তিনি করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কিছু ভাবিতে হইবে না, সত্যভঙ্গ (বচনভঙ্গ) হয় হউক, তিনি যেন না যান। এই লৌকিক ও স্থূল পুত্রবাৎসল্যজাত ইচ্ছাকে ঠেলিয়া শ্রীরামচন্দ্র বনে যাইয়া সত্য পিতৃভক্তি প্রকাশ করিয়া নিজেকে ও দশরথকে অমর করিলেন। হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়া, পুত্রের গলায় আঘাত করিয়া স্ত্রীর প্রতি প্রেমও পুত্রবাৎসল্যের নিদর্শন দেখাইয়া গেলেন। প্রহ্লাদ পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পিতৃভক্তি দেখাইয়া পিতাকে উদ্ধার করিল। মীরাবাই রাণা কুম্ভকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভক্ত করিলেন। দয়ানন্দ পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া—বিবাহ না করিয়া—যাহারা তাঁহার অনুগমন করিতেছিল তাহাদের ছাড়িয়া মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি দেখাইয়াছিলেন। বুদ্ধ তরুণী স্ত্রীকে নিদ্রিত রাখিয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

এমন অনেক উদাহরণই আমরা পাইব। সেগুলিকে বিবেচনা করিয়া সেরূপ অবস্থা হইলে অন্তরে বিচার করিয়া সত্যনীতির দৃষ্টিতে যাহা ভাল মনে হইবে সেইটা করাই উচিত।

এই কথা গুলিবার বেলায় স্থূল ও সূক্ষ্ম ভক্তির ধারা মিশিয়া যায় সুতরাং এই সকল উদাহরণ লই পূর্ণসত্য আমার কাছে ফুটিয়া ওঠে না। সত্যপথের পথিকের কাছে বিপদের মধ্যেও সত্যপথ উদ্ভাসিত হয় আমরা সর্ব্বদাই বৈরাগ্যবিষয়ক কবিতা পড়ি, কিন্তু বিচারসঙ্কটের সময় যদি সেগুলা আমার কাজে না লাগে, তাহা হইলে সেগুলাকে "পাখীর বুলিই" বলা উচিত। সকল সময়ে গীতা পড়ি, অথচ যদি অন্তকালে তাহার কোন সহায়তা না পাই, তাহা হইলে গীতা পড়া না পড়া দুইই সমান হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং আমি বলি অল্পই পড়ো, কিন্তু যেটুকু পড় সেটা বুঝিয়া লও এবং তদনুযায়ী চলো।

যখন আমি আমার শুভকামী বন্ধুদের সম্বন্ধেও উদাসীন হইতে পারিব, তখনই আমি প্রকৃত দয়াবান হইতে পারিব, তখনই আমি সত্যভাবে শুভকামীদের সেবা করিতে পারিব। 'বা' সম্বন্ধে আমি যতবেশী উদাসীন হইতেছি, ততই তাঁহার অধিকতর সেবা করিতে পারিতেছি। বুদ্ধ তাঁহার মাতাপিতাকে ত্যাগ করিয়াই তাঁহাদের উদ্ধার করিলেন; গোপীচন্দ্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াই প্রকৃত মাতৃভক্তি দেখাইতে পারিলেন। তেমনি তুমি নিজের চরিত্র গঠন করিয়া, নির্ম্মল নীতিগ্রহণ করিয়াই তোমার মাতাপিতার সেবা করিতে পারিবে। যখন তোমার আত্মা পবিত্র হইবে তখন তোমার পরম বন্ধুগণের উপর তোমার চরিত্রের প্রভাব হইবেই।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ [২য় সংখ্যা

মধ্বাচার্য্য

মাধ্বসম্প্রদায়

মধ্যযুগের নয়শত বৎসরের মধ্যে চারিজন মহাপুরুষ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ভারত-ধর্ম্মক্ষেত্রে চারিটী নূতন ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া গিয়াছিলেন। ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কালডী গ্রামে অদ্বৈতবাদ-প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করের আবির্ভাব হয়। ইহার ৪০১ বৎসর পরে পেরুমবুদুরে ১০৮৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারোদ্দেশে আবির্ভূত হন। ইহার পর শতবর্ষের কিছু পরে তুলবদেশে শ্রীমধ্ব জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মকাল এখনও জানিতে পারা যায় নাই। তবে শ্রীমধ্বের তিরোভাব যে ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল প্রত্নবস্তুতাত্ত্বিকেরা তাহা স্থির করিয়াছেন। যাহাহউক, ইহার ১৬৮ বৎসর পরে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবির্ভূত হন। ইঁহাদের মধ্যে শঙ্কর অদ্বৈতবাদ, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্ব দ্বৈতবাদ এবং চৈতন্য অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রচার করেন। শঙ্কর অদ্বৈতবাদী, আর রামানুজ, মধ্ব ও চৈতন্য দ্বৈতবাদী বলিয়া প্রখ্যাত। মধ্ব ও চৈতন্যের মধ্যবর্ত্তী সময়ে আরও কয়েকজন মহাত্মা ধর্ম্মমত প্রচার করেন। ত্রয়োদশ শতকে বিষ্ণুস্বামী দ্বৈতবাদের ভিতর দিয়া এবং নিম্বার্ক ভেদাভেদ বাদের প্রচারে দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাতে ষোড়শ শতকে বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতমত প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল।

শ্রীমধ্বাচার্য্য মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। পূর্ণবোধ বা পূর্ণপ্রজ্ঞ নামে তিনি পরিচিত। উপনয়নের পর তিনি নয় বৎসর বয়সে বিদ্যাভ্যাসে রত হন। সনককুলোদ্ভব আচার্য্য অচ্যুত প্রেক্ষের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মধ্যগেহে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি গীতাভাষ্য রচনা করিয়া হিমালয়ে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হন। প্রবাদ আছে—এই ভাষ্য তিনি বেদ-ব্যাসকে প্রদান করেন। বেদব্যাসও বহু সমাদর করিয়া তাঁহাকে তিনটী শালগ্রামশিলা প্রদান করেন।

এই সম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণব বা রামানুজ-সম্প্রদায় অপেক্ষা আধুনিক, একথা পূর্ব্বেই বলা

হইয়াছে। মাধ্বদিগের গ্রন্থে বর্ণিত আছে, মধ্বাচার্য—সুব্রহ্মণ্য, উদিপি ও মধ্যতন এই তিনটী স্থানের মঠে পূর্ব্বোক্ত তিনটী শিলা স্থাপন করেন। এ ছাড়া, উদিপিতে আরও একটী কৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বিগ্রহ স্থাপন সম্বন্ধে একটী গল্প আছে:—কোনও বণিকের একখানি সোনার নৌকা মলবর যাইতে যাইতে তুলবদেশের নিকটে গিয়া ডুবিয়া যায়। ঐ নৌকায় এক কৃষ্ণবিগ্রহ গোপীচন্দন মৃত্তিকায় ঢাকা ছিলেন। মধ্বাচার্য্য দৈবশক্তিবলে তাহা জানিতে পারিয়া প্রতিমা উঠাইয়া আনিয়া উদিপিতে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত উদিপি নগর এই সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে। মহাপুরুষ সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় না, এমন বোধ হয় কখনও ঘটে না।।

যৌবনে মধ্বাচার্য্য ভীমাকৃতি ছিলেন বলিয়া তাহার একটী নাম 'ভীম'। কেহ কেহ তাঁহাকে বায়ুর অবতার এবং কেহ কেহ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়াছেন। মাধ্বদিগের মতে, ইঁহাদের মধ্যে বায়ুর উপাসনা ছাড়া অন্য কাহারও উপাসনায় ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি অসম্ভব।

শঙ্করের মায়াবাদের সবিশেষ আলোচনা করিয়া মধ্ব বেদান্ত পাঠ করেন। আচার্য্য কিছুদিন উদিপিতে অবস্থান করিয়া, সূত্রভাষ্য ঋগ্‌ভাষ্য, দশোপনিষদ্‌ভাষ্য, অনুবাক্‌নির্ণয়বিবরণ, অনুবেদান্তরসপ্রকরণ, ভারততাৎপর্য্যনির্ণয়, ভাগবত তাৎপর্য্য, গীতাতাৎপর্য্য, কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, তন্ত্রসার প্রভৃতি ৩৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে বেদান্তসূত্র, ভগবদ্গীতা ও ভারততাৎপর্য্যনির্ণয় প্রধান।

তিনি কয়েকবার ভ্রমণে বহির্গত হন ও দ্বৈতবাদের প্রচার আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি দক্ষিণভারত পরিভ্রমণ করেন ও চারিমাস রামেশ্বরে থাকিয়া আবার উদিপিতে আসেন। প্রথম বারের ভ্রমণ ও মতপ্রচারের সময় শঙ্করের শৃঙ্গেরীমঠের শৈব সন্ন্যাসীদের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ বড় সহজ হয় নাই। উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের মতবাদের ভুল দেখাইয়া, নিন্দা করিয়া, কুৎসা রটাইয়া নিজ নিজ বিশ্বাসানুসারে ধর্ম্মপ্রচার করিতে চাহিয়াছেন।

প্রথমবারের ভ্রমণেই আচার্য্যের মত খুব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফিরিয়া আসিয়া কয়েক বৎসর উদিপিতে থাকিয়া, তিনি বেদান্তসূত্র শেষ করেন। দ্বিতীয়বার তিনি উত্তর ভারতে ভ্রমণ করেন। তার পরেই হরিদ্বারে গমন করেন। তখন উপবাস ও ধ্যানধারণায় তিনি এমন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রিয় শিষ্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশায় হিমালয়ে চলিয়া যান। সহসা তাঁহার হিমালয়ে প্রস্থান করিবার কারণ অজ্ঞাত হইলেও তপস্যা ও আত্মমতের সিদ্ধির মানসেই যে তিনি গিয়াছিলেন, তাহা বোঝা যায়। সেখানেও তিনি নাকি মহাভারতকার ব্যাসের সাক্ষাৎ পান। শঙ্করের সঙ্গেও তিনি নাকি আলাপ করিয়াছিলেন। ব্যাস বা শঙ্করের সহিত মধ্বের সাক্ষাৎকার একেবারে অসম্ভব। যাহা হউক উদিপিতে ফিরিয়া আসিয়া শঙ্করমতের একজন প্রধান সন্ন্যাসীকে তিনি দীক্ষিত করেন। ইহাতেও শঙ্করাচার্য্যের শৃঙ্গেরীমঠের শিষ্যদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তাঁহারা তাঁহাদের মতবিরোধী এই নূতন আচার্য্য ও নূতন মতের উচ্ছেদ সাধনের প্রয়াসী হন। : [illegible]

মধ্বাচার্য্যের শিষ্যসংখ্যা ক্রমশঃ যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তিনি উদিপির মন্দির ছাড়া ক্রমে ক্রমে আরও আটটী মন্দির প্রস্তুত করাইয়া বিবিধ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং নিজ ভ্রাতাকে ও গোদাবরীতীরস্থ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব আটজন সন্ন্যাসীকে ঐগুলির অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন। যে সময় যিনি অধ্যক্ষতা করিবার ভার লন, দেবালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার তখন তাঁহাকেই বহন করিতে হয়। প্রশংসা লাভের জন্য অধ্যক্ষেরা ধুমধাম করিয়া ব্যয়ের মাত্রা এত বৃদ্ধি করিয়া ফেলেন যে, তের হাজার হইতে কুড়ি হাজার টাকা পর্য্যন্তও সময় সময় ব্যয় হইয়া যায়। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য সন্ন্যাসীরা বিষয়ী শিষ্য-প্রশিষ্যের কাছে নানা স্থানে গিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন এবং যিনি যখন অধ্যক্ষ থাকেন, তাঁহার অধ্যক্ষতার সময় তাঁহার সংগৃহীত অর্থ উদিপির মন্দিরে দেব-সেবায় ব্যয় করিয়া থাকেন।

কাস্থুর, পেজাওর, আদমার, ফলমার, কৃষ্ণকুর, ঝিবার, ঝোদ, পুত্তি, এই আট স্থানে আটটি দেবালয় আছে। এই আটটি দেবালয়ই তুলব রাজ্যের অন্তর্গত। মধ্বাচার্য্য, তাঁহার শিষ্য পদ্মনাভ তীর্থকে বলেন যে, তুমি আমার মত প্রচার কর ও দেব-সেবাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ কর। তিনি ইঁহাকে আরও কয়েকটী মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। সেই সময় হইতে এক একজন করিয়া শিষ্য সেখানকার অধ্যক্ষ হইয়া আসিতেছেন। উদিপির মন্দিরেও তাঁহারা গমন করেন, কিন্তু অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন না।

সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য লোকের দীক্ষাগুরু হইবার অধিকার এ সম্প্রদায়ের মধ্যে নাই। জাতিতে নীচ না হইলে আচার্য্যগণ সকল জাতিকেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। পৈতৃক শিষ্যমণ্ডলীর উপর গুরুদেবের অধিকার অসাধারণ। গুরুত্ব-পদ বিক্রয় ও বন্ধক দিবার পদ্ধতি ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছে। এই উপায়ে গুরুর আপদে বিপদে অর্থোপার্জ্জন হয়; কিন্তু শিষ্যের গুরুত্যাগ ও গুরু-গ্রহণ—গুরুর ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরকালের মত যাঁহারা সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, শৈশব হইতেই তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। উদাসীন আচার্য্যগণ দণ্ডীদের মত যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন, দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করেন, মস্তক মুণ্ডিত করেন এবং এক এক খণ্ড গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন।

মধ্বাচারীরা উত্তপ্ত লৌহের দ্বারা স্কন্ধ ও বক্ষোদেশে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের চিহ্ন অঙ্কিত করেন এবং শ্রীবৈষ্ণবদিগের ন্যায় নাসামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত দুটী ঊর্দ্ধরেখা চিহ্নিত করিয়া দেন। দুই রেখার দুই দিক্, আর একটি রেখা দ্বারা ভ্রূর মধ্যদেশে যোগ করিয়া দেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা ঐ দুই ঊর্দ্ধরেখার মধ্য দিয়া পীত ও রক্তবর্ণ আর একটা ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কন করেন; মধ্বাচারীরা তাহার পরিবর্ত্তে নারায়ণকে নিবেদন করিয়া, গন্ধদ্রব্যের ভস্মদ্বারা ঐ স্থলে একটি কৃষ্ণবর্ণ রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার শেষভাগে হরিদ্রাময় গোলাকার একটি তিলক করিয়া থাকেন।

ইঁহারাও অন্যান্য বৈষ্ণবের ন্যায় বিষ্ণুকে বিশ্বকারণ, পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন এবং নিজের মত পোষণের জন্য উপনিষৎ ও অন্যান্য গ্রন্থাদির বচন উদ্ধৃত করেন। ইঁহাদের

মতে প্রথমে একমাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্বকারণস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন। জগৎ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন। তিনি অশেষরূপগুণসম্পন্ন, অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ ও স্বতন্ত্র। মধ্বাচারীরা জীব ও পরমেশ্বরের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা স্বীকার করায় দ্বৈতবাদী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই জন্যই ইঁহাদের সঙ্গে রামানুজের মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। ইঁহারা বলেন, জীব নিত্য ঈশ্বরের অধীন।

পক্ষী ও সূত্রে, বৃক্ষ ও রসে, নদী ও সমুদ্রে, শুদ্ধ জল ও লবণে, চোর ও হৃত দ্রব্যে, পুরুষ ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে যেমন প্রভেদ, জীব ও ঈশ্বরেও সেইরূপ প্রভেদ। আরও পঞ্চ প্রকারের ভেদ ইঁহারা স্বীকার করেন।

জীবেশ্বর ভেদ, জড়েশ্বর ভেদ, জড়-জীব-ভেদ এবং জীবগণ ও জড় পদার্থের ভেদ, এই পঞ্চ ভেদের নামই প্রপঞ্চ। ইঁহারা পরমাত্মায় জীবের লয় বা নির্ব্বাণমুক্তি অস্বীকার করেন এবং শৈবদের যোগ ও বৈষ্ণবের সাযুজ্য স্বীকার করেন না।

ইঁহারা বলেন,—লক্ষ্মী, ভূমি ও লীলাদেবী, এই তিন পত্নীর সঙ্গে নারায়ণ, স্বর্গীয় বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য সুখ সম্ভোগ করেন। তিনি স্বরূপ অবস্থায় গুণের অতীত, কিন্তু যখন মায়ার সহিত সংযুক্ত হন, তখন সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই তিন গুণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে থাকেন। ইঁহারা বলেন,—বিষ্ণু প্রধান, পুরাণ-সম্প্রদায়ে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি; ব্রহ্মার অশ্রুতে রুদ্রের উৎপত্তি।

ইঁহাদের মতে উপাসনার তিনটি অঙ্গ,—প্রথমতঃ অঙ্কন (শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ)। দ্বিতীয় অঙ্গনামকরণ (বিষ্ণুর নামে সন্তানগণের নামকরণ)। তৃতীয় অঙ্গভজন (কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভজনের অনুষ্ঠান)। দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা মানসিক ভজন। সত্যকথন, হিতকথন, প্রিয়ভাষণ ও শাস্ত্রানুশীলন, এই চারিটী বাচিক ভজন; আর দান, পরিত্রাণ, পরিরক্ষণ, এই তিনটি কায়িক ভজন।

ভজনং দশবিধং—বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ, কায়েন দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং, মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি, অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনমিতি। এই দশটী মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মনীতির সার। অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইঁহাদিগের বিগ্রহ-পূজা এবং দেবোৎসব প্রচলিত আছে। উাঁদপির বিগ্রহের দশটী উপাচারে পূজা হয়। ইঁহাদের দেবালয়ে বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত শিব, পার্ব্বতী ও গণেশের প্রতিমূর্ত্তি থাকে এবং তাঁহাদের যথানিয়মে পূজা হয়। ইঁহাদের মতে শিব ও ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাই অনিত্য ও ক্ষর, লক্ষ্মীই একমাত্র অক্ষর। বিষ্ণু ক্ষরাক্ষর হইতে প্রধান ও স্বতন্ত্র।

মধ্বাচারীদের দেব-সেবা, দেবতান্তরের নিন্দা না করা এবং সকল দেবদেবীকে নমস্কার করা প্রভৃতি সদ্গুণসকল শ্রীচৈতন্যদেবও স্বীকার করেন।

মধ্বাচারীদের ধর্ম্মমতের প্রধান কথা উপনিষদের ব্রহ্মই বিষ্ণু। দ্বিতীয়তঃ যখনই তিনি অবতীর্ণ হন, বায়ুর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন।

মণিমঞ্জরী গ্রন্থে প্রথমতঃ মধ্বাচার্য্যের কথা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ মাধ্ববিজয়

গ্রন্থে আলোচনা আছে। কিন্তু এই উভয় গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। নারায়ণ নামক কোনও ব্যক্তি গ্রন্থ দুইখানি লেখেন। এই নারায়ণ ত্রিবিক্রমের পুত্র এবং ইনি মধ্বাচার্য্যের অনুগত শিষ্য। বায়ুস্তুতি নামক ত্রিবিক্রমের আর একখানি গ্রন্থ আছে। কৃষ্ণস্বামী আয়ারের শ্রীমাধব ও মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই সমস্ত বিবরণ হইতেই এই সম্প্রদায়ের বিবরণ সংগ্রহ করা যায়।

বৈষ্ণবদিগের চারিটি প্রধান সম্প্রদায় আছে। দ্বিতীয় প্রধান সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্মসম্প্রদায়। মধ্বাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া যেমন ইহাকে মাধ্ব সম্প্রদায় বলে, তেমন আবার ব্রহ্মসম্প্রদায় নামেও এই সম্প্রদায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

মণিমঞ্জরী গ্রন্থের প্রথম চারি সর্গে রাম ও কৃষ্ণ অবতারের কথা আছে। রামের ভক্ত হনুমান্, এই হনুমান্ কিন্তু বায়ুপুত্র। কিন্তু কৃষ্ণের সখা অর্জ্জুন হওয়া উচিত ছিল, এখানে কিন্তু ভীমের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই ভীমও কিন্তু বায়ুপুত্র। বনপর্ব্বে (মহাভারতে) উল্লিখিত আছে, হিমালয়ের পশ্চাদ্ভাগে যক্ষ বা রাক্ষস জাতিকে ভীম আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সেনাপতি মণিমান্‌কে নিহত করিয়াছিলেন। মণিমান্ এক সময়ে অগস্ত্য ঋষিকে অপমান করিয়াছিলেন, অগস্ত্য ঋষি সেই জন্য অমর মণিমান্‌কে "তোমার মৃত্যু হউক" বলিয়া অভিসম্পাত করেন। এই পুস্তকখানি মধ্বাচার্য্য পুনর্ব্বার লিখিয়া সম্পাদন করেন।

মণিমঞ্জরীর ৫ম সর্গে কলিযুগের বর্ণনা আছে। লোকায়তের পুত্র চাণক্য শকুনি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, চার্ব্বাক, জৈন ও পাশুপত মত ধ্বংস করেন। বেদের অসুরেরা কৃষ্ণ ও ভীমের বিরুদ্ধাচরণ করে। এই সময় বেদান্তের দোহাই দিয়া প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমত প্রচারের জন্য মণিমন্ত শঙ্কর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।* মণিমন্ত ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর বেশে বেদান্ত ধ্বংস করিতে চান।

কেহ কেহ বলেন,—মধ্বাচার্য্য প্রথমে শৈব ব্রাহ্মণ ছিলেন; তার পর বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, শৈব ও বৈষ্ণবের পরস্পরের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করেন। প্রথমে তিনি অনন্তেশ্বর নামক শিবমন্দিরে দীক্ষিত হন। দ্বিতীয়তঃ তিনি শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত তীর্থ উপাধি গ্রহণ করেন। তৃতীয়তঃ মধ্বাচারীদিগের দেবালয়ে বিষ্ণুর সহিত একত্র শিবপার্ব্বতী প্রভৃতিরও পূজার ব্যবস্থা করেন। চতুর্থতঃ মাধব ও শঙ্কর-গুরুদিগের শিষ্যেরা পরস্পর উভয় পক্ষীয় গুরুদিগেরই নমস্কার ও শ্রদ্ধাভক্তি করেন এবং শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠের মহান্ত, উদিপি নগরের কৃষ্ণ-মন্দিরে পূজা করিতে আসেন। যে সকল শৈব ও বৈষ্ণব এরূপ সদ্ভাবসম্পন্ন না হইয়া পরস্পর বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, মধ্বাচারীরা তাঁহাদের পাষণ্ড বলিয়া অবজ্ঞা ও নিন্দা করেন। কিন্তু গ্রীয়ার্সন বলেন, অনেকেরই বিশ্বাস, এই সম্প্রদায় শৈব ও বৈষ্ণবের মিলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রামাণ্য গ্রন্থাদির অনুশীলন করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ দূর হয় নাই।

---

* মধ্বাচারীরা শঙ্কর শব্দের বানানে শ-এর পরিবর্ত্তে স-কার ব্যবহার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করকে বর্ণসঙ্কর প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ সর্গে কুমারিল ভট্টের দিগ্বিজয়ের কথা আছে এবং প্রতিদ্বন্দী প্রভাকরের কথাও আছে। এই মণিমন্তই বিধবার জারজ সন্তান; ইনিই শঙ্করাচার্য্য। অন্য গ্রন্থে আছে, বিশিষ্টা দেবী উৎকট তপস্যাচরণ করিতে আরম্ভ করেন, সেই জন্য স্বয়ং মহেশ্বর তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু এই ঘটনায় বিশিষ্টা দেবীর উপর সামাজিক শাসনও আরম্ভ হয়। এমন কি, তাঁহার পিতা অবধি ইহাতে কন্যার প্রতি বিরূপ হন। কিন্তু বিশিষ্টা দেবীর পিতা শিবকর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হওয়ার পরে কন্যার প্রতি সদয় হন। কুমারী মেরীর গর্ভে যেরূপ যিশুখৃষ্ট জন্মিয়াছিলেন, বিধবা বিশিষ্টা দেবীর গর্ভেও তেমনই জগদগুরু শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল।

ঘোর দারিদ্র্য-দশায় শঙ্করাচার্য্য প্রতিপালিত। তিনি অল্প বয়সেই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গুরুর কাছে গিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি সম্বন্ধে বিফলমনোরথ হন। তার পর তাঁহার মত সম্বন্ধে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং বেদান্তের ধর্ম্মমত মনে দৃঢ় করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করেন। শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, এমন কথাও অনেকে বলিয়াছেন।

সপ্তম সর্গে আছে, শঙ্কর তাঁর এক ব্রাহ্মণ অতিথি-পত্নীর সতীত্ব নষ্ট করেন। তিনি যাদুবিদ্যা প্রভাবে তাঁহার মত প্রচার করেন ও দলের পুষ্টি সাধন করেন। তারপর তিনি পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী জীবনের ছায়াপাত

বিদ্যা-শিক্ষা

প্রাচীন ভারতে শিশুর পঞ্চম বর্ষে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হইত। রঘুবংশের তৃতীয় সর্গের অষ্টবিংশতি শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ এসম্বন্ধে একটী প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"প্রাপ্তে তু পঞ্চমে বর্ষে বিদ্যারম্ভঞ্চ কারয়েৎ।

কবিকঙ্কণের সময়েও তাহাই হইত; শ্রীমন্তের পঞ্চম বর্ষে কর্ণবেধ ও কুলপুরোহিতের নিকট "হাতে খড়ি" হইয়াছিল—

"শুনি বাক্য খুল্লনার দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার
হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে।"

বৃন্দাবনদাস-কৃত "চৈতন্য ভাগবতে"ও "হাতে খড়ি"র উল্লেখ আছে—

"হেন মতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল॥"

এখন যেমন এদেশের মুদির দোকানে এবং উত্তর ভারতের গ্রাম্য পাঠশালায় কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠফলকের উপর খড়ি দিয়া কিম্বা শ্বেতবর্ণ ফলকের উপর কালি দিয়া লিখিবার প্রথা

প্রচলিত আছে, প্রাচীন ভারতেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল ; বস্তুতঃ তখন ফলক আধুনিক শ্লেটের কাজ করিত। সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার "ব্যবহারতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে ব্যাস সংহিতা হইতে এ সম্বন্ধে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"পাণ্ডুলেখ্যেন ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ।
ঊনাধিকন্তু সংশোধ্য পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ ॥"

উদ্ধৃত বচনের ভাবার্থ এই যে, কোনও দলিল পত্রে কিছু লিখিবার পূর্ব্বে ফলকে বা ভূমিতলে উহার একটা মুসাবিদা লিখিয়া সংশোধন করিবে। মুসলমান ভ্রমণকারী আলবারুণি নয়শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ; তিনিও এখানকার পাঠশালার ছাত্রদিগকে কৃষ্ণবর্ণ ফলকে খড়ি দিয়া অক্ষর বিন্যাস করিতে দেখিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কণ শ্রীমন্তের বিদ্যাভ্যাস বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

পড়য়ে সাধুর বালা প্রথমে আঠার কলা
বিহানেতে করিয়া ভোজন।
গুরুবাক্য দিয়া কর্ণে চিনিল অনেক বর্ণে
ভুঞ্জিল পালিল শুভক্ষণ ॥
পড়িল শ্রীপতি দত্ত জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব
রাত্রি দিবা করয়ে ভাবনা।
নিবিষ্ট করিয়া মন লেখে পড়ে অনুক্ষণ
দিনে দিনে বাড়য়ে ধারণা ॥
রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা ন্যায় কোষ নাটিকা
গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।
জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব পড়িল অনেক মত
বিদ্যা বিনে নাহি অন্য মন ॥
পড়ি রামায়ণ দণ্ডী করিতে কবিত্ব খণ্ডী
নানা ছন্দে পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগ পড়িল ভারবি মাঘ
বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল ॥ *

---

* ইহার পরে পুস্তকান্তরে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়—

"পড়িয়া ভদাত বৃত্তি, বীর সভায় পুরোবর্ত্তী,
নিরন্তর করয়ে বিচার।
দিবানিশি যত্নবান, পড়ি ভট্টি অভিধান,
পুথি শুধি বিবিধ প্রকার ॥
জৈমিনি ভারত সুত, তবে পড়ে মেঘদূত,
নৈষধ কুমারসম্ভবে।
দিবানিশি নাহি জানি, পড়ে রঘু শ্বেতবাণী,
রাঘব পাণ্ডবী জয়দেবে ॥

জৈমিনি ভারতামৃত ব্যাস পড়ে মেঘদূত
নৈষধ কুমার সম্ভবে।
দিবা নিশি নাহি জানি পড়ে রঘু শ্বেত মুনি
রামগুরু প্রসন্নরাঘবে॥
বৈদিক জ্যোতিষ যত বিশেষ বলিব কত
একে একে পড়িল শ্রীপতি।
রচিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামিন্যায় যাহার বসতি॥'

কবিকঙ্কণের সময়ে "পাঠশালের" (চতুষ্পাঠীর) গুরুমহাশয় পৌরোহিত্য কার্য্যও করিতেন, শ্রীপতির শিক্ষা-গুরু ও কুলপুরোহিত দনাই ওঝা (জনার্দ্দন উপাধ্যায়) তাঁহাকে যে কারণে "পাঠশাল" হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন, কবি তাহা সবিশেষ বিবৃত করিয়া সেকালের ব্রাহ্মণ শিক্ষা-গুরুর আত্মম্ভরিতা ও জাত্যভিমানের বেশ পরিচয় দিয়াছেন—

"সমাপ্ত করিয়া আগে নিজ অধ্যয়ন।
কৌতুকে শুনেন যত পড়য়ে ব্রাহ্মণ
রাম ওঝার পো নামে দামোদর।
কুলে ওঝা বাঁড়ুরি পদবী রত্নাকর
পূর্ব্বপক্ষ করে সাধু সভা বিদ্যমানে।
আপনে দনাই ওঝা করে সমাধানে॥
পুত্র বুদ্ধে অজামিল বলি নারায়ণ।
বৈকুণ্ঠ চলিলা দ্বিজ চাপিয়া বিমানে।
দ্বিজ হয়ে বহুকাল বেশ্যা করি সঙ্গ।
এজন পাইল মুক্তি এই বড় রঙ্গ
গজেন্দ্র পাইল মুক্তি হরির পরশে।
চতুর্ভুজ হয়ে গেল বৈকুণ্ঠ নিবাসে॥
দিয়া কৃষ্ণে পূতনা গরল স্তনপান।
রাক্ষসী গোলক গেল চাপিয়া বিমান॥
যশোদা দেবকী দুহে পাইল যে গতি।

অষ্টাদশ কাব্য পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি'
রত্নাবলী সাহিত্য দর্পণে
দিবা নিশি নাহি জানে, পড়ে সংখ্য সাঙ্খ্য সনে,
প্রসন্ন রাঘব রামগুণে॥
দৈব জ্যোতিষ যত, বিশেষ বলিব কত
একে একে পড়িল শ্রীপতি।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
দামুন্তায় যাহার বসতি॥"

বিষস্তন পিয়াইয়া পাইল সেমতি ॥
মুচকুন্দ কৈল স্তব দৈবকীনন্দনে।
তবে কেন কৈল গর্ব্ব শরীর কারণে ॥
তৎক্ষণাৎ পাপ নাশ হইল দ্বিজবর।
তবে মুক্তিপদ তারে দিল গদাধর ॥
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি।
সমাধান বুঝাবারে ওঝা কৈল মতি ॥
কৃষ্ণ ইচ্ছা ব্যতিরেক নাহি সমাধান।
হাসিয়া বলিল গুরু সভা বিগ্যমান ॥
গুরুটীকার বিচার কর, না বল ঝটিত।
কেন বা প্রভুর ইচ্ছা হবে অনুচিত?
সক্রোধ হইলা দ্বিজ সাধুর বচনে;
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥"
"পঁচাশী বৎসর হৈল আমার বয়েস।
নিরন্তর অধ্যয়ন টীকার নাহি লেশ ॥
শিশু বুঝাবারে মোর টীকার বিচার।
ইহার অধিক অপমান নাহি আর ॥
বুঝিনু বচন নাহি প্রবেশিল পেট।
উচিত বলিতে তোর মাথা হবে হেঁট ॥
গুরু উচিত বলিতে কিবা মান অভিমান।
শাস্ত্রের বচনে নাহি কর অবধান ॥
গোত্রে দুর্ব্বাসা ঋষি কুলে দত্ত বেণিয়া।
ব্রাহ্মণের মত নহি বল্লাল-সেনিয়া ॥
মাথা হেঁট হবার কারণ আমি চাই।
যদি নাহি বল রাধাকান্তের দোহাই ॥
পিতা দীর্ঘ পরবাসে তোমার জনম।
নাহি জান আপনার জাতির মরম ॥
মরি গেল ধনপতি স্থান বহু দিশ ॥
মায়ের আয়তি হাতে, ভোজন আমিষ ॥
বেহুয়া এমত জনে শুনাই পুরাণ।
এই হেতু আমার এতেক অপমান ॥
রাজার সভায় পিতা আছেন সিংহলে।
কহিছ নিঠুর বাণী পৈতার বলে ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমায় সহি কটু কথা।

কহিতে উচিত এখন মনে পাবে ব্যথা ॥
উগ্র ব্রাহ্মণ জাতি সহজে চপল।
তমোগুণে কহ কথা হইয়া প্রবল ॥
ছুঁইতে না যুয়ায় বেটা জাতিতে ঢেমনে।
উগ্র বসিয়া গালি দিল ব্রাহ্মণে ॥
অবিলম্বে যাও বেটা পাঠশাল ছাড়ি।
মাথা ভাঙ্গিব পাছে মারিয়া পাবুড়ি ॥
ধনের গরব বেটা মোবে না দেখাও।
গৌরব রাখিয়া বেটা এথা হৈতে যাও ॥
অবিচারে মিথ্যা গুরু পরিবাদ বল।
ঢেমনের ঘরে কেমনে খাও জল ॥
পঞ্চাশ কাহন করি লও মাসের মাস।
আমি যদি ঢেমন তোমার জাতি নাশ ॥
বুঝিয়া না কহ কথা হইয়া পণ্ডিত।
কোপেতে উন্মত্ত হয়ে বল অনুচিত ॥
আছয়ে গঙ্গাব জল বিষ্ণুর ভবনে।
চাহিলে আনিয়া দেয় উত্তম ব্রাহ্মণে ॥
পঞ্চাশ কাহন লই পড়াইয়া বেতন।
তোমার ঘরের জল খায় সে কোন্ ব্রাহ্মণ ॥
শ্রীমন্তের দুই চক্ষু ধারা শ্রাবণ।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥”

গুরু ধনাঢ্যের সন্তানের নিকট মাসিক পঞ্চাশ কাহন কড়ি বেতন পাইতেন, কিন্তু অন্যান্য ছাত্রের নিকট যে যৎসামান্য বেতন পাইতেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

মাণিক গাঙ্গুলি কৃত “শ্রীধর্ম্মমঙ্গল” কাব্যে রাণী রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন ও কর্পূরের বিদ্যাশিক্ষার বিস্তারিত বিবরণ আছে—

“নরোত্তম নিত্য নিবিষ্টতা বড়ি।
আরম্ভ করিল বিদ্যা দিয়া হাতে খড়ি ॥
অকার আদি ক্ষকারান্ত যে যে বর্ণগুলি।
ক্রমিক হইতে ভুমে লেখালা সকলি ॥
বর পুত্র ধর্ম্মের ধীষণবান হয়।
হলো অনায়াসে দিন দশে বর্ণ পরিচয় ॥
ব্যাকরণ প্রথমে সে পড়িল নানা মত।
পাণিনি কলাপ ভাষ্য কোষ শব্দ শত ॥
অষ্ট দিন আমূলক প’ড়ে অভিধান।

দৃঢ় হল দোঁহাকার দিব্যাস্তর জ্ঞান ॥
অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।
মুরারী ভারবি ভট্টি নৈষধ পিঙ্গল ॥
কালিদাসকৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্ত্র ॥

*   *   *   *

বাকী নাই শাস্ত্র কিছু সকল পড়িলা।
সেই কথা নরোত্তম সকল কহিলা ॥
মল্ল বিদ্যা দোঁহে করাও অভ্যাস।
ভাল হয় ভূপতি শুন আমার ভাষ ॥

সে কালে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা বড় একটা ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যেও সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট অনুশীলন হইত। আমরা পূর্ব্বেই শ্রীপতির বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি। ঘটক ধনপতি সওদাগরের সহিত খুল্লনার বিবাহপ্রস্তাবকালে বরের গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিতেছেন—

"দানে কর্ণ সমান উচ্চ অভিলাষ।
নাটক নাটিকা কাব্য করেছে অভ্যাস ॥

খুল্লনাও নিতান্ত অশিক্ষিতা ছিলেন না, তাঁহার সপত্নী লহনা যখন তাঁহাকে ধনপতির লিখিত বলিয়া একখানা কৃত্রিম পত্র পড়িতে দিলেন, তখন তিনি তাহা পড়িয়াই বুঝিলেন যে উহা তাঁহার স্বামীর লেখা নহে —

"লহনার বোলে পড়িল পাতি।
হাসে ছন্দ দেখি ভিন্ন ভাতি ॥
বলে 'দিদি! ইথে নাহিক ত্রাস।
কেন লিখি পত্র কর উপহাস ॥
মোর প্রভুর অক্ষর ভিন্ন ছন্দ।
কেনে লিখি পত্র কপট প্রবন্ধ ॥' "

কবিকঙ্কণের সময়ে স্ত্রীলোকে পত্র পড়িতে এবং লিখিতেও পারিতেন। উপরোক্ত জাল চিঠি ধনপতির হস্তগত হইলে তিনি উহা লীলাবতী ব্রাহ্মণীর লেখা বলিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন—

"উজানী নগরে বৈসে যত জন জানি।
একে একে অক্ষর সবার আমি চিনি ॥
পাপমতি হিংসামতি তুহুলো দুঃশীলা।
কপটে লিখিল পাতি তোর সই লীলা ॥"

বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা জয়দেব গোস্বামীর সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ

শতাব্দীতে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং তৎপরেও কয়েক শতাব্দী কাল এদেশ সংস্কৃত-সাহিত্যজগতে উচ্চস্থান রক্ষা করিয়াছিল। চৈতন্যের সময়ে, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, নবদ্বীপ ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রানুশীলনের জন্য ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। সে সময়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামক একজন অদ্বিতীয় অধ্যাপক এখানে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার অধ্যাপনার কথা আর কি বলিব? চৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তখন হইতে নবদ্বীপে নানাপ্রদেশবাসী বিদ্যার্থীর সমাগম হইতে লাগিল; চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

"চতুর্দ্দিক হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥
চাটীগ্রামনিবাসীও অনেক তথায়।
পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায় ॥"

এখনও ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে বিদ্যার্থীরা নবদ্বীপে আসিয়া থাকেন।

নবদ্বীপের রাজারা অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ দিতে ত্রুটী করেন নাই। ৺কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই সময়ে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ী হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন; ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন; ষড়্দর্শনবেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ; গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুরে রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিরাজমান ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিয়ত রাজসন্নিধানে থাকিতেন, অপর পণ্ডিতগণ রাজার আহ্বান-মতে উপস্থিত হইতেন। রাজা তাঁহাদিগকে বহু যত্ন ও সমাদর সহকারে রাখিয়া তাঁহাদের সহিত শাস্ত্র আলাপ করিতেন।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে যে সকল বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন ৺কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় তাঁহাদেরও নাম করিয়াছেন—

"এই রাজার সময়ে, নবদ্বীপে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, কাশীনাথ চূড়ামণি, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ, রামনাথ তর্কপঞ্চানন, রামলোচন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, এবং রাম নাথ তর্কসিদ্ধান্ত, রামদাস সিদ্ধান্ত, কালীকিঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, কৃপারাম তর্কভূষণ প্রভৃতি বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন। ত্রিবেণীনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও শান্তিপুর-বাসী সুবিখ্যাত রাধা মোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও তদানীং বিদ্যমান ছিলেন।"

চৈতন্যভাগবত-কার বৃন্দাবনদাসের সময়ে কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেব সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইতেন—

"ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাস॥"

"চৈতন্যচরিতামৃত" হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের বড় ভক্ত ছিলেন—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দে।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দে॥"

চৈতন্যের সময় হইতে বঙ্গের গ্রামে গ্রামে হরিসঙ্কীর্ত্তন ও পথে পথে বৈষ্ণব বৈরাগীর গান প্রবর্ত্তিত হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতার ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়াছিল। সুপাঠক কর্ত্তৃক ভাগবতাদি-পুরাণ-পাঠও লোকশিক্ষার—বিশেষতঃ নারীশিক্ষার—সামান্য সহায়তা করে নাই। কবিকঙ্কণের সময়ে পুরাণ পাঠ খুব প্রচলিত ছিল। ধনপতির বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কামনায়—

"প্রতি দিন ভাগবত শুনেন লহনা।"

সিংহল-রাজ-দুহিতা সুশীলা শ্রীমন্তকে সিংহলে ধরিয়া রাখিবার জন্য যে সকল সুখের উল্লেখ করিয়াছিলেন মাঘ মাসে পুরাণ শ্রবণ তন্মধ্যে একটি—

"মাঘ মাসে প্রভাতে করিয়া স্নান দান।
সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ॥"

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ।

নয়নিকা

তোমারে জানিনা আমি, শুধু জানি তব
নয়নের সম্মোহন, ওই আঁখি দিয়া
মনে হয় বুঝি তব চিরমৌনী হিয়া
মোর সাথে কথা কয়। এমনি নীরব
পূর্ণিমার স্নিগ্ধদৃষ্টি, তারকার বাণী,
কুসুমের কানাকানি আঁখি ভরে শুনি
এমনি নিঃশব্দ সুরে; সন্ধ্যা উষারাণী
অনিমিখ্ স্তব্ধ নেত্রে ছায়ালোক বুনি
ইন্দ্রজাল রচে হেন এ চিরচঞ্চল
চিত্তটিরে বাঁধিবারে। তোমার নয়নে
নিখিলের মৌনবাণী করুণ কোমল
ছন্দ সুরে ভাষা পায়; মুগ্ধ দরশনে
যবে মোর মুখপানে চাও সচকিতে
চিত্ত হয় বাণীময় আঁখির দৃষ্টিতে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদ

মানব ব্যষ্টিভাবে ব্যক্তিগতজীবনে ও সমষ্টিভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনে অপরের উপর প্রভুত্ব করিয়া নিজের অহঙ্কার বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চায়। যখনই কোন দেশে কোন রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হয়, তখনই তাহার শক্তিকে অপর দেশ জয় করিবার জন্য নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করে। সে রাষ্ট্র মিসর, আসেরিয়া, ব্যাবিলন, স্পেন বা রাসিয়ার ন্যায় রাজতন্ত্রশাসিতই হউক, বা রোম, ভিনিস্ ব ওলন্দাজ গণতন্ত্রের ন্যায় প্রজাশাসিতই হউক, অপরের ধনরত্ন লুণ্ঠন কার্য্যে উভয়েই সমানরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। কখন কখন এই লুণ্ঠন কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য বিজয়ী রাষ্ট্র বিজাতিদিগকে একেবারে ধরাধাম হইতে অপসারিত করিয়া দিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আসেরিয়া ও স্পেনের নাম করা যাইতে পারে। আবার নিজদের মধ্যে যাঁহারা গণতন্ত্রের উদার সাম্যবাদ প্রচার করিয়া সুসভ্য বলিয়া লোকসমাজে পূজিত হইয়াছেন; তাঁহারাও অপরের উপর প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্খা হইতে মুক্ত নহেন। পেরিক্লিসের যুগের এথেন্স তাহার প্রত্যেক নাগরিককে যাহা ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা দিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব করিলেও, আইওনিয়ান্ ও ইজিয়ান সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী তাঁহাদের সমজাতীয় লোকদিগকে অধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই। বহু রক্তপাতের পর গতশতাব্দীতে ফরাসীদেশে সাম্যবাদের উপর ভিত্তি করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল—কিন্তু যখন জর্ম্মানী, গ্রেট্ ব্রিটন ও ইতালী স্বায় স্বায় অধিকার বিস্তারের জন্য আফ্রিকা চীন প্রভৃতি দেশ ও মহাদেশ নিজদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইতেছিলেন, তখন কিন্তু ফরাসীরা সাম্যবাদের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া, অকুণ্ঠিত ভাবে কৃষ্ণ ও পীতকায় ব্যক্তিগণকে নিজেদের অধীন করিয়া লইতে ক্রটী করিলেন না।

সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে, বহুশক্তি একস্থলে কেন্দ্রীভূত হয়—হয়ত অনেক অনেক অরাজক উপদ্রবপরিপূর্ণ স্থানে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়—সাম্রাজ্যের মধ্যে অধিকাংশ স্থলে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। এইগুলি সাম্রাজ্যের গুণ সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একটী বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে—সাম্রাজ্য সেই বৈশিষ্ট্যকে নিষ্পেষিত করিয়া একছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া তাহাদিগকে গঠন করিতে চায়। তাহাতে বিশ্বসভ্যতার ক্ষতি ভিন্ন লাভ হয় না, ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মত।

প্রাচীন ভারতের বিশেষ গৌরবের কথা এই যে তথায় জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রাখিয়া সাম্রাজ্যস্থাপনের সাধু প্রচেষ্টা হইয়াছিল। প্রাচীন ভারত এই দুরূহ কার্য্যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহা আমরা এই প্রবন্ধে দেখিতে পাইব। তবে প্রথমেই একটী কথা স্মরণ রাখা ভাল যে ভারতবর্ষ এক প্রকাণ্ড মহাদেশ—ইহার কিয়দংশ যিনি বা যাঁহারা জয় করিতে সমর্থ হইতেছেন, তাঁহারা সম্রাট নামে অভিহিত হইতে পারেন।

ঋগ্বেদ রচনার সেই সুদূর অতীতকালে ভারতীয় ঋষিগণের নিকট সাম্রাজ্যের কথা অপরিজ্ঞাত ছিল না। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে ঋষি প্রজাপতি "দ্বিমাতা হোতা বিদথেষু সম্রালম্বগ্রং চরতি ক্ষেতি বুধঃ" (৩।৫৫।৭) এই বাক্যে সম্রাট শব্দদ্বারা অগ্নিকে উপলক্ষণ করিয়া রাজগণের অধীশ্বর বা উচ্চ শ্রেণীর সম্রাটকে বুঝাইয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে অধিরাজ, মহারাজ, একরাজ, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দগুলি যে বহু বিস্তৃত জনপদের অধীশ্বরত্বদ্যোতকই হইবে এরূপ কোন কথা নাই—তবে অনেকগুলি রাজার উপর যাঁহারা প্রভুত্ব করিতেন, তাঁহারাই যে উক্ত উপাধির অধিকারী হইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, আর সম্রাট বাজপেয় যজ্ঞ করিবেন—রাজা অপেক্ষা সম্রাট উচ্চপদস্থ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভারতের প্রাচীন সম্রাটগণের একটী তালিকা দিয়া বলা হইয়াছে যে তাঁহারা আদিত্যের ন্যায় সমৃদ্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাপ প্রদান করেন ও সকলদিক হইতে কর গ্রহণ করেন :—তে সর্ব্ব এব মহজ্জগ্মুরেতং ভক্ষং ভক্ষয়িত্বা সর্ব্বে হৈব মহারাজা অ সু' রাদিত্য ইহ স্ম শ্রিয়াং প্রতিষ্ঠিত স্তপতি সর্ব্বাভ্যো দিগ্‌ভ্যো বলিমাবহ" (সপ্তম পঞ্জিকা ৩৪)। সায়ণাচার্য্য মহারাজশব্দের ব্যাখ্যায় সার্ব্বভৌম অর্থ দিয়া বলিতেছেন "যথা আদিত্যো দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত স্তপতি, এবমেতে 'শ্রিয়াং' গজাশ্বদিকায়াং সম্পদি প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্তঃ 'তপন্তি' শত্রুণাং তপং কুর্ব্বন্তি তথা সর্ব্বাভ্যো দিগ্‌ভঃ সর্ব্বদিকবস্থিতেভ্যো রাজভ্যঃ শকাশাদ্ বলিমাবহন্তো করমাদদানাঃ স্বামিনো ভবন্তি।" কৌশতকী (৫।৫) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩।৬।৪।২১) এবং মহাভারত পুরাণাদিতেও প্রাচীনভারতের সম্রাটগণের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। "চক্রবর্ত্তী" শব্দদ্বারা মণ্ডলাধিস্থিত বহু রাজসেবিত সম্রাট্ বিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। এই শব্দটী মৈত্ররণী উপনিষদে প্রথম দেখা যায়—অথ কিমেতৈর্বা পরেন্যে মহাধনুর্ধরাশ্চক্রবর্ত্তিনঃ কেচিৎ। সুদ্যুম্ন, ভূরি দ্যুম্নেন্দ্রদ্যুম্ন কুবলয়াশ্বা যৌবনাশ্ব বধ্রশশ্বা, শ্ব পতিঃ, শশবিন্দু, হরিশ্চন্দ্রো ম্বরীষং ননক্তু সর্যাতি. যযাত্য নরন্তো, ক্ষ সেনাদয়ঃ।" উল্লিখিত পঞ্চদশজন সম্রাট চক্রবর্ত্তীর আসন লাভ করিয়াছিলেন।

এতদ্বারা প্রমাণিত হইল যে প্রাচীনভারতে, অতি সুদূর অতীত কালেও সাম্রাজ্য ছিল। এখন এই সাম্রাজ্যের গঠন প্রণালীই বা কিরূপ ছিল, কি মতবাদের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাউক।

সাম্রাজ্য লাভ করিতে হইলে বিজীগিষু রাজাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইত। এই যজ্ঞের একটী অঙ্গ ছিল এই যে একটী অশ্বকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত এবং যে কেহ পারেন, ইহা ধরুণ ইহা ঘোষণা করা হইত। যাঁহাদের রাজ্য দিয়া অশ্ব চলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও, ধরিতেন না, তাঁহারা, ও যাঁহারা ধরিয়া পরাজিত হইতেন, তাঁহারাও রাজার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। যজ্ঞ সুসম্পাদনার্থ এইরূপ একশতজন বশীভূত রাজার প্রয়োজন হইত—তাঁহারা সকলেই যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইতেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির প্রথম যুগে সম্রাটগণ বিজিত রাজাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া, তাঁহাদের রাজ্য অপহরণ করিয়া লইতেন না—কেবলমাত্র তাঁহাদের বশস্বীকারউক্তিতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টমশতাব্দীর ইংলণ্ডের

Bretwaldaউপাধিধারী রাজগণের ন্যায় তাঁহারা নিকটবর্ত্তী রাজ্যসমূহের উপর সামান্যমাত্র অধিকার রাখিতেন। এথেন্সের সাম্রাজ্য অপেক্ষাও ইহার সংগঠন (organisaton) শিথিল ছিল, কেননা এথেন্সে অধীন রাষ্ট্র হইতে রীতিমত কর আসিত ও কঠিন কঠিন বিচার রাজধানীতে সম্পন্ন হইত। মহামতি কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ল বলেন যে রাজগণ সম্রাটের অধীনে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন "sometimes the sovereigns under the Emperor formed a constitution as the one described in the Mababharata under Jarasandba when several officers on the model of the vedic High Functionaries were appointed from amongst the sorereigns under the Emperor" মহাভারতে সভাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট জরাসন্ধের সম্রাট হইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

সোঽবনীং মধ্যমাং ভুক্তা মিথো ভেদমমন্ত্রত।
প্রভুর্যস্তু পরো রাজা যস্মিন্নেক বশে জগৎ॥
স সাম্রাজ্যং মহারাজ প্রাপ্তো ভবতি যোগতঃ।
তং স রাজা জরাসন্ধং সংশ্রিত্য কিল সর্ব্বশঃ॥
রাজন্ সেনাপতির্জাতঃ শিশুপালঃ প্রতাপবান্।
তমেব চ মহারাজ শিষ্যবৎ সমুপস্থিতঃ।
বক্রঃ করূষাধিপতির্মায়াযোধী মহাবল।
অপরৌ চ মহাবীর্য্যৌ মহাত্মানৌ সমাশ্রিতৌ।
জরাসন্ধং মহাবীর্য্যং তৌ হংসডিম্ভকাবুভৌ।
বক্র দন্তঃ করূষশ্চ করভো মেঘবাহনঃ।
মূর্দ্ধ্না দিব্যমণিং বিভ্রদ্ যমদ্ভুত মণিং বিদুঃ॥ (সভা ১৪।৯)

ইহাতে দেখা যায় যে শিশুপাল, বক্র, করূষ, হংস, ডিম্বক, দন্তবক্র, করভ, মেঘবাহন প্রভৃতি নৃপতি তাঁহাদের রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও জরাসন্ধের সহিত মিলিত হইয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধনের সভার রাজকবি বাণভট্টও তাঁহার হর্ষচরিতে আমাদের যুক্তি সমর্থন করিতেছেন। তিনি বলেন যে প্রাচীনকালের নৃপতিগণ সাধারণতঃ রাজ্যাদিজয় করিয়া নিজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেন না—"নাতি জিগীষবঃ খলু পূর্ব্বে যেনাস্মিন্ এব ভূভাগে ভূয়াংশো ভগদত্ত দন্তবক্র ক্রাথকর্ণ কৌরব শিশুপাল সাম্ব জরাসন্ধ সিন্ধুরাজ প্রভৃতয়ো হ ভবন্ ভূপতয়ঃ। সন্তুষ্টো রাজা যুধিষ্ঠিরো যোঽ সহত সমীপএব ধনঞ্জয় জনিত জগৎকম্পঃ কিম্পুরুষাণাম্ রাজ্যম্"।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার।

যুগ সমস্যা

আমরা যে যুগে বাস করছি, সেই যুগ বস্তুটা যে কি, তার লক্ষণ কি, তার প্রকৃতি কি, কিসের দ্বারা এই বর্ত্তমান যুগ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ হতে বিশিষ্ট হয়েছে, এই যুগের গতি কোন্ দিকে, অনেক সময় আমরা তা ভাল করে একটুকু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করিনা। যা চলে আসছে, যা চলে যাচ্ছে, আমরা অনেক সময় মনে করি, তাই বুঝি চিরদিন চলে আসছে, তাই বুঝি চিরদিন চলে যাবে। কিন্তু একটু ধীর হয়ে আমাদের চারিদিকে যে চিন্তাস্রোত, যে ভাবনা স্রোত, যে ঘটনা স্রোত চলছে, এগুলি যদি একটু পরীক্ষা করে দেখি, তা হলে এই যুগের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আমাদের চোখে পড়ে।

এ যুগের প্রথম লক্ষণ এই যে—এ যুগ অত্যন্ত প্রত্যক্ষবাদী, ইংরেজীতে যাকে বলে Positivist। এই প্রত্যক্ষবাদ বলতে গেলে এ যুগের প্রবর্ত্তন করেছে। আপনারা জানেন ইউরোপে একটা প্রত্যক্ষবাদ দর্শন ও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমাদের প্রথম যৌবনে এই প্রত্যক্ষবাদ সম্প্রদায়ের কথা আমরা অনেক শুনেছি। তাঁদের প্রচার হ'ত; এই যে কোনপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষবাদ সেটা এই যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ। এই যুগে যা চোখে দেখি না তা বিশ্বাস করতে পারিনা, বিশ্বাস করতে চাইনা। ঈশ্বর আছেন, প্রমাণ কি? মানুষের আত্মা আছে, মরণের পর যে আত্মা থাকে প্রমাণ কি? ধর্ম্ম বলে যে একটা বস্তু আছে, ধর্ম্মের একটা সাধনা আছে, নিয়ম আছে, তা পালন করে চলতে হয়, না করলে প্রত্যবায়-ভাগী হ'তে হয়, প্রমাণ কি? মানুষ সকল বিষয়ে প্রমাণের অন্বেষণ করে। আর প্রমাণ বলতে অধিকাংশ লোক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম মনীষীরা একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করেছেন। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ এবং এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত অনুমান ও উপমান এই তিনটীকে তাঁরা একমাত্র প্রমাণ বলে মেনেছেন। যা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ করা যায়না অথবা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যা প্রত্যক্ষ করি সেই প্রত্যক্ষের উপর অনুমান দ্বারা যা প্রতিষ্ঠিত হয় না অথবা উপমান দ্বারা যা প্রতিষ্ঠিত হয় না তাকে তাঁরা সত্য বলে, প্রমাণ বলে, সে বস্তু আছে বলে স্বীকার করতেন না; এখন পর্য্যন্ত এই প্রত্যক্ষ-বাদ এ যুগের প্রধান ধর্ম্ম হয়ে রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান এই প্রত্যক্ষবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরীক্ষা করে লোক সব দেখতে চায়। প্রাচীন শাস্ত্রের প্রামাণ্য পরীক্ষা না করে লোক আর মানতে চায় না। লোকে আচার্য্যদের উপদেশ বা আদর্শ পরীক্ষা না করে মানতে চায় না। এখনকার একটা প্রধান লক্ষণ এই প্রত্যক্ষবাদ।

আর একটা লক্ষণ—স্বাধীনতা। গত দেড়শ দুশ বৎসর কাল মানুষ একটা অদ্ভুত স্বাধীনতার প্রেরণায় উন্মত্তের মত ছুটেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ যত প্রকার বাইরের অধিকার—ধর্ম্মের গুরুর হোক, আচার্য্যের হোক,—সমাজে হোক

নীতিতে হোক, যত কিছু বাইরের অধিকার, সে অধিকারকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। তাকে সত্য বলে মান্‌ব, যা আমার জ্ঞানে অনুভবে সত্য বলে ধরা পড়বে। তাকে ভাল বলে গ্রহণ করব, যা আমার ধর্ম্মবুদ্ধির নিকট ভাল বলে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। গুরুর কথায় কিছু সত্য বলে মান্‌বনা, ভাল বলে গ্রহণ করবনা। আমার ভিতরে যে বুদ্ধি আছে, বুদ্ধিবৃত্তি আছে, আমার ভিতরে যে সত্যের কষ্টিপাথর আছে, সে কষ্টিপাথরে কষে প্রাচীন শাস্ত্রকে পরীক্ষা করে দেখব, সে কষ্টিপাথরে কষে গুরুর উপদেশ, পুরাতন কিম্বদন্তীসমূহ পরীক্ষা করে দেখব, সে কষ্টিপাথরে কষে কোনটা সত্য, কোনটা সত্য নয়, এটা আমি সিদ্ধান্ত করে নেব, গুরুর কথা এখানে মানবনা। এই যে নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, এটা এই যুগের একটা অতি প্রধান লক্ষণ।

কেবল বুদ্ধি সম্বন্ধে নয়, কর্ম্ম সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই; কোনটা আমার কর্ত্তব্য, কোনটা আমার কর্ত্তব্য নয়, সেটা—আমার প্রাণের মধ্যে, আমার প্রকৃতির ভিতরে যে ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক আছে ইংরাজীতে যাকে conscience বলে, যে আমাকে বলে দেয়, কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সেই যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক—তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিচার করে চলব; আমার ধর্ম্মবুদ্ধি যাকে ধর্ম্ম বলে না, তা শতশাস্ত্রবাক্যদ্বারা সমর্থিত হলেও অথবা প্রাচীন গুরুজনের আদেশের দ্বারা সমর্থিত হলেও, আমি গ্রহণ করবনা। এই যে চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, individualism, এটা এ যুগের একটা প্রধান লক্ষণ।

এ যুগের তৃতীয় লক্ষণ যা ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে সেটা এই—এ যুগে মানুষকে সকলের চাইতে বড় করে দেখে। মানুষ আগে আর কখনও মানুষের চক্ষে এত বড় ব'লে প্রতিভাত হয় নি। এ যুগের চিন্তা ও সাধনা মানুষকে এত বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে যে, সাধারণতঃ আমরা যাকে মানুষ বলি তাকে নিয়ে আমাদের কুলোয় না; আমরা চাই এই মানুষের উপরে অতিমানুষ, manএর উপর superman। একজন নয়, আমরা চাই বহু অতিমানুষ; মানুষ কত বড় হ'তে পারে তার সন্ধান এ যুগ পেয়েছে, সকলের ভিতরে মহামিলন জেগে উঠেছে। প্রত্যক্ষবাদের অনুশীলন করতে গিয়ে মানুষ দেখতে পেয়েছে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের আড়ালে আরেকটা কিছু আছে যার সঙ্কেত ইন্দ্রিয় বহন করে আনে, যাকে ইন্দ্রিয় প্রকাশ করতে পারে না; ইন্দ্রিয়ের ভিতর অতীন্দ্রিয়ের সাড়া পেয়েছে। এই যে চক্ষু, এর ভিতর এমন একটা জিনিষের সাড়া আছে যাকে চক্ষু দেখতে পায়না; প্রিয়তমের মুখের উপর চোখ দুটো ফেলে যখন অতৃপ্তনয়নে তার মুখে কি মধু আছে, কি রস আছে নির্ণিমেষ চোখে তা পান করি তখন চোখ বলে আমার দেখা হলনা, এই যা দেখছি তার ভিতর আরো দ্রষ্টব্য আছে। কান যখন সঙ্গীত শোনে, সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে—যতই সঙ্গীত পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠে, সঙ্গীত যিনি করেন তাঁর কণ্ঠকে অবলম্বন করে রাগিণী আকাশে উঠে যায় তান লয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুরের সঙ্গে সঙ্গে, তার পরতে পরতে আমার প্রাণের ভিতরের রাগিণী আকাশে ভেসে যায় এটা যখন লক্ষ্যকরে দেখি, তখন বুঝি আমার সব শোনা হলনা, সবটা কান দিয়ে ধরতে পারলাম না, এই শব্দের ভিতরে একটা অশব্দ জাগ্রত হয়ে আমার কানকে যে অশব্দের দিকে টেনে নিয়ে যায়! সকল ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ব্যাপার যখন চিন্তা করে দেখি, ভিতরে ঢুকে দেখি, তখন

দেখতে পাই প্রত্যক্ষের অন্তরালে বিশাল অতীন্দ্রিয় জগত, অমৃতময় অনন্ত অতীন্দ্রিয় জগত, রসময় আনন্দময় অতীন্দ্রিয় জগত, আলোকময় জ্ঞানময় অতীন্দ্রিয় জগৎ রয়েছে। ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয়ের এই যে ব্যবধান, এর সেতু কোথায়? কোথায় পাই সেই সেতু যাতে ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয়ের ব্যবধান বিনষ্ট করে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা করতে পারি, অতীন্দ্রিয়ের ভিতর ইন্দ্রিয়কে নিয়ে তাকে তার চরম পরিতৃপ্তি দান করতে পারি। এই যে ব্যবধান এর ভিতর একটা মিলন পিপাসা জেগে উঠেছে। প্রত্যক্ষবাদের ভিতর যা দেখা যায় না তাকে দেখবার জন্য একটা পিপাসা জেগেছে। ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে মিলন করবার একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। এই প্রত্যক্ষবাদের ভিতর দিয়ে যখন আমরা জীবতত্ত্ব অনুশীলন করি, biological laboratoryতে যখন জীবকোষাণু পরীক্ষা করি, তখন সেখানে জীবন আর যা জীবন নয়, জড় আর চেতন এর মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান আছে সেই ব্যবধান নষ্ট করবার প্রবল চেষ্টা জেগে উঠে। আমাদের বন্ধু জগদীশচন্দ্র এই চেষ্টা করছেন। যাদের জীবিত বলি, আর যাদের জীবিত নয় বলি, চেতন অচেতন, জড় আর জীবনের মধ্যে বহু যুগ যুগান্তর ধরে যে বিশাল ব্যবধান ছিল তিনি সেটা নষ্ট করবার চেষ্টা করছেন। চোখে দেখে যাকে জীবিত বলি তার যে সমুদয় লক্ষণ আছে, যাকে অচেতন বলি তার ভিতরেও সে সমুদয় লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। আপনারা জানেন তিনি এমন সব যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যাতে যা চোখে দেখা যায়না—যেমন জীবন ক্রিয়া—সেটাও যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে আরম্ভ করেছেন। এই যে মিলনের চেষ্টা, ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে সেতু নির্ম্মাণের চেষ্টা, এটাও এ যুগের একটা প্রধান লক্ষণ।

যেমন ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে সেতু নির্ম্মাণের চেষ্টা হচ্ছে, মিলনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে, তেমনি স্বাধীনতার সঙ্গে বশ্যতার সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। এই যে মানুষ স্বাধীন হতে চাচ্ছে, সকলকে বাদ দিয়ে নিজে যা সত্য বলে মনে করি তাই সত্য, আমার যে কষ্টি-পাথর তাই সত্য, যারা শ্রেষ্ঠ তাদেরও এই ভাবে অগ্রাহ্য করছি, এই যে ব্যবধান, প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই যে ব্যবধান, যা স্বাধীনতার প্রেরণায় জেগে উঠেছে, এই ব্যবধান নষ্ট করবার জন্য মানুষ চেষ্টা করছে, মানুষের মন এই ব্যবধান আর সহ্য করতে পারছে না। সত্য অন্বেষণ করতে গিয়ে সে বলছে আমিই কি কেবল সত্য দেখছি? দুনিয়ায় আর কেউ কি সত্য দেখছে না, যদি তারা দেখে থাকে তবে তাদের সঙ্গে মিলন করতে হবে, আধুনিক কালেই কি কেবল সত্য প্রকাশিত হচ্ছে? প্রাচীনকালে কি হয় নি? যদি হয়ে থাকে তবে প্রাচীনকালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আধুনিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় করতে হবে, উভয়ের দ্বারা উভয়কে পরীক্ষা করতে হবে। কেবল আমার ব্যক্তিগত যে জ্ঞান তাই সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নয়। আর দশ জনের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার মিলন করে কোন্ জায়গায় আমার ভুল, সেটা বুঝে সে ভুল শোধরাতে হবে। এই যে মিলনের চেষ্টা, স্বাধীনতার সঙ্গে সমষ্টিগত বশ্যতার মিলনের চেষ্টা, এটা এ যুগের একটা প্রধান লক্ষণ।

তারপর, যেমন মানবতা আর অতিমানবতা, তেমনি মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যেও যে একটা ব্যবধান বহুদিন ছিল, সে ব্যবধানকে নষ্ট করে মহামিলন করতে হবে, এটাও এ যুগের সমস্যা।

এ ত দেখলাম ভাবের দিক দিয়ে। কিন্তু কর্ম্মের দিক দিয়ে, সমাজের দিক দিয়ে, ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ যুগের আর একটা লক্ষণ আছে, তাকে জাতীয়তা বলতে পারা যায়, ইংরাজিতে যাকে nationalism বলে। আপনারা জানেন Lord Morley পরলোক গমনের কিছু কাল পূর্ব্বে একটা কথা বলেছেন। তাঁর শেষ গ্রন্থখানিতে বলেছেন গত শতাব্দীতে ইউরোপের last word nationalism। এই যে জাতীয়তা —ইউরোপের ইতিহাসে কেন, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে—আজ পর্য্যন্ত শেষ কথা, অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি বা nation—জাতি কথাটাতে ঠিক nation বুঝায় না, আমরা জোর করে অনুবাদ করছি, জাতি বলতে গোজাতি, মনুষ্যজাতি ইত্যাদি বুঝায়, কিন্তু nation বলে যে বস্তু, সমাজ বল্লে তা কতকটা বুঝায়।—এই যে জাতীয়তা এটা আধুনিক ইতিহাসের প্রধান কথা। এর ফলে প্রত্যেক জাতি স্বপ্রতিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে, প্রত্যেক জাতি আপনার অভ্যুদয় বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করছে, প্রত্যেক জাতি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করছে। যারা পরাধীন ছিল গত একশত বৎসরের মধ্যে তাদের অনেকে স্বাধীন হয়েছে, যারা পররাষ্ট্রের অধীন না হয়ে স্বদেশের কোন রাজা বা সম্প্রদায়বিশেষের অধীন ছিল তারা সে অধীনতা নষ্ট করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, এই যে nationalism বা জাতীয়তা এটা এ যুগের বিশেষ লক্ষণ। প্রত্যেক জাতি স্বপ্রতিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে; তাতে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ করছে, কে কাকে খাট করে নিজে বড় হবে, কে কার অভ্যুদয় নষ্ট করে নিজের অভ্যুদয় বাড়িয়ে তুলবে, সর্ব্বদা তার চেষ্টা চলছে এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এর ফলে সংসারময়, বর্ত্তমান সভ্যজগতময় একটা সমর কোলাহল জেগে উঠেছে, কিছুদিন পূর্ব্বে এই আগুণ দপ করে জ্বলে উঠেছিল, এখন একটু নিভেছে বটে কিন্তু জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষের মূল এখনও রয়েছে এই যে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তি এই প্রবৃত্তি এখনো রয়েছে। সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি যে একত্র মিলিত হবে তার সম্ভাবনা এখনো জাগে নি কিন্তু সম্ভাবনা না জাগলেও মানুষের মন এই মিলনের জন্য পিপাসিত হয়েছে। সকল দেশে লড়াই যাঁরা করছে, তাঁরা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এখন শান্তি অন্বেষণ করছে। জার্ম্মাণ, ইংরেজ, ফরাসী, ইটালীয় সকলেই ভিতরে ভিতরে শান্তির অন্বেষণ করছে; কিন্তু আপনার কর্ম্মের জালে আবদ্ধ হয়ে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারছেনা অথচ জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জাতিতে জাতিতে যে বিরোধ জেগেছে তাকে নষ্ট করে মিলনের আকাঙ্ক্ষা দুনিয়াময় জেগেছে। সুতরাং একটু তলিয়ে দেখলে দেখতে পাই এই যুগের সমস্যা মহামিলন সমস্যা। মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ দূর করে মহামিলন কি করে হবে, এটা এ যুগের প্রধান প্রশ্ন। এই যে ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয়ে বিরোধ, এই বিরোধ নষ্ট করে দুইএর মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা কি করে হবে এটা এযুগের প্রধান সমস্যা। স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমাজ শাসনের যে বিরোধ চলছে এ বিরোধ নষ্ট ক'রে ক'রে এর ভিতর সমন্বয় কি ক'রে হবে বর্ত্তমান যুগের এটা একটা প্রধান সমস্যা।

এইরূপে আমরা দেখতে পাই বর্ত্তমান যুগসমস্যা মহামিলন সমস্যা। দেবতাতে আর মানুষে মিলনের জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষিত, মানুষে মানুষে মিলনের জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষিত

ধর্ম্মে ধর্ম্মে মিলনের জন্য, সত্যে সত্যে সমন্বয়ের জন্য, আমরা আকাঙ্ক্ষিত। কি করে এই সমন্বয় হবে, কি করে এই মহামিলন সাধন দ্বারা আমরা শুদ্ধি লাভ করব, এই-ই বর্ত্তমান যুগের মুখ্য সমস্যা। এই সমস্যা নানা আকারে, নানা ভাবে, নানা ক্ষেত্রে—আপনাকে ফুটিয়ে তুলছে। বিজ্ঞানে এই সমস্যা, দর্শনে এই সমস্যা, ধর্ম্মে এই সমস্যা, সমাজে এই সমস্যা, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে এই সমস্যা, কি করে এর মীমাংসা হবে এটা দুনিয়াময় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম প্রশ্ন।

ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব উপলক্ষে এ কথা তোলা প্রয়োজনীয়, সমীচীন ও সঙ্গত। সঙ্গত বলছি এই জন্য, ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম যখন উঠে, এই সংকল্প নিয়ে উঠেছিল যে, এই বিরোধের ভিতর মিলন প্রতিষ্ঠা করবে। রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ভিতর একটা মিলন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্ম সভা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। মহর্ষিও একটা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস এই মহামিলনসমস্যার ইতিহাসের নামান্তর মাত্র, কেশবচন্দ্রও সর্ব্বধর্ম্মের মিলনের চেষ্টা করেছেন। আর আজ ব্রাহ্ম যুবকেরা মাঘোৎসবের বার্ষিক উৎসব করছেন। তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করছি, হে স্বাধীনতার সাধকবৃন্দ, আপনারা কি এই মিলন ভূমিতে দাঁড়িয়ে এই মহামিলনের আদর্শ চোখে দেখেছেন, যেখানে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ নাই, জাতিতে জাতিতে বিরোধ নাই, ইন্দ্রিয়ে অতীন্দ্রিয়ে বিরোধ নাই, মানুষে দেবতায় বিরোধ নাই, ব্যক্তি আর সমাজে বিরোধ নাই, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধ নাই, এই মহামিলনের ক্ষেত্রের ছবি আপনাদের চিত্ত পটে প্রতিফলিত হয়েছে কি? যদি প্রতিফলিত হয়ে থাকে, ব্রাহ্ম সমাজকে সফল করতে পারবেন। ব্রাহ্ম সমাজ যে সংকল্প নিয়ে জন্মেছিল সে সংকল্প সিদ্ধির দিকে তাকে এগিয়ে দিতে পারবেন।

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ এক সময়ে খুব জেগে উঠেছিল, খুব প্রখর হয়েছিল। আমরা তখন বালক ছিলাম যখন সমাজ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন করত। সমাজের সে শক্তি নষ্ট হয়েছে, হিন্দু সমাজেরও গেছে, অন্য সমাজেরও গেছে। সুতরাং সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে কেহ এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও সমাজিক শাসন গোঁজামিল দিয়ে চলেছেন, সত্য সমন্বয় এখনো কেহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই এই সমন্বয় প্রতিষ্ঠা না হলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকবেনা। ব্যক্তিকে বাহিরের থেকে সমাজের শাসন মেনে চলতে হবে এমন কথা আমি বৃদ্ধ বয়সে বলিনা, ব্যক্তিকে সমাজের বাহিরের শাসন দণ্ড মাথাপেতে নিতে হবে একথা বলিনা, কিন্তু ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে একত্র হতে হবে একথা আমি শত মুখে বলি। সমাজ আমার থেকে পৃথক নয় যেমন মায়ের গর্ভে ভ্রূণ ছিলাম, তেমনি সমাজ গর্ভে বাস করছি একথা কি সত্যি নয়? মায়ের শোণিত থেকে শিশু গর্ভস্থ প্রাণে আপনার জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে, মায়ের শোণিত তার ভিতরে প্রবাহিত হয়ে জীবনকে রক্ষা করে থাকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ফুটিয়ে তোলে, তেমনি আমাদের প্রত্যেকের জীবন কি সমাজের মধ্যে নয়? এই যে সমাজরূপ মাতা তার শোণিত দ্বারা, তার রক্ত দ্বারা, তার প্রাণ দ্বারা আমাদের জীবনীশক্তি রক্ষা করছে ও ফুটিয়ে তুলছে একথা কি

সত্য নয়? এই যে বাংলা ভাষায় কথা বলছি, কে আমায় ভাষা দিল? এই ভাষা আমার সমাজের ভাষা। যে সমুদয় উপমা ব্যবহার করছি, কোথায় পেলাম উপমা। এ ত আমার কল্পনা নয়, সৃষ্টি নয়; আমার সমাজের লোকেরা, সমাজের জ্ঞানীরা ঋষিরা যে সাধনা করে গেছেন, তাঁদের সাধনলব্ধ শক্তি এই ভাষার ভিতরে সঞ্চারিত হয়ে আমার চিন্তাকে প্রসারিত করছে, রসনাকে বাগ্মী করে তুলছে, এ বন্ধন ছিন্ন হলে জ্ঞান পঙ্গু হবে, ভাব শুষ্ক হয়ে যাবে। যদি সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, তবে আমার জ্ঞান বিজ্ঞান সব নিষ্ফল হয়ে যাবে, সমাজের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, সে এত খেলো নয়, সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ত বাহিরের নয়; সমাজ অঙ্গীস্বরূপ আমি সমাজের অঙ্গস্বরূপ, এই যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ইংরেজীতে যাকে Organic relation বলে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এই যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, এটা যখন অনুভব করি তখন বুঝি, সমাজজীবন আমার জীবনের বৃহত্তর জীবন। তখন দেখি, সমাজের শক্তি আমার শক্তির বৃহত্তর শক্তি, আমার শক্তির আধার এবং অবলম্বন, সমাজজীবন আমার ব্যক্তিগত জীবনের আশ্রয় এবং অবলম্বন, এর সঙ্গে সম্বন্ধ ত যাবার নয় সুতরাং এই সমাজকে অগ্রাহ্য করতে পারিনা, কিন্তু আবার বলি সমাজকে সব সময় গ্রাহ্যও করতে পারিনা। সমাজ যদি আমার ধর্ম্মবুদ্ধিতে আঘাত দেয়, জ্ঞানের উপর আঘাত দেয়, উপর হতে শাসন করতে আসে, তবে সমাজ শাসন মেনে চলা আমার পক্ষে সম্ভব হবেনা, সুতরাং এর একটা সমাধান বা সমন্বয় করতে হবে; সমাজকে সমন্বয়ের দিকে যেতে হবে, আমাকেও সমন্বয়ের দিকে যেতে হবে, কি করে যাব?

আমার যে স্বাধীনতা, অনেক সময় যদি পরীক্ষা করে দেখি তবে দেখি, সে স্বাধীনতা আর কিছু না—আমার ভোগবিলাস, আমার ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির প্রেরণাকে স্বাধীনতা নাম দিয়ে অনেক সময় বাড়িয়ে তুলি, এই যে আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, এর পিছনে কতটা আমার ইন্দ্রিয়ের প্রেরণা আর কতটা আমার সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব বা মনুষ্যত্বের প্রেরণা, পরখ করে দেখতে হবে। সুতরাং বিকৃত স্বাধীনতাকে সব বিষয়ে সম্পূর্ণ সংযত করে কোনটা ধর্ম্ম কোনটা অধর্ম্ম বিচার করে চলতে হবে; কেননা অনেক সময় আমরা স্বাধীনতা ও ইন্দ্রিয় প্রেরণাতে প্রভেদ বুঝতে পারিনা, এইজন্য ইন্দ্রিয় প্রেরণাকে আত্মার প্রেরণা, বিবেকের প্রেরণা বলে গ্রহণ করি। এ পথে স্বাধীনতা লাভ হবে না। এ ভাবে সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হবেনা। সুতরাং হে যুবক তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি আপনাকে সংযত করে ব্রহ্মজ্ঞান ও সত্যধর্ম্ম সাধন করে ইন্দ্রিয়গ্রামকে আপনার বশে আনবে। যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম তোমার বশে আসবে তখন তুমি আপনি শুদ্ধ হবে, তখন তোমার স্বাধীনতার নিকট সমাজকে মাথা নত করতে হবে। তুমি যদি বিশুদ্ধ হও, নির্ম্মল হও, তুমি যদি আপনার ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত কর, তোমার ভিতর সমাজ যদি দেখে তুমি যে সমাজবিধি ভাঙ্গছ সেই ভাঙ্গার পিছনে তোমার অসংযত ইন্দ্রিয়লালসা নাই কিন্তু জলন্ত ধর্ম্মবুদ্ধি রয়েছে, হয়ত সমাজ তোমার কর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে পারে, বাইরে তোমাকে অপাংক্তেয় করতে পারে কিন্তু ভিতরে, তোমার ধর্ম্মকে, তোমার চরিত্রকে, তোমার বিশুদ্ধতাকে সাষ্টাঙ্গে

প্রণিপাত করবে—একথা কল্পনার কথা নয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনেরা যখন সমাজবিধি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তাঁরা ইন্দ্রিয় প্রেরণায় ভাঙ্গেন নাই, তাঁরা অসংযত ইন্দ্রিয় প্রেরণার লোভে সমাজ বিধি ভাঙ্গেন নাই, তাঁরা যখন সমাজ বিধি ভেঙ্গে আত্মীয় স্বজন ছেড়ে এসেছেন তখন ইন্দ্রিয় প্রেরণায় আসেন নি। তাঁরা এসেছেন—সমাজ তাঁদের বর্জ্জন করেছে, তাঁরা এমন কর্ম্ম করেছেন সমাজ বর্জ্জন করতে বাধ্য হয়েছে, সেটা লাভের জন্য করেন নি, কিন্তু বিশুদ্ধ চরিত্র থেকে নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় তা করেছেন। সুতরাং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার অধিকার লাভ করতে হলে সে অধিকার সংযম ব্যতীত হয় না। যেখানে সংযম নাই সেখানে স্ব নাই, যেখানে স্ব নাই সেখানে স্বাধীনতা নাই ইন্দ্রিয়াধীনতা আছে; লোভের অধীনতা আছে স্বাধীনতা নাই কেননা সংযমের উপরই মানুষের স্ব বস্তু, আত্মবস্তু প্রকাশিত হয়। আত্মবস্তু প্রকাশিত যখন হয়, তার অধীনতাকে সত্য স্বাধীনতা বলে, এরূপ ভাবে যুবকেরা যদি স্বাধীনতার সাধনা করেন তাহলে সমাজের সঙ্গে একত্ব সাধন তাঁদের পক্ষে সহজ হবে।

সমাজকে কি করতে হবে? যুবককে যা করতে হবে সমাজকেও তাই করতে হবে। ভগবানকে সাধক যেমন শ্রদ্ধা করেন তেমনি প্রত্যেক বালক, প্রত্যেক বালিকা প্রত্যেক শিশুর প্রত্যেক নরনারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজ ভক্তি শ্রদ্ধা করবে। সমাজ কারো স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবেনা। হে সমাজ যদি তোমরা অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে চাও—তবে ব্যক্তি যেমন তোমার সঙ্গে একত্ব সাধন করতে চেষ্টা করবে তেমনি হে সমাজ তোমাকে ব্যক্তির সঙ্গে একত্ব সাধন করতে চেষ্টা করতে হবে। যে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে তার সঙ্গেও একত্ব সাধন করতে হবে। যিশুখৃষ্ট যেমন জগতের পাপভার আপনার মস্তকে গ্রহণ করে জগৎকে পাপহীন করবার জন্য এসেছিলেন তেমনি হে সমাজ প্রত্যেক দুর্ব্বৃত্ত তোমার সমষ্টিগত শক্তির অন্তর্গত, সে তোমার প্রাণের ভিতর জেগে আছে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে, দ্বন্দ্ব করলে চলবেনা কেননা ব্যক্তি যেমন সমাজের পাপের অংশ ভাগী, সুতরাং ব্যক্তি যেমন আপনাকে সংযত করবে, করে সমাজে বাস করবে, তেমনি সমাজকে সংযত হয়ে চলতে হবে। সমাজের অধিকার বাড়ে কোথায়? ব্যক্তির স্বাধীনতার শেষ যেখানে। এখানে তাকে বাড়তে দিতে হবে। এর উপর অধিকার চালালে চলবেনা, অর্থাৎ সমাজকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব মেনে চলতে হবে, বৃদ্ধকে যুবক হতে হবে, হয়ে যৌবন সাধন করতে হবে। যৌবনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধ জানেন, কত ধানে কত চাল হয়, বৃদ্ধেরা যেমন জানেন যুবকেরা তেমন জানেন না বৃদ্ধেরা ঘর পোড়া গরু সুতরাং তাঁদের সিন্দুরে মেঘ দেখলে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক বটে কিন্তু ভয় পেলে চলবেনা, মনে করতে হবে আপনার যৌবনকে ধ্যান করতে হবে আপনার যৌবনকে এবং ধ্যান করে যুবক যারা তাদের সঙ্গে একত্ব সাধন করতে হবে, তারা যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, সহিষ্ণুতার সঙ্গে সে উচ্ছৃঙ্খলতা সয়ে যেতে হবে নইলে এর মীমাংসা হবেনা। একপ্রাণতা দ্বারা, আত্মবিলোপের দ্বারা যেমন বিরোধের মীমাংসা হয়, আর কিছু দ্বারা তেমন হয় না। সুতরাং

যুবককে সমাজের প্রতি ভক্তিমান হতে হবে, সমাজকেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ধর্ম্মের আসনে বসিয়ে সে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।

কেবল সমাজের কথা কেন, এই যে স্বাধীনতার উপর হাত দেওয়া, এর মত পাপ আর কিছু আছে বলে কল্পনা করতে পারিনা। অন্য যে পাপ সেটা ইন্দ্রিয়ের তাড়ায় হয়, লোভে পাপ হয়, সাংসারিক বিষয় থেকে হয়, কিন্তু এই যে অপরের স্বাধীনতার উপর হাত দেওয়া, এখানে স্বাভাবিক লোভ নাই, ইন্দ্রিয়ের তাড়া নাই। এটা অস্বাভাবিক জিনিষ, এটা সব চাইতে বড় পাপ, এ পাপ সব চাইতে হীন। এই যে বিধান এটা কর, ওটা করনা এ কথাকে আমি বড় ভয় করি। আমি কাকেও একথা বলতে চাইনা এটা কর ওটা কোরোনা, পুত্রকে বলতে পারি এটা কর, না করলে এই ফল হবে। বিচারের ভার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের ভার শেষ মীমাংসার ভার তার উপর যদি ছেড়ে না দিই তবে তারা কখনও মানুষ হবেনা; যদি ছেলেকে কেবল কোলে করে চালাই তবে তার পায়ের শক্তি হবেনা সে হাঁটতে পারবেনা; যারা বালক বালিকা তাদের যদি কেবল বিধান দ্বারা চালাই এ পথে যেয়োনা ও পথে যেয়োনা এরূপ বিধি নিষেধের বন্ধনে যদি তাদের চালাই তবে তারা আত্মস্থ হবেনা, আপনার উপর দাঁড়াতে শিখবেনা। সুতরাং এই যে বিধি, একে অত্যন্ত ভয় করি। হয়ত পুত্রকে কখনো সংস্কার বশতঃ বলতে পারি, কিন্তু সজ্ঞানে বলিনা এটা করোনা ওটা কর। কেন না বলা মুস্কিল। বৃদ্ধেরা একবার ভেবে দেখুন। পুত্রকে আদেশ করলেন তুমি এটা কর, পুত্রের মনে সেটা লাগলনা। তার মনঃপূত কথা হলনা, তার মনে হল এটা না করাই ভাল; তখন যদি সেটা করে পিতার প্রতি ভক্তি রইল বটে, কিন্তু আপনার কাছে আপনি দায়ী থাকতে পারলনা। পিতার আদেশ অগ্রাহ্য করলে নিজের কাছে দায়ী রইল বটে, কিন্তু পিতার প্রতি যে ভক্তি শ্রদ্ধা সে বিষয়ে অপরাধী হল। সুতরাং পিতা একবার ভাবুন পুত্রকে যদি বিধি নিষেধ দেন তাতে তার কত অনিষ্ট করেন। মনঃপূত না হলে নিজের কাছে ঋণী রইলনা, নিজের কাছে ঋণী থাকতে গিয়া যদি কথা না রাখ তবে পিতার অবজ্ঞা করা হল, পিতৃ ভক্তির ব্যাঘাত হল সুতরাং এ ক্ষেত্রে কি ধান না দেওয়াই ভাল, কিছু না বলাই ভাল, তাকে তার স্বাধীনতাতে প্রতিষ্ঠিত রাখাই ভাল, যেমন পিতা পুত্রের সম্বন্ধ, তেমনি থাকে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ। ব্যক্তি আর সমাজের সেই সম্বন্ধ, সকল সম্বন্ধে একথা খাটে; মানুষকে স্বাধীন রাখ, তার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করোনা।

শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল

মাঘোৎসবে ছাত্রসমাজের উৎসবসভায় বিবৃত।

গুজরাত বিদ্যাপীঠ

(১)

অসহযোগ আন্দোলনের পরে ভারতবর্ষে অনেক জাতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তাহাদের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, যে দুই একটি এখনও আছে তাহা প্রকৃতপক্ষে না থাকার মধ্যেই। কিন্তু আমেদাবাদ গুজরাত বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না; ইহা এখনও সমানভাবেই সগর্বে মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইতিমধ্যেই গুজরাত বিদ্যাপীঠ ভারতবর্ষের মধ্যে কিছু প্রতিপত্তিও লাভ করিয়াছে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি গুজরাত বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন, অন্ততঃ ইহার নামের সহিত আজ ভারতে অনেকেই পরিচিত।

১৯২০ সালে নভেম্বর মাসে আমেদাবাদে এই বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাপন করেন। বোম্বে, বরোদা, ভাওনগর, আমেদাবাদ, পুনা প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে ছাত্রগণ তাহাদের কলেজ ত্যাগ করিয়া আমেদাবাদ আসিয়া সমবেত হয়। যাঁহার আজ্ঞায় তাহারা তাহাদের কলেজ ছাড়িয়া আসিয়াছে, তিনি তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এই বিশ্বাস লইয়া তাহারা আমেদাবাদে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ তাহাদের জন্যই এক কলেজ স্থাপিত হয়, সেই কলেজের নাম গুজরাত মহাবিদ্যালয়। ইতিমধ্যে গুজরাতে অনেক স্কুল গভর্ণমেন্টের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাতলে আসিয়া মিলিত হয়। এই সব স্কুলের শিক্ষা পরিদর্শন, পরীক্ষা ইত্যাদির সুব্যবস্থা করিবার জন্য এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই গুজরাত বিদ্যাপীঠ। গুজরাত মহাবিদ্যালয়ও এই বিদ্যাপীঠের অন্তর্ভুক্ত।

এই বিদ্যাপীঠের প্রথম Chancellor মনোনীত হন মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী স্বয়ং। আজও তিনিই এই বিদ্যাপীঠের চান্সেলর। আর Vice Chancellor মনোনীত হন শ্রীযুক্ত অসুদামল টেকচাঁদ গিডওয়ানি। তিনি Principal A. T. Gidvani এই নামেই প্রসিদ্ধ। আজ তাঁহার বয়স প্রায় ৩২ বৎসর। এই অল্প বয়সেই তিনি দেশে বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি অক্সফোর্ড হইতে M. A. পাশ করিয়া আসিয়া কিছুদিন এলাহাবাদে গভর্ণমেন্ট কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। তখন তিনি ছিলেন এক বড় সাহেব অর্থাৎ I. E. S. বিভাগে তখন তিনি কাজ করিতেন। পরে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়া বিকানীরে যান। সেখানে ৩।৪ মাস কাজ করিবার পর মহারাজার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হয়। মহারাজা এমন এক ব্যবহার করেন যাহাতে তিনি অপমানিত বোধ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মহারাজার কার্য্য পরিত্যাগ করেন। মহারাজা কখনই ভাবেন না যে গিডওয়ানি এত সহজেই এক মুহূর্ত্তেই এই কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন, তিনি তাঁহার পরিত্যাগ পত্র হাতে করিয়া পড়িতে পড়িতে বলিয়াছিলেন "হাঁ, এখানকার কাজ আপনার উপযুক্ত নয়, আপনার উপযুক্ত স্থান কলেজ।" গিডওয়ানি দিল্লী

আসিয়া রামযশ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন। যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন তিনি এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং মহাত্মা গান্ধি তাঁহাকে দিল্লী হইতে আমেদাবাদে লইয়া আসেন ও মহাবিদ্যালয়ের আচার্য্য (অর্থাৎ প্রিন্সিপ্যাল) নিযুক্ত করেন। প্রিন্সিপ্যাল হওয়ার পর তিনি বিদ্যাপীঠের Vice Chancellor মনোনীত হন; এবং বিদ্যাপীঠের Vice Chancellor স্বরূপে তাঁহাকে ভারতের অনেক স্থানে যাইতে হয়। এই সম্পর্কে তিনি বিদ্যাপীঠের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা করিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পর লালা লাজপত রায় লিখিয়াছিলেন,"এবার কংগ্রেসে অনেক সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা শুনিলাম—কিন্তু গিডওয়ানির বক্তৃতাই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বলিয়া মনে হইল।"

অনেকে হয়ত মনে করিবেন আমি অনুষ্ঠানের (Institution) কথা বলিতে বসিয়া ব্যক্তি বিশেষের (person) কথা কেন বলিতেছি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এই দুইটি জিনিষকে পৃথক করা অতি কঠিন; ইট পাথরে বা আইন কানুনে কোন কলেজ তৈয়ারী হয় না। কলেজকে ভাল ভাবে জানিতে হইলে কলেজের ভিতরে যিনি বসিয়া আছেন তাঁহাকেই আগে জানা দরকার। কলেজের ফটোগ্রাফে কেবল মাত্র ইটপাথরগুলি দেখিতে পারি এবং তাহার আইন কানুনে এক আড়ম্বরের ভাব বুঝিতে পারি, কিন্তু কলেজকে ঠিক ভাবে দেখিতে হইলে এই বাহিরের জাঁকজমক এবং ডাকহাক লক্ষ্য না করিয়া, লক্ষ্য করিতে হইবে তাহার ভিতরের অন্তরটী; সে বস্তুট কি এবং কি রকম, তাহাই আমাদিগকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবের মূল্য কি তাহা তখন ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিব। গুজরাত বিদ্যাপীঠ কেন, প্রত্যেক অনুষ্ঠানই তাহার কর্ম্মীদের সহিত এক আন্তরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ, এ সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গেলে অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণভাবে দেখা হয় না; গুজরাত বিদ্যাপীঠের কথা জানিতে হইলে তাহার কর্ম্মীদের কথা জানা অত্যন্ত আবশ্যক। তাঁহারাই বিদ্যাপীঠকে গড়িয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা যেমন, বিদ্যাপীঠও তেমন হইবে। তবে তাহার প্রতিষ্ঠাতার কথা এখানে কিছুই বলিতেছিনা, কারণ মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র; তাই তাহার Vice Chancellor ও প্রিন্সিপালের কথা এখানে কিছু বলিতেছি।

শ্রীযুক্ত গিডওয়ানি আজ জেলে। কেমন করিয়া তাঁহার জেল হইল এখন তাহাই বলিব। গত বৎসরে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনের পর গিডওয়ানি ও জহরলাল নেহরু নাভা রাজ্যের অন্তর্গত জয়টুতে গমন করেন। সেখানে আকালী শিখদের উপর কিরকম অত্যাচার হইতেছে ও তাহারা কি প্রকার কাজ করিতেছে তাহাই স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তাঁহারা সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহারা এক আকালী জাঠার অনুগমন করিতেছিলেন। তাঁহারা যখন নাভা রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন আকালীদের সহিত তাঁহাদিগকে বন্দী করা হয়। বিচারে তাঁহাদের প্রত্যেকের আড়াই বৎসর জেল হয়; কিন্তু নাভা রাজ্যের সবই আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁহাদিগকে জেলে পুরা হইল—কিন্তু পরক্ষণেই মুক্ত করিয়া দিয়া বলা হইল "তোমরা আজ বাড়ী যাও; আবার যদি কখনও নাভারাজ্যে প্রবেশ কর, তবে তখন এই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এখন শাস্তি মুলতবি রহিল"। তাঁহারা বলিলেন "এখন আমাদের

নাভারাজ্যে বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই তবে যখন প্রয়োজন হইবে তখন নিশ্চয়ই আবার আসিব"। কয়েক দিন পরেই সেই প্রয়োজন আসিল এবং গিডওয়ানি সাহেবকে পুনরায় নাভায় প্রত্যাগমন করিতে হইল। যখন পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট আকালীদের শিরোমনি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটিকে এক বিপ্লববাদী অতএব বেআইনী সভা বলিয়া ঘোষণা করিলেন তখন তাহাদের মধ্যে এক হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাহাদের প্রাণে যেন নূতন বল আসিল। প্রবন্ধক কমিটির সভ্যের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল, তাহারা প্রকাশ্যে এই তথাকথিত বিপ্লববাদী সমিতির সভায় যোগদান করিল, এবং সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে বড় বড় মিছিল বাহির করিয়া তাহাদের গুরু গম্ভীর "সত্ শ্রী আকাল" "সত্ শ্রী আকাল" ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। আকালী শিখেরা অধিকাংশই যুদ্ধপ্রত্যাগত সৈন্য, তাহারা যখন সামরিক পদ্ধতি অনুসারে ধীরপদবিক্ষেপে মার্চ করিয়া ব্যাণ্ডের তালে তালে গান করিয়া সহর পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, তখন গভর্ণমেণ্ট বুঝিলেন যে ইহাদিগকে দমন করা তত সহজ হইবে না, যাহা হউক গভর্ণমেণ্ট এক এক করিয়া তাহাদের নেতাদিগকে বন্দী করিতে লাগিলেন এবং কমিটিকে ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিখেরা সামরিক জাতি; তাহারা diciplined organisationএর মূল্য বোঝে,তাহারাও তাহাদের কমিটির পক্ষ হইতে অনেক আয়োজন করিতে লাগিল। তাহারা এক Information Bureau স্থাপিত করিল; সেখান হইতে সকল সংবাদপত্রে সঠিক সংবাদ দেওয়া হইবে; আকালীরা কি করিতেছে, কেন করিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কে ধৃত হইতেছে, কে হত বা আহত হইতেছে—সমস্ত সংবাদ এখান হইতে সর্ব্বত্র প্রেরণ করা হইবে। এই কাজের জন্য একজন উপযুক্ত লোকের অত্যন্ত আবশ্যক। শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরু গিডওয়ানি সাহেবকে তার করেন—"আপনি শীঘ্র অমৃতসর যাইয়া এই কাজে তাহাদিগকে সাহায্য করুন"। পরে, প্রবন্ধক কমিটিও তাঁহাকে অমৃতসর আনিবার জন্য আমদাবাদে লোক প্রেরণ করেন। প্রবন্ধক কমিটির অনুরোধে গুজরাট প্রান্তিকসমিতি (Guzrat Provincial Congress Commitee) গিড়ওয়ানি সাহেবকে কয়েক মাসের জন্য অমৃতসর যাইতে অনুমতি দেন। কথা ছিল তিনি শিখদের Information Bureau ঠিক ভাবে দাঁড় করাইয়া দিয়া আবার কলেজে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু সে কথা রহিলনা, তাঁহার আর এখন ফিরা হইল না। জয়টু হত্যাকাণ্ডের পর তিনি এবং ডাক্তার কিচলু যখন হত ও আহতদিগকে দেখিবার জন্য সেখানে যান তখন নাভা সরকারের আদেশে তাহাদের দুই জনকেই বন্দী করা হয়। বিচারে ডাক্তার কিচলুর মুক্তি হইল; কিন্তু গিডওয়ানি সাহেব আবার নাভা রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে সেই পূর্ব্বকার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে বলা হইল। অতএব তিনি এখন জেলে। তাহার স্ত্রী তাঁহাকে জেলে দেখিতে গিয়াছেন। তখন নাভা সরকার আদেশ করিলেন যে তাঁহাদিগকে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলিতে হইবে, অবশ্য দুইজনেই তাহাতে অস্বীকার করিলেন; তাঁহাদের মাতৃভাষা সিন্ধি ব্যতীত বিদেশী ভাষায় তাঁহারা বাক্যালাপ করিতে রাজী নহেন। শ্রীমতী গিডওয়ানি তাঁহার স্বামীকে দেখিয়া চলিয়া আসিলেন, তাঁহারা পরস্পর কোন বাক্যালাপ করিলেন না।

আজ প্রায় এক বৎসর গিডওয়ানি সাহেব To-Morrow নামে এক মাসিক পত্র চালাইতেছিলেন, তিনিই তাহার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সেই কাগজটী বন্ধ হইয়া গিয়াছে, নতুবা বিদ্যাপীঠ ও মহাবিদ্যালয়ের কাজ যেমন চলিতেছিল এখনও তেমনি চলিতেছে। সমস্ত ভার এখন যাঁহার উপর পড়িয়াছে, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত জিবত্রাম কৃপালানি। ইনিও সিন্ধি। ইনি সত্যাগ্রহাশ্রমে থাকেন এবং সেখানে Distinguished Vagabond বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত। তাঁহার বয়স প্রায় ৩৬ কি ৩৭, এখনও বিবাহ করেন নাই,—ছাত্রাবস্থায় তাঁহাকে অনেক কলেজ দেখিতে হইয়াছে; তিনি তখন যেমন ছিলেন এখনও ঠিক তেমনি আছেন, আগুনের হল্কার মত তেজস্বী, দীপ্ত, রুদ্র ও স্পষ্ট ভাষী, তিনি কাহারও খাতির করিয়া কোন কথা বলেন না এবং কখন বলেন নাই যাহা তিনি ভাল মনে করেন, তাহা তিনি করিবেনই করিবেন তখন কাহাকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। যখন ... এবং যখন তিনি ভাল মনে করেন তখন তিনি মহাত্মা গান্ধীকেও বর্কশ কথা শুনাইয়া দেন। এ রকম ছাত্র যে এক কলেজে ৪ বৎসর টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না তাহা ... তুল্য। করাচী কলেজ হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়—তখন তিনি যান বম্বে ... কলেজে, কিছুদিন পর সেখান হইতেও বিতাড়িত হইয়া তিনি যান বরোদা কলেজে। সেখানেও টিঁকিতে পারিলেন না—বিতাড়িত হইয়া এবার গেলেন পুনা ফারগুসন কলেজে। এই প্রকারে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি বি, এ পাশ করিলেন এবং পরে এম, এও পাশ করিলেন। পাঠ শেষ করিয়া তিনি বাহির হইলেন দেশ-ভ্রমণে, দেশভ্রমণের সময় তাঁহার যেমন আকৃতি ছিল এখন ঠিক তাহাই আছে, লম্বা লম্বা জটার মত চুল, ভবঘুরে পাগলা পাগলা চেহারা, একখানি সার্ট ও একজোড়া ধুতিতে তাঁহার বেশ ভাল ভাবেই বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। তিনি কাশ্মীরে অমরনাথ ও শ্রীনগর, হিমালয়ে হরিদ্বার ও বদরিকা, শেষে নেপাল ও ভুটান পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর সহিত যোগ দেন। মহাত্মা গান্ধী যখন ... জেলে সত্যাগ্রহ সুরু করেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত একত্রে কাজ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী যখন চম্পারনে কাজ করিতে আসেন, তখন তিনি তাঁহার এই শিষ্যটীকে লইয়া আসিয়াছিলেন; সেখানেও কৃপালানি সাহেব অতি সুচারুভাবে কাজ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।

যখন অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয় তখন তিনি বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁহার গুরুর আহ্বান, তিনি তৎক্ষণাৎ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাড়িয়া দিয়া আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি বলেন "এই অসহযোগ আন্দোলনের দোষগুণ আমি বিচার করিনা, এই আন্দোলনই যখন ভারতে বিদেশী শাসনের (foreign rule) বিরুদ্ধে, তখন ইহাতে আমি যোগ দিবই। যাহাতে ভারত আবার স্বাধীন হয় তাহাই ভাল।" বারানসীতে তিনি এক আশ্রম স্থাপন করেন—সে আশ্রম এখনও বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে।

তিনি যে গুজরাত মহাবিদ্যালয়ের ন্যায় এক নূতন ধরণের কলেজের উপযুক্ত প্রিন্সিপ্যাল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি ভীষণ, তিনি দীপ্ত, তিনি রুদ্র, তিনি কঠোর—তিনি এক অদ্ভুত কর্ম্মী, তিনি এক distinguished vagabond। তাঁহার এক ভাই ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ... বলকান সমরে টার্কির পক্ষে যুদ্ধ করিতে ট্রিপলি যাইয়া প্রাণ হারান।

প্রিন্সিপাল জিবত্রাম কৃপালানিও তাঁহার এই ভাইয়ের ন্যায়ই তীব্র ও জ্বলন্ত; তাঁহার ছ মাস জেল হইয়াছিল; ছয়মাস কেন ছয়বৎসর জেল হইলেও তাঁহার আপত্তি নাই।

গুজরাত মহাবিদ্যালয়
আমেদাবাদ

শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমি কোন বিশেষ জাতি বা বিশেষ কালের বিচার না করিয়া সাধারণ ভাবে, বিশুদ্ধ দার্শনিকতত্ত্বহিসাবে সভ্যতা বস্তুটির স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ আমি ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু এই আখ্যানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি মোটামুটি ভাবে এই সভ্যতার বিশিষ্ট প্রকৃতি ও গঠনের সহিত আপনাদের পরিচয় স্থাপন করিতে চাই। আমি কেবল ততটুকু পরিস্ফুটভাবে ইহার প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে চাই, যাহাতে জগতের অন্যান্য দেশের সভ্যতা হইতে ইহা যে বিভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতা, এইটুকুই আপনাদের মনে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে পারে। আমি একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে আমার বর্ণিত চিত্র এমন যথাযথ ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইবে যে আপনারা দেখিবামাত্র ইহাকে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিকৃতি বলিয়া চিনিতে পারিবেন।

এশিয়াতেই হউক বা ইউরোপেই হউক, আধুনিক ইউরোপের পূর্ব্বে যে সকল স্থানে সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছে, সেই সকল স্থানের সভ্যতার মধ্যে, এমন কি গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতার মধ্যেও একটা বৈচিত্র্যাভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক সভ্যতাই যেন একটিমাত্র করিয়া মূলতথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, একটিমাত্র করিয়া মূলভাব হইতে উদ্ভূত। যেন সমাজ সে সব স্থানে একটিমাত্র মূলতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, এবং সে সব স্থানের রীতিনীতি অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান সমস্তই যেন একটিমাত্র মূলতত্ত্বদ্বারা গঠিত ও অনুপ্রাণিত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন মিশর দেশে এক যাজকতন্ত্ররূপ মূলতত্ত্বদ্বারা সমগ্র সমাজ শাসিত ও অনুপ্রাণিত। এই একটিমাত্র তত্ত্ব সেখানকার রীতিনীতি, সেখানকার স্থাপত্য এবং সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শনের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষেও আপনারা সেই একই তত্ত্বের প্রভাব দেখিতে পাইবেন। সেখানে এখনও পর্য্যন্ত আপনারা সেই যাজকতন্ত্রের আধিপত্য দেখিতে পাইবেন। আবার অন্য কোন কোন দেশে আপনারা অন্য এক তত্ত্বের প্রভাব দেখিবেন, যথা সমাজে বিজেতৃজাতির আধিপত্য। এ সকল সমাজে একমাত্র বলের আধিপত্য দেখা যাইবে। সমাজের বিধিব্যবস্থা, সমাজের প্রকৃতি, সমস্তই সেখানে বলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত। অন্যত্র আবার সমাজে জনতন্ত্রনীতির বিকাশ ও আধিপত্য। এশিয়ামাইনর, সীরিয়া, ফীনিশিয়া প্রভৃতি দেশের সমুদ্রোপকূলে যে সমস্ত বাণিজ্যসমৃদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে এই জনতন্ত্রনীতির আধিপত্য দেখা যায়। মোটের উপর দেখা যায় প্রাচীন সভ্যতামাত্রই এক একটি বিশেষ ভাব বা তত্ত্বের ছাপ লইয়া নিজ নিজ

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

রীতিনীতি প্রতিষ্ঠানাদি গঠন করিয়া লইয়াছিল; একটি প্রবলশক্তিদ্বারা তাহাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাপ্রণালী শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত।

আমি একথা বলিতে চাই না যে এই সকল রাষ্ট্রের সভ্যতার মধ্যে যে একমুখীনতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আদিম কাল হইতে বরাবরই তাহাদের মধ্যে প্রবল ছিল। ঐ সকল দেশের প্রাচীনতর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সমাজের আভ্যন্তরীণ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সময়ে সময়ে সমাজের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য পরস্পর লড়াই করিয়াছে। যথা প্রাচীন মিশর, ইজ্রিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশে যোদ্ধৃসমাজ যাজকসমাজের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। অন্যত্র গোষ্ঠীগত বা বংশগত ঐক্যের ভাব অন্যপ্রকার স্বাধীন একতা-বন্ধনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, কোথাও বা অভিজাততন্ত্রের সহিত জনতন্ত্রের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল বিভিন্ন তত্ত্বের সংঘর্ষ প্রাগৈতিহাসিকযুগে সংঘটিত হইয়াছে, এবং ঐতিহাসিক যুগে তাহাদের অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্র রহিয়া গিয়াছে।

কোন কোন স্থলে ঐতিহাসিক যুগেও জাতীয় জীবনের মধ্যে এই সকল সংঘর্ষের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পকালের মধ্যেই এই সকল সংঘর্ষের পর্য্যবসান হইয়াছে। পরস্পর বিবদমান বিভিন্নশক্তির মধ্যে কোন একটি শক্তি অল্পকালের মধ্যেই সমাজে একাধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সকল প্রাচীন সমাজের ইতিহাসে এককালে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অবস্থান ও সংঘর্ষ কখনও অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই, সাময়িক বিক্ষোভমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই কোন প্রকার জটিলতা বা উপাদানবৈচিত্র্য নাই। এক একটি জাতির ইতিহাসমধ্যে এক একটি মূলতত্ত্বের আধিপত্য। প্রাচীন সমাজের এই একবর্ত্তিতার ফল ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ফল প্রসব করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে এই একবর্ত্তিতার ফলে সমাজের বিকাশ ও পরিণতি অতি অল্প কালের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছিল। কোনও জাতি এত শীঘ্র এমন সফলতার সহিত জাতীয় শক্তির বিকাশ সাধনে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এই বিস্ময়জনক উন্নতি ও পুষ্টির পর, গ্রীশ যেন হঠাৎ একেবারে অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া পড়িল। গ্রীশের জাতীয় ক্ষয় ও বিনাশ সম্পূর্ণ রূপে সাধিত হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু এই ক্ষয়ের সূত্রপাত হইল বড় শীঘ্র। মনে হয় যেন গ্রীক সভ্যতার প্রাণতত্ত্বের সৃজনী শক্তি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল, এপর্য্যন্ত আর এমন কোনও নূতন শক্তির আবির্ভাব হয় নাই যাহাতে এই সভ্যতাকে নবজীবন দান করিতে পারে।

অন্যত্র, মিশর ও ভারতবর্ষে সামাজিক জীবনে একটিমাত্র তত্ত্বের একাধিপত্যের ফল অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। সেখানে সমাজ স্থিতিশীল হইয়া পড়িয়াছে। একবর্ত্তিতার ফলে দাঁড়াইয়াছে বৈচিত্র্যাভাব। সমাজ সেখানে বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই, টিকিয়া রহিয়াছে, কিন্তু গতি নাই, চাঞ্চল্য নাই, সামাজিক জীবন যেন বরফের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

এই কারণেই সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই একটা একাধিপত্যস্থাপনের চেষ্টা, বিরোধী মত, বিরোধী শক্তিকে জোর করিয়া দমন করিবার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। এই একাধি-পত্যের চেষ্টা সর্ব্বত্র ধর্ম্মনীতি বা শাসননীতির নামে চালান হইয়াছে। সমাজে কোন একটি

বিশেষ শক্তির একচেটিয়া সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইয়াছে, সে শক্তি অন্য কোন শক্তির অস্তিত্বমাত্র থাকিতে দেয় নাই। সমস্ত বিরোধী ভাব, বিরোধী শক্তি সে নির্মমভাবে দলন ও নিষ্পীড়ন করিয়াছে। শাসন শক্তি কখনও তাহার পার্শ্বে অন্য কোন শক্তি বা তত্ত্বের প্রকাশ অথবা ক্রিয়া স্বীকার করে নাই।

সভ্যতার এই একনীতিবর্ত্তিত সাহিত্য বা অন্যান্য মানস সৃষ্টির উপরেও একটা বিশেষ ছাপ দিয়াছে। ইউরোপের সর্ব্বত্রই আজকাল ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের যে সকল নিদর্শন ছড়াইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত সকলেই অল্পাধিক পরিচিত হইয়াছেন। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সেগুলি সব এক ছাঁচে ঢালা, সেগুলি যেন সব এক তথ্যের পরিণতি, এক ভাবের প্রকাশ।—ধর্ম্মগ্রন্থ বল, ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী বল, নাটক মহাকাব্য বল, সর্ব্বত্রই এক প্রকৃতির ছাপ। ঐতিহাসিক ঘটনা ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে বৈচিত্র্যহীনতা, যে প্রকৃতি-সাম্য, মানস সৃষ্টির মধ্যেও তাহারই ছাপ। শুধু ভারতে নয়, মানববুদ্ধির শ্রেষ্ঠ সম্পদের ভাণ্ডার যে গ্রীস, সেই গ্রীসদেশেও সাহিত্য ও কলারাজ্যে এই একাকারের রাজত্ব।

আধুনিক ইউরোপের সভ্যতা এই বিষয়ে প্রাচীন সভ্যতার ঠিক বিপরীত। সাধারণ ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় এই সভ্যতার প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়, জটিল, বিক্ষুব্ধ। ইহার মধ্যে সকলপ্রকারের সমাজনীতি, সকলপ্রকারের সমাজগঠন, একত্র পাশাপাশি রহিয়াছে। অপার্থিব ও পার্থিব শক্তি—যাজক তন্ত্র, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও জনতন্ত্র সকল প্রকার শাসন তন্ত্রের উপাদান, এবং রাষ্ট্রশরীর ও সমাজশরীরের সকল প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে। স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য্যসম্পদ ও সামাজিক প্রতিপত্তির সর্ব্ববিধ স্তর ইহার মধ্যে পাশাপাশি রহিয়াছে। এই সব বিভিন্ন শক্তি অনবরত পরস্পরের বিরুদ্ধে বল পরীক্ষা করিতেছে, কিন্তু কেহই অন্যগুলিকে নিঃশেষিত করিতে পারিতেছেনা, কেহই সমাজের উপর, রাষ্ট্রের উপর নিজের একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেছেনা। প্রাচীন কালে প্রত্যেক যুগেই, সমস্ত সমাজ যেন এক ছাঁচে ঢালা ছিল। কখনও বা বিশুদ্ধ রাজতন্ত্র, কখনও বা বিশুদ্ধ যাজকতন্ত্র, কখনও বা বিশুদ্ধ জনতন্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে, কিন্তু সেই সেই কালে সেই সেই তন্ত্রের সম্পূর্ণ আধিপত্য। আধুনিক ইউরোপ সর্ব্ব প্রকার সমাজ ব্যবস্থার, সমাজ গঠনের সকল প্রকার নূতন প্রচেষ্টার নিদর্শন লইয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত। এখানে বিশুদ্ধ বা মিশ্র রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, অল্পবিস্তার অভিজাতপ্রমুখ জনতন্ত্র, সকল প্রকার শাসন ব্যবস্থাই এককালে পাশাপাশি সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে অথচ তাহাদের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে একটা পারিবারিক সাদৃশ্য লক্ষ্য না করা অসম্ভব।

আধুনিক ইউরোপের চিন্তা ও ভাবরাজ্যেও সেই বৈচিত্র্য সেই সংঘর্ষ। যাজক তন্ত্রবাদ, রাজতন্ত্রবাদ, অভিজাততন্ত্রবাদ, জনতন্ত্রবাদ, এই সকল বিভিন্ন মত ও বিশ্বাস পরস্পরকে খণ্ডন করিতেছে, পরস্পরকে হঠাইতে চেষ্টা করিতেছে, পরস্পরের স্বচ্ছন্দ-বিকাশে বাধা দিতেছে এবং পরস্পরের রূপান্তর সাধন করিতেছে। মধ্যযুগের লেখকদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিঃসঙ্কোচ ও স্পষ্টবাদী তাঁহাদের লেখা পড়িয়া দেখুন, কোথাও দেখিবেন না যে কোন একটি ভাব বা চিন্তাকে তাহার চরম পরিণতি পর্য্যন্ত ফুটাইয়া তোলা

হইয়াছে। যিনি স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজশাসনের একান্ত পক্ষপাতী তিনিও সহসা স্বকীয় মতবাদের চরম ফলাফল বিবেচনা করিতে গেলে থমকিয়া দাঁড়ান। তাঁহার চারিদিকে যে আরও পাঁচ রকমের চিন্তাপ্রণালী, আরও পাঁচ রকমের ভাবসমষ্টি সমাজের মধ্যে মাথা তুলিয়া আছে, সে দিকে তিনি চক্ষুমুদ্রিত করিতে পারেন না। কাজেই তাঁহার চিন্তাস্রোতের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাঁহার ভাবস্রোত আতিশয্যে পৌঁছিতে পায় না। আবার যাঁহারা জনতন্ত্রের পক্ষপাতী তাঁহারাও সেই একই নিয়মের বশবর্ত্তী। প্রাচীন সাহিত্য দর্শনে দেখা যায় এক একটি মতবাদ নিঃসঙ্কোচে কোনও দিকে না তাকাইয়া অনুকূল যুক্তি দ্বারা পথঘাট বাঁধিয়া একেবারে তাহার চরম পরিণতিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বিরুদ্ধ মতবাদের অস্তিত্বই সে স্বীকার করে না, নানা বিরোধী মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য সে নিজকে কখনও খর্ব্ব করে নাই। মধ্যযুগের ইউরোপের চিন্তারাজ্যে এইরূপ নিঃসঙ্কোচ একদেশদর্শিতা ও একমুখী গতি কুত্রাপি দেখা যায় না। চিন্তার রাজ্যে যেরূপ, ভাবরাজ্যেও এই উভয় যুগের মধ্যে সেই একরূপ পার্থক্য। মধ্যযুগে ইউরোপে একদিকে যেমন দেখা যায় প্রবল স্বাতন্ত্র্যানুরাগ, অপর দিকে তেমনি তাহার পার্শ্বেই সহজস্বীকৃত কুণ্ঠালেশহীন শাসনবশ্যতা, একদিকে অসাধারণ প্রভুভক্তি, অসাধারণ রাজভক্তি, অপর দিকে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া অপর কাহারও দিকে না তাকাইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে নিজের ইচ্ছাশক্তি খাটাইবার জন্য অদম্য বাসনা। সমাজে যে বৈচিত্র্য ও বিক্ষোভ, মানুষের ভাবরাজ্যেও সেই বৈচিত্র্য ও বিক্ষোভ।

রসসাহিত্যক্ষেত্রেও সেই একই প্রকৃতির ছাপ। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে শিল্পকলা ও সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া মধ্যযুগের সাহিত্য ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কিন্তু ভাব ও চিন্তার গভীরতার দিক দিয়া এই আধুনিক সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্য অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন। মানব আত্মা এখন নানা বিভিন্ন দিক দিয়া এবং গভীরতর স্তর পর্য্যন্ত নাড়া পাইয়াছে। এবং এই কারণেই এইযুগে শিল্পগঠনে পারিপাট্যের অসম্পূর্ণতা ঘটিয়াছে। কারণ শিল্পের উপাদান যত বিচিত্র, যত অপূর্ব্ব, যত সংখ্যায় অধিক হইবে, সেই উপাদানগুলিকে একত্র সংহত করিয়া বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল শিল্পাবয়বে পরিণত করা তত কঠিন হইবে। যে যে গুণে শিল্পসৃষ্টির সৌন্দর্য্য সাধিত হয় তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে, সুস্পষ্টতা, সরলতা, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত গঠন ভঙ্গীর মধ্যে ভাবস্রোতমূলক একাত্মতা। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার অসাধারণ ভাববৈচিত্র্য ও চিন্তাবৈচিত্র্যের দরুণ এই সরলতা ও প্রাঞ্জলতা সাধন করা শিল্পের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে।

তাহা হইলে দেখা গেল আধুনিক সভ্যতার এই প্রধান বিশেষত্বটি কি ভাবরাজ্যে কি চিন্তারাজ্যে, কি সাহিত্যক্ষেত্রে, কি শিল্পক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই ফুটিয়া বাহিরিয়াছে। অবশ্য শিল্প বা সাহিত্যের এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে মানবাত্মার বিশেষ বিশেষ বিকাশ পৃথক করিয়া আলোচনা করিলে, আমরা সাধারণতঃ দেখি যে এ সকল ক্ষেত্রে প্রাচীন অপেক্ষা আধুনিক শিল্পসাহিত্য নিকৃষ্ট। কিন্তু অন্য দিকে যদি আমরা সমষ্টিভাবে বিচার করি তাহা হইলে দেখিব আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা অন্য যে কোন সভ্যতা অপেক্ষা তুলনাতীতরূপে সম্পদশালী

কারণ ইহার মধ্যে একই সময়ে নানা বিচিত্র দিক দিয়া মানবাত্মা বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করিয়াছে। ফলে আপনারা দেখিতেছেন যে যদিও এই সভ্যতা পঞ্চদশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়াছে, তথাপি ইহা এখনও ক্রমোন্নতিশীল। এ সভ্যতা গ্রীকসভ্যতার মত রাতারাতি বাড়িয়া উঠে নাই সত্য, কিন্তু ইহার উন্নতির বেগ কখনও রুদ্ধ হয় নাই। তাহার সম্মুখে ভবিষ্য জগতে যে বিশাল লীলাক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার আভাস পাইয়া সে দিনে দিনে নূতন উদ্যমে দ্রুততর বেগে অগ্রসর হইতেছে, কারণ সে ক্রমশঃই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ও স্ফূর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছে। অন্যান্য সভ্যতায় এক মূলনীতির, এক ছাঁচের প্রাধান্য বা একাধিপত্যের ফলে যেমন স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ক্রিয়া স্ফূর্ত্তি পায় নাই, আধুনিক ইউরোপে তেমনি সমাজব্যবস্থায় নানা বিরোধী শক্তি, নানা বিভিন্ন জাতি, নানা বিভিন্ন শ্রেণীর একত্র অবস্থানের দরুণ বর্ত্তমানকালের স্বাধীনতা জন্মলাভ করিয়াছে। কারণ এই সকল পরস্পর বিরোধী শক্তি কেহ কাহাকে একেবারে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে নাই। এবং কেহ কাহাকে নির্ম্মূল করিয়া উৎসাদিত করিতে পারে নাই বলিয়াই নানা বিভিন্ন মত, নানা বিভিন্ন চিন্তাসূত্র, নানা বিভিন্ন ভাবসূত্র বাধ্য হইয়া পরস্পরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে সে একটা বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের ভার লইবে। সুতরাং অন্য সর্ব্বত্রই যেখানে একনীতির আধিপত্যের দরুণ দণ্ডমূলক শাসনের প্রাধান্য হইয়াছে, আধুনিক ইউরোপে সেখানে সভ্যতার উপাদানবৈচিত্র্যের ফলে এবং এই সকল উপাদানের নিয়ত সংঘর্ষ ও বিরোধের ফলে উৎপন্ন হইল ইউরোপীয় স্বাধীনতা। ইহাই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিশেষ মহত্ব।

ইহারই দরুণ সে অন্যান্য সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। এ দাবী যে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। একবার ইউরোপীয় সভ্যতার কথা ভুলিয়া গিয়া সাধারণ ভাবে জগৎ প্রকৃতির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখুন। জগৎ কি নিয়মে চলিতেছে? সেও কি ঠিক এইরূপ উপাদানবৈচিত্র্য লইয়া নানা বিচিত্র শক্তির সংঘর্ষের মধ্য দিয়া চলিতেছে না? বাস্তবিক পক্ষে এই জগৎপ্রকৃতির মধ্যেও কোন একটি তত্ত্ব, কোন একটি নিয়ম শৃঙ্খলা, কোন একটা ভাব, কোন একটি বিশেষ শক্তি, অন্য সমস্ত শক্তির প্রভাব বিনষ্ট করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই।

নানা বিচিত্র শক্তি, নানা বিচিত্র তত্ত্ব, নানা বিচিত্র পদ্ধতি, পরস্পরের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, পরস্পরকে খর্ব্ব করিতেছে, পরস্পরের সঙ্গে অনবরত লড়াই করিতেছে; কখনও একটি, কখনও বা অন্যটি প্রাধান্য লাভ করিতেছে, কিন্তু কেহ কখনও সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইতেছে না, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইতেছে না। এই বিশাল জগদ্ব্যাপারের গতি অবশ্য একটা সামঞ্জস্যের দিকে, একটা একীকরণের দিকে। সে সামঞ্জস্য, সে আদর্শে হয় ত কখনও উপনীত হওয়া যাইবে না, কিন্তু মানবজাতি স্বাধীন চেষ্টা ও উদ্যমের দ্বারা সেই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। ইহাই যদি জগতের সাধারণ প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিশাল জগৎপ্রকৃতির যথার্থ প্রতিকৃতি বলিতে হইবে। ইহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা নাই, একদেশবর্ত্তিতা নাই, স্থাবরতা নাই। আমার বিশ্বাস জগতের ইতিহাসে এই প্রথম সভ্যতা

হইতে বিশেষত্বের ছাপ মুছিয়া গিয়াছে; মানব সভ্যতা এই প্রথম বিশাল বিশ্বনাট্যের মতই বিচিত্র উপাদান লইয়া, বিচিত্র সম্পদে সম্পন্ন হইয়া, বিচিত্র সংঘর্ষের মধ্য হইতে বলসঞ্চয় করিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং একথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে ইউরোপীয় সভ্যতা সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশ্য অনুসারে অগ্রসর হইতেছে। ইহাই হইল ইহার শ্রেষ্ঠতার যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত পরিমাপ।

আমি চাই যে আপনারা বরাবর ইউরোপীয় সভ্যতায় এই মৌলিক বিশিষ্টতার কথা মনে করিয়া রাখিবেন। আপাততঃ আমি কেবল কথাটি বলিয়া রাখিলাম। পরে ঘটনা পরম্পরার বিবৃতি ও অভিব্যক্তি দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হইবে। তথাপি, যদি আমি দেখাইতে পারি যে এই সভ্যতার শৈশবাবস্থাতেই এই বিশিষ্টতার মূল কারণ ও উপাদানসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে; যদি ইহার জন্ম কালে, রোমীয় সাম্রাজ্যের পতন মুহূর্ত্তে, জগতের তৎকালীন অবস্থার মধ্যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সকল ঘটনার সমন্বয়ে ইউরোপীয় সভ্যতা গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যেই এই বিক্ষোভ, এই বৈচিত্র্য, এই বহুমুখীনতার লক্ষণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমার মূলসূত্রের যে এটা একটা প্রবল সমর্থন হইবে, তাহা অবশ্য আপনারা স্বীকার করিবেন। আমি এখন এই গবেষণায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে আমি রোমীয় সাম্রাজ্যের অবসানযুগে ইউরোপের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব, এবং নানা প্রথা, প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস, ভাব ও চিন্তা হইতে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব যে প্রাচীন জগৎ বর্ত্তমান জগৎকে কি কি উপাদান দান করিয়া গেল। যদি এই উপাদানের মধ্যেই আপনারা দেখিতে পান যে ইউরোপীয় সভ্যতার পূর্ব্বোক্ত বিশেষ প্রকৃতির ছাপ রহিয়াছে, তাহা হইলে আপনাদিগের নিকট আমার প্রদত্ত পরিচয় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না।

প্রথমে আমাদের স্পষ্টরূপে ধারণা করা দরকার যে রোমীয় সাম্রাজ্যের যথার্থ স্বরূপ কি এবং কেমন করিয়াই বা ইহা গঠিত হইল।

রোম মূলতঃ ছিল একটি মিউনিসিপালিটি অর্থাৎ পৌরসঙ্ঘ। মাত্র একটি প্রাচীরবেষ্টিত নগরের অধিবাসীবর্গের উপযোগী রীতিনীতি প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি হইল রোমের শাসন তন্ত্র। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্তই হইল পৌর প্রতিষ্ঠান, ইহাই তাহাদের বিশিষ্ট প্রকৃতি। একথা যে শুধু রোমের পক্ষে খাটে তাহা নয়। যদি আমরা তদানীন্তন ইটালীর দিকে তাকাই, তাহা হইলে রোমের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি নগর ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই না। তখন জনসঙ্ঘ বা জাতি বলিলে বুঝাইতে কেবলমাত্র কতকগুলি নগরের, কতকগুলি পৌরতন্ত্রের সমবায়। লাতিন জাতি ছিল কতকগুলি লাতিন নগরের সমবায়। সেইরূপ, ইট্রুস্কান Etruscan জাতি, সাম্নাইট (Samnite) জাতি, সেবাইন (Sabine) জাতি, বৃহত্তর গ্রীসের (Graecia Magna) অধিবাসী বৃন্দ, সকলের পক্ষেই ঐ এক বর্ণনা প্রযোজ্য।

তখন সহরের বাহিরে দেশ বলিয়া কোন ব্যাপার ছিল না। অবশ্য ভূমি ছিল, এবং ভূমিতে চাষআবাদও হইত, কিন্তু এখনকার মত পল্লীজনপদ ছিল না, পল্লীসমাজ ছিল না। ভূম্যধিকারীগণ নগরবাসী ছিলেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে স্ব স্ব ভূমি সম্পত্তি পরিদর্শন করিতে

বাহির হইতেন, এবং সঙ্গে কতকগুলি ক্রীতদাস লইয়া যাইতেন। কিন্তু আমরা এখন পল্লীভূমি বলিতে যাহা বুঝি—অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়িয়া একটি গ্রাম বা পল্লীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকসমষ্টির বাস, এ ব্যাপার প্রাচীন ইটালীতে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। রোমীয় রাষ্ট্র যখন ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন সে কি করিল? ইতিহাস অনুধাবন করিয়া দেখ, দেখিবে সে হয় নূতন নূতন নগর জয় করিয়া লইল, না হয় নূতন নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিল। বিভিন্ন নগরের সহিতই সে যুদ্ধ করিয়াছে, বিভিন্ন নগরের সহিতই সে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে; এবং বিভিন্ন নগরেই সে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। রোমের জগদ্বিজয়ের ইতিহাস নগরবিজয় ও নগরপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস। প্রাচ্যদেশে অবশ্য রোমের সাম্রাজ্যবিস্তার ঠিক একেবারে এই প্রণালীতে সম্পন্ন হয় নাই। সেখানে জনসংঘ ইউরোপীয় জনসংঘের ভিন্ন ভিন্ন নগরচক্রে ঝাঁক বাঁধিয়া থাকিত না। কিন্তু আমরা যখন কেবল এখানে ইউরোপীয় লোকসমষ্টির কথাই আলোচনা করিতেছি, তখন প্রাচ্যদেশে কি ঘটিয়াছিল তাহা লইয়া আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই।

প্রতীচ্য ভূভাগের সর্ব্বত্রই কিন্তু আমরা পূর্ব্বোক্ত তথ্যের নিদর্শন প্রাপ্ত হই। গলে (Gaul) বলুন, স্পেনে (Spain) বলুন, আমরা কেবল সহরের কথাই শুনিতে পাই। সহরের বাহিরে একটু দূরে যাইলেই সমগ্র দেশ জলা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রোমীয় স্থাপত্য কীর্ত্তি, রোমের রাজপথগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করুন। দেখিবেন কতকগুলি বড় বড় রাজপথ নগর হইতে নগরান্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। আজকাল পল্লীখণ্ডে যেমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ পরস্পরকে কাটিয়া সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া রহিয়াছে, তখন তাহা দেখা যাইত না। মধ্যযুগ হইতে এপর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্র যে অগণিত গ্রাম, পল্লী আবাস, উপাসনামন্দির ছড়াইয়া গিয়াছে, রোমীয় যুগে তাহার কিছুই ছিল না। রোম কেবল আমাদিগের জন্য কতকগুলি বিপুল পৌরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। রোমীয় স্থাপত্যকীর্ত্তিমাত্রই পৌরকীর্ত্তি, বহুলোকসমষ্টির উপভোগের জন্য সংগঠিত হইয়াছিল। রোমীয় জগতের যে দিক দিয়াই আলোচনা করুন দেখিবেন সেই নগরপ্রাধান্য, সেই পৌর আদর্শের একাধিপত্য এবং সামাজিক হিসাবে পল্লীভূখণ্ডের অস্তিত্বাভাব।

রোমীয় জগতের এই পৌরপ্রকৃতির দরুণ রাষ্ট্রীয় বন্ধনের একতা সম্পাদন এবং একতা সংরক্ষণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল; রোমের মত একটি পৌর রাষ্ট্রের পক্ষে জগৎ বিজয় করা যত সহজ হইয়াছিল, বিজিত জগৎ শাসন করা ও তন্মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করা তদপেক্ষা অনেক বেশী কঠিন হইয়াছিল। তাই যেমনি রাষ্ট্রবিস্তার কার্য্য সম্পূর্ণ হইল, সমগ্র প্রতীচ্যখণ্ড ও প্রাচ্যখণ্ডের অনেকখানি রোমীয় শাসনের অধীন হইয়া পড়িল, অমনি সাম্রাজ্যভুক্ত সেই ছোট বড় সংখ্যাতীত পৌর রাষ্ট্রগুলি (যাহারা নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্যই গঠিত হইয়াছিল,) চারিদিকে বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। কাজেই এমন একটি শাসনতন্ত্রের আবশ্যক হইয়া পড়িল, যাহাতে নানা বিচ্ছিন্ন উপাদান একত্র বাঁধিয়া রাখিতে পারে, নানা বিকীর্ণ শক্তিপুঞ্জ এক কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতে পারে। সাম্রাজ্যতন্ত্র যে রোমের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল, ইহাই হইল তাহার অন্যতম কারণ।

সাম্রাজ্যতন্ত্র এই বিচ্ছিন্ন বিকীর্ণ সমাজের মধ্যে একতা ও সংযোগ সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিছুদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। আগষ্টস্ ও ডাইওক্লিশিয়ানের রাজত্বের অন্তর্বর্ত্তী কালেই, পৌরব্যবস্থা প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই রোমীয় জগৎ ব্যাপিয়া একটি সুবিশাল ঐককেন্দ্রিক শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সমগ্র সাম্রাজ্য জালের মত ঘিরিয়া কতকগুলি ক্রমপরম্পরাবিন্যস্ত পরস্পরসম্বদ্ধ, সাম্রাজ্যকেন্দ্রের সহিত দৃঢ়শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজপুরুষ বসান হইল। তাঁহাদের একমাত্র কাজ হইল সমাজের মধ্যে রাজশক্তির ইচ্ছাকে ফলবতী করা, সমাজের উদ্যম, সমাজের সম্পদ্ রাজশক্তির হস্তে তুলিয়া দেওয়া।

এই ব্যবস্থা যে শুধু রোমীয় জগতের নানা বিচ্ছিন্ন শক্তি, নানা বিচিত্র উপাদান একত্র করিয়া ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা নয়, উপরন্তু জনসাধারণের মনে অতি সহজে ও অনায়াসেই স্বেচ্ছাতন্ত্র ও কেন্দ্রশক্তির ভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই ক্ষীণসূত্রে মিলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে, এই পৌররাষ্ট্রসমষ্টির মধ্যে কেমন করিয়া যে এত শীঘ্র পূতগরিমামণ্ডিত একমাত্র সম্রাট্ মহিমার প্রতি এমন একটা অচলা ভক্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিল, তাহা বিস্ময়ের ব্যাপার। রোমীয় জগতের নানা বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে একটা একতাবন্ধন আনার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই খুব প্রবলভাবে অনুভূত হইয়াছিল, নচেৎ কেমন করিয়া এত সহজে এই স্বেচ্ছাতন্ত্রনীতি জনবৃন্দের বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইল ?

জন সাধারণের এই বিশ্বাসের সাহায্যে, প্রকাণ্ড একটা জালের মত বিস্তৃত এই শাসন যন্ত্রের সাহায্যে এবং তৎসহযোগী সামরিক ব্যবস্থার সাহায্যে, রোমীয় সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ প্রলয়ের বিরুদ্ধে এবং বাহির হইতে বর্ব্বর-আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে লাগিল। এইরূপে সে অনেকদিন ধরিয়া, জরাগ্রস্ত হইয়াও, লড়াই করিয়া করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এমনি একটা মুহূর্ত্ত আসিল যখন আর লড়াই করা চলিল না, প্রলয়শক্তিরই জয় হইল। স্বেচ্ছাতন্ত্রনীতির শাসনকৌশল, দাসভাবাপন্ন প্রজাবৃন্দের ঔদাসীন্য, কিছুতেই আর এই বিপুলকায় শাসনযন্ত্রটিকে টিকাইয়া রাখিতে পারিলনা। চতুর্থ শতাব্দীতে সর্ব্বত্রই রোমীয় সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন বিখণ্ডিত হইয়া পড়িল। বর্ব্বরগণ চারিদিক হইতে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল। বিজিত প্রদেশগুলি আর কোন বাধা দিল না ; তাহারা সাম্রাজ্যের ভাগ্যে কি হইল সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া নিশ্চেষ্ট রহিল। এই সময়ে, কোন কোন সম্রাটের মনে এক নূতন কল্পনার উদ্রেক হইল। তাঁহারা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহিলেন যে স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসন-প্রণালী অপেক্ষা জনসাধারণকে স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়া রোমীয় সাম্রাজ্যের একত্বরক্ষা করার বেশী সুবিধা হয় কিনা। অর্থাৎ আজকাল যেমন রাষ্ট্রভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি সঙ্ঘের দ্বারাই শাসন কার্য্য পরিচালিত হয়, সেই রূপ কোন একটা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া দেখিতে চাহিলেন। ৪১৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হনোরিয়স (Honorius) ও কনিষ্ঠ থিওডোসিয়স্ গল-প্রদেশের (Gaul) শাসন কর্ত্তা এগ্রিকোলার নিকট একটি আদেশ পত্র পাঠাইয়াছিলেন। এই পত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য গল্‌প্রদেশের দক্ষিণাংশে একপ্রকার জনপ্রতিনিধিচালিত শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা ; এবং ইহার সাহায্যে সাম্রাজ্যের একত্ব বজায় রাখা। নিম্নে এই আদেশপত্রের মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

"আপনি যে সন্তোষজনক মন্তব্য দিয়াছেন তদনুসারে নিম্নোক্ত আদেশগুলি আইনস্বরূপ জারী করিতেছি। আপনার শাসনভুক্ত সাতটি প্রদেশ এই আইনের দ্বারা বাধ্য থাকিবে। আইন গুলি এমন যে তাহারা নিজেরাই এরূপ বিধি আকাঙ্খা ও প্রার্থনা করিতে পারিত। দেখা যায় যে প্রত্যেক প্রদেশ হইতে, এমন কি প্রত্যেক নগর হইতে অনেক কর্ম্মচারী অথবা বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধি, হিসাব নিকাশ দিবার জন্য অথবা ভূম্যধিকারিবর্গের স্বার্থ সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আপনার সহিত আলোচনা করিবার জন্য অনেক সময় আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা স্থির করিয়াছি এবৎসর হইতে বৎসরে একবার করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজধানী আর্ল্ (Arles) নগরে উপরোক্ত সাতটি প্রদেশের অধিবাসিবর্গের একটি সম্মিলন আহ্বান করিলে অনেক উপকার হয় এবং ব্যবস্থাটী সময়োচিত হয়। এই ব্যবস্থায় আমরা সাধারণের স্বার্থ ও বিশেষ বিশেষ পক্ষের স্বার্থ উভয় দিকেই সমান দৃষ্টি দিয়াছি। প্রথমতঃ শাসনকর্ত্তার সম্মুখে দেশের প্রধান প্রধান অধিবাসীবর্গের একত্র সম্মিলনের দরুণ প্রত্যেক আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য পাওয়া যাইবে। এই সম্মিলনে যাহা কিছু আলোচনা বা মীমাংসা হইবে, তাহা বিভিন্ন প্রদেশে কাহারও অবিদিত থাকিবে না। এবং যাঁহারা ঐ সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না তাঁহারাও সম্মিলনপ্রণীত ন্যায়বিধি দ্বারা বাধ্য থাকিবেন। উপরন্তু আর্ল্ নগরে এই বার্ষিক সম্মিলনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আমরা এমন একটী ব্যবস্থা করিলাম যাহাতে সাধারণেরও লাভ হয় এবং সামাজিকতারও বৃদ্ধি ও প্রসার হয়। বাস্তবিক পক্ষে, নগরটি এমন সুন্দর ভাবে অবস্থিত যে দলে দলে বিদেশীগণ এখানে সমাগত হয়, এবং অন্যান্য স্থানে যাহা কিছু উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয়, সমস্তই এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কি বিপুলঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত প্রাচ্যখণ্ড, কি সুগন্ধবিস্তারী আরবমরু, কি সূক্ষ্মকারুকুশল আসীরিয়া, কি উর্ব্বর আফ্রিকা, কি সুন্দর স্পেন, কি বীরপ্রসূ গল্—যেখানে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা এই আর্লনগরীতে এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে সেগুলিকে এইখানকার ক্ষেত্রেই উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ রোন্ নদীর সহিত টস্কান্ সমুদ্রের যোগ থাকায় উভয়ের তীরবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশই পরস্পরের প্রতিবেশীস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব যখন সমগ্র পৃথিবী আপনার শ্রেষ্ঠদ্রব্য সম্ভার আনিয়া এই নগরের চরণে ঢালিয়া দিতেছে, যখন সকল দেশের বিশেষ বিশেষ দ্রব্যসামগ্রী স্থলপথে, সমুদ্রপথে, নদীপথে, পালের সাহায্যে, দাঁড়ের সাহায্যে, শকটের সাহায্যে এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তখন এরূপ ভোগসমৃদ্ধিশালী, বাণিজ্যকুশল ভগবচ্চিহ্নিত নগরে এই জনসম্মিলন আহ্বান করিবার জন্য এই যে আদেশ দিতেছি, ইহাতে গল্ মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কিরূপে দেখিতে পায়?

পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা পেট্রোনিয়স্ সাধুউদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া পূর্ব্বে আদেশ করিয়াছিলেন যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হউক। কিন্তু মধ্যবর্ত্তীকালের বিপ্লব ও অনধিকারীগণ কর্ত্তৃক রাজ্যাধিকারের দরুণ প্রথাটি উঠিয়া যাওয়ায় আমরা ইহাকে পুনরায় নূতন উদ্যমের সহিত উজ্জীবিত করিতে সংকল্প করিয়াছি। অতএব হে প্রিয় ভ্রাতঃ এগ্রিকোলা, আপনি এই আদেশ অনুসারে, এবং আপনার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুসারে, আপনার শাসনাধীন প্রদেশ সমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত নিয়মগুলি পালন করাইবেন।

যাবতীয় রাজকর্ম্মাধিকারী, পৌরকর্ম্মাধিকারী, ভূম্যধিকারী এবং বিভিন্ন প্রদেশের বিচারাধিকারী সকলকে বিদিত করা যাইতেছে যে প্রতি বৎসর অগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে তাঁহারা আর্ল নগরীতে সম্মিলিত হইয়া অধিবেশন করিবেন। অধিবেশনের তারিখ তাঁহারা ইচ্ছামত ধার্য্য করিবেন।

নোবেম্ পপুলিনিয়া ও দ্বিতীয় আকুইতেন এই দুই সুদূরবর্ত্তী প্রদেশের বিচারক বর্গ অত্যাবশ্যক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে, যথারীতি প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন।

যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে অবহেলা করিবেন, তাঁহারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। বিচারকদিগের পক্ষে এই অর্থদণ্ডের পরিমাণ পাঁচ সুবর্ণ মুদ্রা এবং পৌর সংঘের (Curia) পরিষদদিগের ও অন্যান্য উচ্চপদধারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে তিন সুবর্ণ মুদ্রা হইবে।

আমরা এই উপায়ে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীবর্গের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে চাই। আমাদের ইহাও স্থির বিশ্বাস যে এই এই উপায়ে আর্ল নগরীও শ্রীসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে।

রাজাজ্ঞা যথানিয়মে প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু যাঁহাদের উপকারের জন্য এই ব্যবস্থা সেই প্রদেশ ও সেই নগরগুলি কিন্তু এ দান গ্রহণ করিল না। কেহই প্রতিনিধি পাঠায় না, কেহই আর্ল যাইতে প্রস্তুত নয়। সেই আদিম অনভিব্যক্ত সমাজের পক্ষে এই সর্ব্বজনীন কেন্দ্রীকরণ একীকরণের আদর্শ সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। স্থানীয় ভাব পৌর ভাব, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ বদান্যতার ভাব পুনরায় জাগিয়া উঠিল, সুতরাং একটা সার্ব্বজনীন রাষ্ট্রীয় সমাজ বা দেশ বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি, তাহা পুনরায় গড়িয়া তোলা অসম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন নগর আপন আপন প্রাচীন বেষ্টনের মধ্যে নিজকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিল। এবং সাম্রাজ্যের পতন হইল, কারণ কেহই নিজকে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করিতে চাহিল না, পৌর জনবর্গ কেবল আপন আপন পুরীর অঙ্গ হইয়া থাকিতে চাহিল। অতএব রোমীয় সাম্রাজ্যের শৈশবে যেরূপ, পতনকালেও সেইরূপ পৌরভাব ও পৌর আদর্শের প্রাধান্য দেখিতে পাই। রোমীয় জগৎ পুনরায় তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিল। পুরসমষ্টি লইয়াই এই জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল ; সাম্রাজ্যের পতন হইল, কিন্তু পৌররাষ্ট্রগুলি রহিয়া গেল।

প্রাচীন রোমীয় সভ্যতা আমাদিগকে এই পৌরতন্ত্রপদ্ধতি দান করিয়া গিয়াছে। অবশ্য রোমীয় সভ্যতার অবসান যুগে এই পদ্ধতির অনেক অবনতি ঘটিয়াছিল ; কিন্তু তথাপি রোমীয় জগতের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাবতীয় উপাদানের বিলয় প্রাপ্তির পর ইহাই একমাত্র যথার্থ, একমাত্র সুগঠিত প্রতিষ্ঠান, যাহা টিকিয়া গেল।

একমাত্র বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে। কারণ আরও একটি বস্তু, আরও একটি আদর্শ সঙ্গে সঙ্গে টিকিয়া গেল। সেটি হইল সাম্রাজ্যের কল্পনা, সম্রাট্ নামের মোহিনী শক্তি, এক দেবমহিমামণ্ডিত স্বেচ্ছাতন্ত্র বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্‌শক্তির আদর্শ।

এই দুইটি বস্তু রোমীয় সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতাকে দান করিয়া গেল—একদিক

পৌররাষ্ট্রতন্ত্র এবং তাহার আনুষাঙ্গক রীতি নীতি প্রথা ও স্বাতন্ত্রনীতি ; অন্যদিকে এক বিশ্বব্যাপী একাকার ব্যবহারবিধিসমষ্টি, স্বেচ্ছাতন্ত্র শক্তির আদর্শ, দৈবমহিমান্বিত রাজশক্তির আদর্শ, সাম্রাজ্যের আদর্শ, শৃঙ্খলাবন্ধন ও বশীকরণ নীতি।

কিন্তু ঐ সময়েই রোমীয় সমাজের মর্ম্মস্থলেই আর এক প্রকার সমাজ গড়িয়া উঠিল। এ সমাজের প্রকৃতি ও মূলনীতি অন্যরূপ। ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন ভাবসমষ্টির দ্বারা সঞ্জীবিত। আমি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সংঘের বা চর্চ্চের কথা বলিতেছি। মনে রাখিবেন আমি খৃষ্টধর্ম্মের কথা বলিতেছি না, খৃষ্টীয় চর্চ্চের কথা বলিতেছি, খৃষ্টীয় সমাজের ধর্ম্মশাসনপ্রতিষ্ঠানের কথা বলিতেছি। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্টধর্ম্ম আর কেবল ভিন্ন ভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত মত বা বিশ্বাসের বিষয় ছিল না, ইহা তখন একটি সুনিয়ন্ত্রিত সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে ইহা তখন গঠনপ্রাপ্ত হইয়াছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে; ইহার তখন একটা ধর্ম্মশাসনপদ্ধতি দাঁড়াইয়াছে, যাজকসংঘ গঠিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকার্য্যের জন্য যাজকবৃন্দের ক্রমবন্ধন ও শ্রেণীবিন্যাস হইয়াছে, আর্থিক আয় সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে, স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার নানা উপায় আয়ত্ব হইয়ায়ছ, প্রাদেশিক সঙ্গীতি, জাতীয় সঙ্গীতি, সাধারণ মহাসঙ্গীতি প্রভৃতি বিরাট সমাজবন্ধনের উপযোগী মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং সাধারণ সংসদে বিচার বিতর্ক করিবার পদ্ধতি, সংসদে বসিয়া দশজনে মিলিয়া সমাজসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক কথায়, খ্রীষ্টধর্ম্ম এযুগে শুধু একটা ধর্ম্মমাত্র নয়, একটা চর্চ্চে অর্থাৎ ধর্ম্ম সমাজে পরিণত হইয়াছে।

খৃষ্ট ধর্ম্ম যদি এই চর্চ্চের আকার প্রাপ্ত না হইত, বলিতে পারিনা তাহা হইলে রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের মধ্যে ইহার কি দশা হইত। আমি এখানে কেবল সহজমানববুদ্ধিগোচর বিচারে প্রবৃত্ত। স্বাভাবিক ঘটনায় স্বাভাবিক পরিণতিপ্রণালীর বাহিরে যাহা কিছু সে সব ব্যাপার আদৌ স্পর্শ না করিয়া আমি বিচার করিতেছি। খৃষ্টধর্ম্ম যদি পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগের মত কেবল একটা মত বা বিশ্বাস বা ভাবসমষ্টিরূপেই থাকিত তাহা হইলে আমার বিশ্বাস ইহা রোম সাম্রাজ্যের বিলয় ও বিদেশী বর্ব্বরদিগের আক্রমণকালে সেই মহাবিপ্লবের মধ্যে কোথায় তলাইয়া যাইত। পরবর্ত্তীযুগে এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় এইরূপই এক বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে ইহার রসাতল প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। সেই মুসলমান আক্রমণকালে সুগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত চর্চ্চ্-আকারে সংহত থাকা সত্বেও খৃষ্টধর্ম্ম আত্মরক্ষণ করিতে পারে নাই। সুতরাং রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে ঐরূপ ঘটিবার সমধিক সম্ভাবনা ছিল। সে সময়ে এমন কোন উপায় ছিল না যাহার সাহায্যে আজকাল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যব্যতিরেকেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিকশক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে, বিরুদ্ধশক্তিকে বাধাপ্রদান করে; এমন কোন উপায় ছিল না যদ্দারা কোন বিশুদ্ধ সত্য বা বিশুদ্ধ আদর্শ মানবসাধারণের মানসরাজ্যে অধিকার বিস্তার করে, মানুষের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে, ঘটনা পরম্পরার স্রোত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। চতুর্থ শতাব্দীতে এমন কিছুই ছিল না যাহাতে ব্যক্তিগত ভাব, ব্যক্তিগত চিন্তা এরূপ প্রভাবশালী হইয়া উঠিতে পারে। ইহা সুস্পষ্ট যে এমন একটা প্রলয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে একটা প্রবল সুসম্বদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত সমাজের একান্ত আবশ্যক ছিল।

আমার বোধ হয় যদি বলা যায় যে চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্টীয় চর্চ্চই খৃষ্টধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিল তাহা হইলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না। রোম-সাম্রাজ্যের অস্তিমকালে ও বর্ব্বর-অধিকারের আদিমযুগে ইউরোপীয় সমাজের ভিতরে ভিতরে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল সেই ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে এক চর্চ্চই তাহার ব্যবস্থান প্রতিষ্ঠান লইয়া, তাহার ধর্ম্মশাসকবৃন্দ লইয়া, তাহার বিরাট শক্তি লইয়া সমাজকে টিকাইয়া রাখিয়াছিল; এবং বিদেশী বর্ব্বরদিগকে আয়ত্তাধীন করিয়া মধ্যস্থস্বরূপ রোমীয়জগৎ ও বর্ব্বরজগতের মধ্যে একতাস্থাপন করতঃ পরস্পরের মধ্যে শিক্ষাসভ্যতার আদান প্রদানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। অতএব, খৃষ্টধর্ম্ম তখন হইতে আধুনিক সভ্যতাকে কি কি দান করিল, কি কি নূতন উপাদান আনিয়া দিল, তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে, খৃষ্টধর্ম্মের দিকে তত লক্ষ্য না করিয়া, এই খৃষ্টীয় চর্চ্চের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সে সময়ে খৃষ্টীয় চর্চ্চের স্বরূপ ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল? (ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

ইরোকোআদের গোষ্ঠী প্রথা

(জার্ম্মাণ সমাজতত্ত্ববিৎ এঙ্গেলস্‌প্রণীত গ্রন্থের এক অধ্যায়)

কুটুম্ববাচক শব্দ ও আত্মীয়তার সম্বন্ধ আলোচনা করিতে করিতে ইয়াঙ্কি পণ্ডিত মর্গান সাবেক কালের পারিবারিক প্রথাগুলা আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। এই ধরণেরই আর এক আবিষ্কারের জন্য মর্গ্যান নৃতত্ত্ববিদ্যার আসরে নাম করিয়াছেন। মানব সমাজে সুপ্রচলিত গোষ্ঠী বা জ্ঞাতি প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলা এই দ্বিতীয় আবিষ্কারের অন্তর্গত।

আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজে যৌন কেন্দ্রগুলা এক একটা জানোআরের নামে অভিহিত হয়। এইগুলা মর্গ্যানের মতে গ্রীকদের "গেনেআ" এবং রোমাণদের "গেনেস" হইতে অভিন্ন। ইণ্ডিয়ানরূপগুলাই গ্রীকরোমাণরূপ অপেক্ষা পুরাণা। গ্রীক রোমাণ প্রথা ইণ্ডিয়ান হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন গ্রীসে এবং রোমে সমাজ "গেন্‌স্" "ফ্রাত্রী" এবং জাতি এই তিন স্তরে পর পর সাজানো ছিল। ইণ্ডিয়ান সমাজের স্তরবিন্যাসও অবিকল এইরূপ। মর্গ্যান আরও বলেন যে উৎকর্ষের যুগে পদার্পণ করা পর্য্যন্ত দুনিয়ার সকল "বার্ব্বার" জাতিই "গেন্‌স্" প্রথার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

এই আবিষ্কার সাধিত হইবামাত্র প্রাচীন গ্রীস ও রোমের বহু কঠিন ও জটিল প্রশ্ন বুঝিতে সাহায্য হইয়াছে। অধিকন্তু খাঁটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বে আদিম মানব কোন পথে কি উপায়ে বিকাশ লাভ করিয়াছিল সেই বিষয়েও ধারণা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদেরা এত দিন প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে "গা-জুরি" করিয়া যে সে মত বাজারে চালাইতেছিলেন। মর্গ্যানের সিদ্ধান্তে সেই সব এক নিমেষে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দেও মর্গ্যান তাঁহার আবিষ্কারগুলা প্রচার করিতে পারেন নাই। তাহার পর তিনি যে সব গবেষণা করিয়াছেন তাহার দ্বারাই সমাজবিজ্ঞানের রাজ্যে একটা যুগান্তর সাধিত হইয়াছে।

মর্গ্যান "গেন্‌স্" নামক ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করিয়া ইণ্ডিয়ানদের যৌন বা বিবাহ-কেন্দ্র বিবৃত করিয়াছেন। গ্রীক "গেনোস্" এবং ল্যাটিন গেন্‌স্ আর্য্য ধাতু গণ (জন) হইতে উৎপন্ন। গন (জন) ধাতুর অর্থ উৎপন্ন করা। গেনোস্, গেন্‌স্, সংস্কৃত "জন", গথিক "কুনি", প্রাচীন নর্স এবং অ্যাংলো স্যাক্সন্ "কিন", ইংরেজি "কিন", মিড্‌ল হাই জার্মান "ক্যিন্নে" এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি একরূপ। প্রত্যেক শব্দেই উৎপত্তি, বংশ ইত্যাদি বুঝায়। ল্যাটিন এবং গ্রীকশব্দের দ্বারা বিশেষভাবে এইরূপ এক যৌনকেন্দ্র বুঝান হইত যাহার লোকেরা কোনো এক পূর্ব্বপুরুষের সন্তান বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করিত। এই কেন্দ্রের নর নারীরা কতকগুলা ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি নীতি পালন করিয়া অন্যান্য কেন্দ্রের লোকজন হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যত্ন লইত। গেন্‌স্ এবং গেনোসের উৎপত্তি তত্ত্ব এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে মর্গ্যানের পূর্ব্বে ঐতিহাসিকেরা এক প্রকার অজ্ঞ ছিলেন। গেন্‌স্‌কে জাতি বা গোষ্ঠী ধরিয়া লইতেছি।

পুনালুয়া প্রথার পরিবার আলোচনা করিলে গেন্‌স্ সম্বন্ধে কতকগুলা মূলতথ্য পাওয়া যায়। এই প্রথায় পুনালুয়া অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের ভিতর পরস্পর বিবাহ চলিত। পুনালুয়ারা আপন মায়ের পেটের ভাই বোন নয়, নিকট আত্মীয় মাত্র। তখন ভাইয়ে বোনে বিবাহ নিষিদ্ধ।

সেই অবস্থায় বাপের নাম জানা ছিল না। মায়ের নামে চলিত পরিবার এবং বংশলতিকা। কোন জননীর বংশধরহিসাবে যে সকল নরনারী এক কেন্দ্র গড়িয়া তুলিত, তাহারাই হইত গেনসের লোক। মেয়েদের জন্য স্বামী আসিত অন্যান্য কেন্দ্র হইতে। কাজেই পৌত্র পৌত্রীরা গেন্‌সের লোক বিবেচিত হইত না। ইহারা অন্যান্য গেন্‌সের লোক। কিন্তু মেয়েদের সন্তানেরা নিজ গেন্‌সেরই ব্যক্তি বিবেচিত হইত।

(১) গোষ্ঠী শাসন

ইরোকোআ সমাজের সেনেকাজাতি আট গোষ্ঠী বা জাতিকেন্দ্রে বিভক্ত। প্রত্যেকের নাম আলাদা। জানোআরহিসাবে নামকরণ হয়। প্রথম জাতিকেন্দ্রের নাম নেকড়ে বাঘ, দ্বিতীয়ের নাম ভল্লুক, তৃতীয়ের নাম কচ্ছপ, চতুর্থের নাম বীভার (চতুষ্পদ উভচর জীব। ইঁদুর জাতীয় স্তন্য পায়ী। এ জানোআরের লোম পাশ্চাত্যেরা পোষাকে ব্যবহার করে।) অপর চারটা জানোআর বা গোষ্ঠীর নাম হরিন, স্নাইপ (লম্বা ঠোঁট ওয়ালা জলাশয় চারী পাখী) হেরণ (পাখী) এবং বাজ (পাখী)। প্রত্যেক গোষ্ঠিরই কতকগুলা স্বধর্ম্ম আছে।

প্রথমতঃ শান্তির সময় গোষ্ঠী কর্ত্তৃক "সাখেম" (নায়ক) বাছাই করা করা হয়। লড়াইয়ের সময়ও এক স্বতন্ত্র নেতা নির্ব্বাচিত হয়। সাখেম গোষ্ঠীরই একজন। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে এই পদ একপ্রকার বংশানুক্রমিক। কিন্তু লড়াইয়ের নায়ক

গোষ্ঠীর বাহির হইতে নির্ব্বাচিত করা সম্ভব। এই পদে অনেক সময় কোনো লোক বাহাল না থাকিলেও চলে, কিন্তু সাখেমের পদ কখনই খালি থাকিতে পারে না।

সাখেম বংশানুক্রমেই নির্ব্বাচিত হয় বটে। কিন্তু পুত্র তাহার পিতার গদিতে বসিতে পায় না। কেননা পুত্র তাহার জননীর গোষ্ঠির লোক। জননীবিধির নিয়মে ভাই কিম্বা ভাগ্‌নেই উত্তরাধিকারী।

মেয়ে পুরুষ উভয়েই সাখেম বাছাইয়ে ভোঁট দেয়। কিন্তু কোনো এক গোষ্ঠী একাকী তাহার গোষ্ঠী নায়ক নির্ব্বাচনে অধিকারী নয়। অপর সাত গোষ্ঠি মত দিলে তবে সাখেমের বাছাই ইরোকোআ ফেডারেশ্যন বা যুক্তরাষ্ট্রের বড় সভায় মঞ্জুর হয়।

সাখেমের একতিয়ার প্রধানতঃ নৈতিকধরনের। জোর জবরদস্তির কোনো সুযোগ তাঁহার তাঁবে নাই। সেনেকা জাতির সভায় তাঁহার ঠাই আছে। অধিকন্তু সর্ব্ব"জাতি" সমন্বিত গোটা ইরোকোআ রাষ্ট্রের ফেডার্যাল সভায়ও তাঁহার বসিবার ক্ষমতা আছে।

লড়াইয়ের নায়ক লড়াই ছাড়া অন্য কোনো অধিকার ভোগ করে না।

দ্বিতীয়তঃ, গোষ্ঠী যখন তখন খুসী অনুসারে দুই নায়ককেই বরখাস্ত করিতে পারে। মেয়ে পুরুষ উভয়েই একসঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করে। বরখাস্ত হইবার পর ইহারা সমাজে অন্যান্য পুরুষের মতন মামুলি যোদ্ধা অথবা অন্য কিছু রূপে জীবন চালাইতে থাকে। আর এক কথা, নরনারীদের মতের বিরুদ্ধেও "জাতি" সভা অর্থাৎ আটগোষ্ঠী সমন্বিত সেনেকা পরিষৎ কোনো গোষ্ঠীর নায়কদিগকে বরখাস্ত করিতে অধিকারী।

তৃতীয়তঃ গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধের বিধানই গোষ্ঠীর বন্ধন রজ্জু। নিয়মটা "নেতি"-মূলক বটে, কিন্তু এই "নিষেধাত্মক" নিয়মেই রক্ত সম্বন্ধের "অস্তিত্ব" সমাজের উপর তাহার ক্ষমতা দেখাইতেছে। ইহার জোরেই রক্তের টান অনুসারে জাতি-কেন্দ্র গড়িয়া উঠে।

এই তথ্যটা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মর্গ্যান যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে সাহেবজ এবং বার্ব্বার নরনারীদের বিবাহ প্রথা কোনো পর্য্যটক এবং গবেষকই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা এই সকল সমাজের বিভিন্ন কেন্দ্র সম্বন্ধে অস্পষ্ট এবং গোঁজ-মিলপূর্ণ বৃত্তান্ত দিয়াগিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিলেন এই সকল সমাজের কেন্দ্রগুলার ভিতর পরস্পর বিবাহ হয় না। কিন্তু এই তথ্যের অর্থ বুঝা কঠিন। স্কটল্যাণ্ডের নৃতত্ত্ববিৎ ম্যাকলেনান নেপোলিয়ানি যথেচ্ছাচারের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন।—"জাতিগুলা দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। এক শ্রেণীকে এক্‌সোগেমাস বলে। অর্থাৎ ইহার ভিতর পরস্পরবিবাহ নিষিদ্ধ। অপর শ্রেণীকে এণ্ডোগেমাস বলে। এখানে কেন্দ্রের ভিতরকার নরনারী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়।"

এই ধরণের হ-য-ব-র-ল সৃষ্টি করিয়া ম্যাকলেনান আর এক অদ্ভুত আবিষ্কারে মাতিয়া গিয়াছিলেন। এক্‌সোগেমি (বা বহির্ব্বিবাহ) পুরাণা কি এণ্ডোগেমি (অর্থাৎ অন্তর্ব্বিবাহ) পুরাণা এই আলোচনায় তাঁহার দিন কাটিয়াছে। রক্তসংশ্রবের জোরে গোষ্ঠী কায়েম হয়, সুতরাং গোষ্ঠীর ভিতর নরনারীর বিবাহ অসম্ভব, মর্গ্যান যেই এই তথ্য আবিষ্কার করিলেন

তখনই ম্যাক্লেনানের অদ্ভুত মতগুলা চাপা পড়িয়া গেল। ইরোকোআদের ভিতর নিষেধ বিধানটা বেশ জারি।

চতুর্থতঃ, লোক মারা পড়িলে তাহাদের সম্পত্তি গোষ্ঠীর অন্যান্য ব্যক্তির হাতে আসে। গোষ্ঠীর বাহিরের কেহ এই ধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। পুরুষের উত্তরাধিকারী হয় ভাই, বোন এবং মামারা। মেয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিজ ছেলেপুলে এবং বোন, কিন্তু ভাইয়েরা নয়। স্বামীর ধনে স্ত্রীর অধিকার নাই, স্ত্রীর ধনেও স্বামীর অধিকার নাই। আবার ছেলেপুলেরা জনকের সম্পত্তি ভোগ করিতে অধিকারী নয়।

পঞ্চমতঃ, গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য, বিশেষতঃ কোনো বিদেশী যদি তাহাদের কোনো এক জনের লোকসান করে তাহা হইলে গোটা গোষ্ঠী প্রতিহিংসার ধর্ম্মে মাতিয়া উঠে। লোকসানমাত্রই গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত নয়। গোটা ইরোকোআ সমাজে রক্তহিংসা সুপ্রচলিত। বিদেশীর হাতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে গোষ্ঠী সেই বিদেশীর প্রাণ সংহার করিতে অধিকারী। যদি দোষী ব্যক্তির গোষ্ঠী আপোসে মাপ চায় অথবা ক্ষতিপূরণ করিতে রাজি হয়, তাহা হইলে কোনো কোনো সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী তাহাতেই সুখী হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে শান্ত না হইলে গোষ্ঠী এক বা একাধিক লোক বাহাল করিয়া সেই দোষীকে যমালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে। যদি দোষী এই উপায়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহার গোষ্ঠী হইতে কোনো নালিশ চলিতে পারে না। খুনের সাজা খুন,—এই নীতি সকল গোষ্ঠীই মানিয়া থাকে।

ষষ্ঠতঃ, প্রত্যেক গোষ্ঠীরই কতকগুলা বাঁধা নাম আছে। এই নামকরণ একচেটিয়া। অর্থাৎ অন্যান্য গোষ্ঠীতে কোনো ব্যক্তি এই সকল নামে পরিচিত হইতে পারে না। কাজেই একটা নাম শুনিবামাত্র তাহার "গুষ্টির খবর" বলিয়া দেওয়া সম্ভব। নামের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা দাবীদাওয়াও গোষ্ঠীগত।

সপ্তমতঃ, বিদেশীকে নিজের করিয়া লওয়া গোষ্ঠীর এক্তিয়ারের অন্তর্গত। একবার কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইলে বিদেশীরা গোটা জাতির লোকই বিবেচিত হয়। লড়াইয়ের বন্দী সকলকেই খুন করা হয় না। যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারা এই প্রণালীতে গোষ্ঠীর পোষ্যপুত্রবিশেষ। এই ধরণের বহু পোষ্য সেনেকা জাতির অন্তর্গত হিসাবে গোষ্ঠীর এক্তিয়ার ভোগ করে। পোষ্যগ্রহণ করিবার জন্য গোষ্ঠীর কোনো লোককে বলিতে হয়;—"আমি অমুককে ভাই বা বোন বলিয়া গ্রহণ করিলাম।" মেয়েরা পোষ্যগ্রহণ করিবার সময় বলে;—"অমুক বিদেশী আজ হইতে আমার সন্তান।" পোষ্যগ্রহণ কাণ্ড একটা বড় গোছের ঘটাসমন্বিত উৎসববিশেষ। গোষ্ঠীতে লোক কমিতে থাকিলে এই উপায়েই লোকসংখ্যা বাড়ানো হইয়া থাকে। এক গোষ্ঠী হইতে অপর গোষ্ঠীতে পোষ্য লওয়ার রেওয়াজ অনেক দেখা গিয়াছে। ইরোকোআদের ভিতর জাতি সভার প্রকাশ্য বৈঠকে ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত "পোষ্যযজ্ঞ" অনুষ্ঠিত হয়।

অষ্টমতঃ, ধর্ম্মকর্ম্ম নামে কতকগুলি স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান ইণ্ডিয়ান সমাজে দেখা যায় না। গোষ্ঠীর সংস্রবেই ইহাদের ধর্ম্মোৎসবজাতীয় সকল কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে

সাখেম এবং লড়াইনায়ক পুরোহিতের কাজ করে। ইহাদিগকে তখন ধর্ম্মরক্ষক বলা হয়। বৎসরে ছয়টা মহোৎসব ইরোকোআদের পঞ্জিকায় ঠাঁই পাইয়াছে।

নবমতঃ, প্রত্যেক গোষ্ঠীর এক একটা সার্ব্বজনিক কবরের ঠাঁই আছে। নিউইয়র্ক প্রদেশে শ্বেতাঙ্গ নরনারীরা ইরোকোআদের সকল জায়গাই অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কাজেই আজকাল আর ইহাদের স্বতন্ত্র গোরস্থান দেখা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। ইরোকোআদের নিকটআত্মীয় তুস্কারোরা এবং অন্যান্য সমাজে আজও গোষ্ঠীগত সার্ব্বজনিক কবর দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল ইহারা খ্রীষ্টধর্ম্মে পরিণত। তথাপি গোরস্থানের ভিতর প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য নিজ নিজ কবরের সারি নির্দ্দিষ্ট আছে। জননীকে তাহার সন্তান সন্ততির সারিতেই কবর দেওয়া হয়। কিন্তু জনকের ঠাঁই অন্যত্র। ইরোকোআ সমাজে গোটা গোষ্ঠী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য করে।

দশমতঃ, প্রত্যেক গোষ্ঠীর একটা করিয়া সভা বা পরিষৎ থাকে। প্রবীণবয়সের যে কোনো পুরুষ এবং নারী এই সভায় বসিতে পারে। প্রত্যেকের অধিকারও সমান। সাখেম, লড়াই-নায়ক এবং ধর্ম্মরক্ষক তিনজাতীয় কর্ম্মচারী বাছাই করা গোষ্ঠী সভার কাজ। প্রতিহিংসা লওয়া এবং পোষ্যগ্রহণ করাও এই সভায় আলোচিত হয়। গোষ্ঠীর সকলকাজেই সভার কর্ত্তৃত্ব বিরাজমান।

এই দশ দফা হইতে বেশ বুঝা যায় কেন মর্গ্যান ইণ্ডিয়ান সমাজকে সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল বিবেচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের সমান। সাখেম ইত্যাদি নায়কেরাও কোনো বিষয়ে "হাতীঘোড়া" নয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বাধীনতার সহায় এবং সংরক্ষক।

গোষ্ঠী যখন এই রূপ ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যের নিয়মে গঠিত, তখন গোষ্ঠী সমন্বিত "জাতি" এবং জাতি সমন্বিত "ফেডারেশন' ও সাম্যমূলক গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাদিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মর্গ্যান গোষ্ঠীর স্বধর্ম্মগুলা আলোচনা করিতে গিয়াই ইরোকোআ এবং অন্যান্য সমাজের "যুক্তরাষ্ট্রের" বনিয়াদ ধরিতে পারিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান সমাজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মকর্ত্তৃত্বের গোড়ার কথা গোষ্ঠীর জীবন।

উত্তর আমেরিকা যে সময় ইয়োরোপের আবিষ্কারে আসে, তখন সেখানকার সকল অধিবাসীই জননীবিধির নিয়মে গোষ্ঠীর বিধানে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। কেবল মাত্র ডাকোটা সমাজে গোষ্ঠী প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু ওজি বাওয়া, ওমাহা এবং যুকাটানের মায়া সমাজে মেয়ের ঠাঁয়ে পুরুষের উত্তরাধিকার দেখা দিয়াছিল।

(২) ফ্রাত্রী

কোনো কোনো "জাতি" পাঁচ ছয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। ইহাদের তিন, চার বা পাঁচটায় মিলিয়া একটা সমাজকেন্দ্র গড়িয়া তুলিত। এই ধরণের গোষ্ঠী সমবায়কে মর্গ্যান প্রাচীন গ্রীক প্রথার অনুরূপ বিবেচনা করিয়াছেন। এই গোষ্ঠী সমবায়কে ইনি গ্রীক "ফ্রাত্রী" শব্দেই অভিহিতও করিয়াছেন। ইরোকোআদের সেনেকা জাতির আট গোষ্ঠী। এই আট গোষ্ঠি দুই ফ্রাত্রীর অন্তর্গত। প্রত্যেক ফ্রাত্রীতে চারটা করিয়া গোষ্ঠি ছিল।

এই ফ্রাত্রীগুলার উৎপত্তি হইল কি করিয়া? সাবেক কালে ফ্রাত্রী স্বয়ংই একটা সম্পূর্ণ জাতি বিবেচিত হইত। প্রত্যেক ফ্রাত্রীতে অন্ততঃ দুইটা করিয়া গোষ্ঠী থাকা আবশ্যক হইত কেননা তাহা না হইলে বিবাহের বরকন্যা জুটিত না। মনে রাখিতে হইবে যে গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ

জাতিটা লোকসংখ্যায় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীও দুই বা ততোধিক টুকরায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তখন এক একটা সাবেক গোষ্ঠী ফ্রাত্রীতে পরিণত হইত। ফ্রাত্রীর সঙ্গে গোষ্ঠীর রক্তসম্বন্ধ অতি নিকট।

সেনেকা এবং অন্যান্য ইণ্ডিয়ান সমাজে ফ্রাত্রীর অন্তর্গত গোষ্ঠীগুলা পরস্পর ভাই স্বরূপ। অপরাপর ফ্রাত্রীর গোষ্ঠীর সঙ্গে এই সব গোষ্ঠীর সম্বন্ধ খুড়তত ভাইয়ের মতন। এই কারণে প্রথম প্রথম সেনেকারা ফ্রাত্রীর ভিতর বিবাহের আদান প্রদান নিষিদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু পরে একমাত্র গোষ্ঠীর ভিতর এই নিষেধ আবদ্ধ করা হইরাছে।

ভল্লুক এবং হরিণ এই দুই গোষ্ঠীকে সেনেকারা সর্ব্ব প্রাচীন বিবেচনা করে। ইহাদের লোকপরম্পরা অনুসারে অন্যান্য গোষ্ঠী এই দুই গোষ্ঠী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

গোষ্ঠীগুলা কোনো কোনো সময় "নিব্বংশ"ও হইয়াছে। তখন কোন ফ্রাত্রী হইতে একটা গোটা গোষ্ঠী আসিয়া তাহার ঠাঁই পূরণ করিয়াছে। এই কারণে গোষ্ঠীর নাম দেখিয়া অতি সহজে তাহার সঙ্গে ফ্রাত্রীগুলার এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সম্বন্ধ বুঝা যায় না। সর্ব্বত্রই কিছু কিছু জটিলতা সৃষ্ট হইয়াছে।

ইরোকোআদের ফ্রাত্রীকে কোনো কোনো বিষয়ে সমাজকেন্দ্র বিবেচনা করিতে হইবে। ধর্ম্ম-কেন্দ্র রূপেও ইহার কাজকর্ম্ম লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

১। বল খেলার বেলায় ফ্রাত্রীতে ফ্রাত্রীতে টক্কর চলে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সেরা খেলোআড় পাঠায়। দুই দলের অন্যান্য লোকেরা দুই দিকে দাঁড়াইয়া নিজ নিজ খেলোআড়-দিগকে উৎসাহিত করে। খেলার উপর বাজিও চলে।

২। "জাতি"-সভায় প্রত্যেক ফ্রাত্রীর সাখেম এবং লড়াই-নায়কেরা পরস্পর উল্টাদিকে মুখামুখি হইয়া বসে। বক্তারা দুইদিকে ফিরিয়া দুই স্বতন্ত্র দলের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়া থাকে।

৩। কোনো লোক খুন হইলে গোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ফ্রাত্রীর অন্যান্য গোষ্ঠীর নিকট আবেদন করে। ফ্রাত্রী বৈঠক ডাকিয়া শল্লা করে। পরে খুনীর ফ্রাত্রীকে ক্ষতিপূরণের জন্য তলব করা হয়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বাদানুবাদ চলে না। ফ্রাত্রীতে ফ্রাত্রীতে মামলা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হয়। এই ক্ষেত্রে ফ্রাত্রীকে সাবেক কালের "জাতির" জেরই বিবেচনা করা উচিত।

৪। গোষ্ঠীতে কোনো নামজাদা লোক মারা পড়িলে নিজ ফ্রাত্রীর নর নারীরা শোকের ভার বহন করে মাত্র। কিন্তু কবর দেওয়া এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অন্যান্য কাজের জন্য জাতির অপর ফ্রাত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করে। সাখেমের মৃত্যু হইলে জাতিকে এবং ইরোকোআ যুক্তরাষ্ট্রের সভাকে খবর দেওয়ার ভারও এই অপর ফ্রাত্রীর হাতে।

৫। সাখেম নির্ব্বাচনের বেলায়ও একমাত্র নিজ ফ্রাত্রীর মতামতই চরম নয়। অপর ফ্রাত্রী আপত্তি করিলে বাছাই বন্দ হইতে পারে।

৬। ধর্মকর্মের কাণ্ডেও প্রত্যেক ফ্রাত্রী নিজস্ব রক্ষা করিয়া চলে। সেনেকা সমাজে ধর্ম্ম লইয়া কিছু কিছু গুহ্য কারবার আছে এই সকল কারবার দুই সমিতির অধীনে পরিচালিত। হয়। যে সে লোক এই সব সমিতিতে ঠাঁই পায় না। নানা প্রকার তুকমুকের চল আছে। তদনুসারে সভ্য বাছাই হয়। কিন্তু প্রত্যেক ফ্রাত্রী এক একটা সমিতির অধিকারী। সেনেকাদের আট গোষ্ঠীর দুই ফ্রাত্রীর জন্য দুই সমিতি আছে।

৭। লোস্কালার চার কোণে চার বংশ দিক রক্ষার ভার লইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় এই রীতি দেখা গিয়াছে। এই চার বংশকে যদি চার ফ্রাত্রী বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে গ্রীকসমাজের মতন ইণ্ডিয়ানসমাজেও ফ্রাত্রী ছিল সামরিক জীবনের কেন্দ্র। জার্ম্মাণ সমাজেও এই ধরণের সামরিক কেন্দ্র ছিল। প্রত্যেক বংশই নিজ পোষাকে সাজিয়া, নিজ নিশান লইয়া স্বতন্ত্র দলে লড়িতে যাইত। প্রত্যেকের নায়কও ছিল স্বতন্ত্র।

৩। জাতি

একাধিক গোষ্ঠীর মিলনে হয় ফ্রাত্রী। সেইরূপ একাধিক ফ্রাত্রীর সমবায়ে "ট্রাইব" বা জাতি গড়িয়া উঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে,—বিশেষতঃ যেখানে লোক সংখ্যা নেহাৎ কমিয়া আসিয়াছে,—মধ্যের কেন্দ্রটা অর্থাৎ ফ্রাত্রী আজকাল আর দেখা যায় না।

ইণ্ডিয়ান সমাজে ট্রাইব (জাতি) কাহাকে বলিব ? প্রত্যেক গোষ্ঠী এবং ফ্রাত্রীর মতন প্রত্যেক জাতিরও কতকগুলা "সামান্য লক্ষণ" আছে। এইগুলিকে জাতির স্বধর্ম্মের অন্তর্গত বিবেচনা করিতে হইবে।

১। প্রত্যেকজাতি একটা স্বতন্ত্র জনপদের অধিকারী। ইহার একটা বিশিষ্ট নামও আছে। জনপদ সুবিস্তৃত। শিকার এবং মাছধরার সুযোগও জমিজমার অন্তর্গত। জাতিগত জনপদ বা "দেশের" লাগা জমিন কাহারও সম্পত্তি নয়। এই "খোলা মাঠের" সাহায্যে পরবর্ত্তী জাতি হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হয়। অনধিকৃত "উদাসীনীকৃত" জমিনটার আয়তন কখনও ছোট, কখনও বা বেশ বড়। জাত দুইটা যদি ভাষায় লাগালাগি হয়, তাহা হইলে অল্প মাত্র "খোলামাঠের" রেওয়াজ থাকে। কিন্তু এই দুয়ের ভাষায় যদি কোনো প্রকার সংস্রব না থাকে তাহা হইলে উদাসীন জমিনের বিস্তৃতি খুব বেশী।

ইণ্ডিয়ান সমাজের এই জাতি বা দেশ পার্থক্যের নিয়ম প্রাচীন জার্ম্মাণ সমাজেও দেখাগিয়াছে। বনভূমিগুলা ছিল জার্ম্মাণদের সীমানা বিশেষ। সীজার বলেন সুয়েভিরা তাহাদের স্বদেশকে মরুভূমি দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। ডেনিশ এবং জার্ম্মাণ জাতি দ্বয়ের পার্থক্য সাধিত হইত "ইজার্ণহোল্ট" এর দ্বারা। ডেনিশ ভাষায় ইহাকে "য়ার্ণবেড" বলে। স্যাক্সনদের সীমানা ছিল "জাক্সেন হ্বাল্ড" (স্যাকসন বন)। শ্লাভজাতি হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য জার্ম্মাণরা "ব্রাণিবর" কায়েম করিয়াছিল। এই শ্লাভ শব্দ আজকালকার ব্রাণ্ডেনবুর্গ প্রদেশের মূলে দেখিতে পাইতেছি।

এই ধরণের সীমানার ভিতরকার সকল জমিজমা জাতির সমবেত সম্পত্তি। অন্যান্য

জাতিরা সেই জাতির অধিকার স্বীকার করিয়া চলে। এই ভূমি অন্যান্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। লোকসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে না বাড়া পর্য্যন্ত স্বভূমির সীমানা কাঠায় বিঘায় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও চলে কিন্তু চৌহদ্দি নির্দ্দেশ করার দরকার লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়ই হয়।

জাতিগুলার নামকরণ কেন হয় বলা কঠিন। নরনারীরা নিজে বাছিয়া একটা নাম গ্রহণ করে কিনা সন্দেহ। নাম একটা আকস্মিক অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনাবিশেষ। কোন কোন সময়ে নিজেরা হয়ত একটা নাম বাছিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতিবেশী জাতি তাহাকে অন্য এক নামে ডাকে। জার্ম্মাণদের নামও তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী কেল্টজাতির দেওয়া।

২। প্রত্যেক জাতির একটা করিয়া স্বতন্ত্র ভাষা আছে। ভাষা এবং জাতি আয়তনে সমবিস্তৃত। যতদূর স্বভাষা, ততদূর স্বজাতি। আমেরিকার পুরাণা ভাষা ভাঙিয়া নয়া নয়া ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নয়া নয়া জাতিও দেখা দিয়াছে। এই রূপে নব নব ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নয়া নয়া জাতিও দেখা দিয়াছে। এইরূপে নব নব ভাষা ও জাতির উৎপত্তি আজও চলিতেছে। কখনো কখনো দুই দুর্ব্বল জাতি সম্মিলিত হইয়া একটা জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে। এই ব্যবস্থায় উভয়েই নিজ নিজ ভাষার ব্যবহার রক্ষা করিতে ছাড়ে নাই। গড়পড়তা ২০০০ হাজার নরনারী এক একটা ইণ্ডিয়ান ভাষায় কথা বলে। অর্থাৎ এতগুলা লোক এক একটা জাতির অন্তর্গত। চেরোকীরা গুনতিতে ২৬০০০। অন্য কোনো ভাষাভাষীর সংখ্যা এত বেশী নয়।

৩। প্রত্যেক জাতি নিজ ফ্রাত্রীর অনুমোদিত এবং গোষ্ঠীর নির্ব্বাচিত সাখেম এবং লড়াই-নায়ককে প্রকাশ্য সভায় গদিতে বসাইবার অধিকারী।

৪। গোষ্ঠীর মতের বিরুদ্ধেও জাতি ইচ্ছা করিলে এই নায়কগণকে বরখাস্ত করিতেও পারে। গোষ্ঠী নায়কেরা সকলেই জাতি-সভার সভ্য। কাজেই তাহাদের উপর জাতির একতিয়ার থাকা অস্বাভাবিক নয়। জাতিগুলা আবার এক বৃহত্তর কেন্দ্রের-ফেডারেশ্যনের অন্তর্গত। কাজেই ফেডারল সভাও ইচ্ছা করিলে গোষ্ঠীনায়কগণকে বরখাস্ত করিতে পারে।

৫। প্রত্যেক জাতি কতকগুলা সার্ব্বজনিক ধর্ম্মকর্ম্ম মানিয়া চলে। অন্যান্য বার্ব্বারদের মতনই ইণ্ডিয়ানরাও ধার্ম্মিক জাতি। তাহাদের দেবদেবী-তত্ত্ব এবং রীতিনীতিগুলা সম্বন্ধে সবে মাত্র গবেষণা সুরু হইয়াছে। মানুষের আকারে তাহারা দেবদেবীর কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিমা গড়িবার যুগ পর্য্যন্ত ইহারা উঠিতে পারে নাই। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের আরাধনা তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ার কথা। সর্ব্বভূতে ঐশীশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিবার পথে ইহারা ধাপে ধাপে উঠিতেছে। নাচ গান খেলাধূলা সমন্বিত মহোচ্ছবের সঙ্গে প্রত্যেক জাতি ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত। নাচ এই সকল পালা পার্ব্বণের বিশেষত্ব। ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রত্যেক জাতি নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে।

৬। সার্ব্বজনিক কাজকর্ম্ম চালাইবার জন্য প্রত্যেক জাতির একটা করিয়া সভা থাকে। এই সভায় বসে জাতির অন্তর্গত গোষ্ঠীনায়কেরা। ইহারাই খাঁটি প্রতিনিধি,—কেন না

ইহাদিগকে যখন তখন বরখাস্ত করা সম্ভব। সভার কাজকর্ম্ম চলে খোলা বাজারে। অর্থাৎ জাতির যে কোনো লোক—মেয়েরাও—সভায় উপস্থিত হইয়া আলোচনায় যোগ দিতে অধিকারী। কিন্তু বিচার এবং ব্যবস্থা করিবার একতিয়ার এক মাত্র সভারই। প্রত্যেক বিধান "সর্ব্বসম্মতি" ক্রমে জারি হওয়া চাই। জার্ম্মাণদের মার্ক সভায়ও এইরূপ সর্ব্বসম্মতির নিয়ম ছিল। "বিদেশী" অর্থাৎ অন্যান্য জাতির সঙ্গে—"পররাষ্ট্র" বিষয়ে সভার কাজগুলা প্রধান ঠাঁই অধিকার করে। বিদেশীদের দূত গ্রহণ করা এবং লড়াই বা সন্ধি ঘোষণা করাও সভার কাজ। স্বেচ্ছা-সেবকরাই লড়াইয়ের প্রধান ফৌজ।

যে যে জাতির সঙ্গে মিত্রভাব সন্ধি কায়েম হয় নাই, তাহাদের সঙ্গে জাতিমাত্রেরই লড়াইয়ের নীতি চলিতে পারে। এই ধরণের শত্রুদের বিরুদ্ধে নামজাদা যোদ্ধারা লড়াইয়ের কাজকর্ম্মে ভার লয়। পল্টনে সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য ইহারা লড়াইয়ের নাচ সুরু করিয়া দেয়। যে যে এই নাচে যোগ দেয় তাহারাই স্বেচ্ছাসেবক। যাঁহা নাচে যোগ, তাঁহা দলগঠন এবং রণযাত্রা। অপরপক্ষেও স্বয়ংসেবকেরাই স্বদেশরক্ষার ভার লয়। লড়াইয়ের যাত্রার সময় এবং লড়াই হইতে ফিরিবার সময় দেশ সুদ্ধ, হৈ হৈ রৈ রৈ এবং মহোচ্ছোব চলে।

এমন কি জাতিসভার অনুমতি না লইয়াই স্বয়ংসেবকেরা এই ধরণের লড়াই বাধাইতে পারে। ট্যাসিটাসবিবৃত জার্ম্মাণ সমাজেও এই ধরণের স্বয়ংসেবকনিয়ন্ত্রিত লড়াইয়ের নিয়ম দেখিতে পাই। কিন্তু জার্ম্মাণদের ভিতর স্বয়ংসেবকের দল স্থায়ী সংগঠনের আকার গ্রহণ করিয়াছিল। শান্তির সময়ও এই দল বজায় থাকিত।

বিপুল সেনাবাহিনী এই বিধানে দেখা যায় না। দূরদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উপলক্ষেও ইণ্ডিয়ানরা অল্পসংখ্যক ফৌজের দলই কায়েম করিতে অভ্যস্ত। প্রত্যেক দল নিজ নিজ নেতার হুকুম তামিল করে। এই সকল নেতারা একত্রে মিলিয়া রণনীতি এবং লড়াইয়ের কৌশল সম্বন্ধে শলা করে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দক্ষিণ রাইণের আলেমানি জার্ম্মাণরাও এই প্রণালীতেই লড়াইয়ের ব্যবস্থা করিত।

৭। কোনো কোনো জাতির মাথায় একজন নায়ক দেখিতে পাই। তাঁহার ক্ষমতা অবশ্য যথেষ্ট সঙ্কুচিত। সাধারণতঃ এই ব্যক্তি অন্যতম সাখেম। জাতিসভা বসিয়া ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই জাতি-নায়ক কাজ সামলাইতে অধিকারী। মোটের উপর ইঁহাকে স্থায়ী কর্ম্মাধ্যক্ষ বিবেচনা করা বলিতে পারে। উচ্চতম লড়াই-নায়কই পরবর্ত্তী কালে স্থায়ী কর্ম্মাধ্যক্ষে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

ভ্রমসংশোধন

যুগ সমস্যা প্রবন্ধে ৬৫ পৃষ্ঠায় ১১ ও ১২ লাইনে "এই যে কোনপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষবাদ সেটা এই যুগের বিশিষ্টলক্ষণ," ইহার স্থলে কোমতপ্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি হইবে।

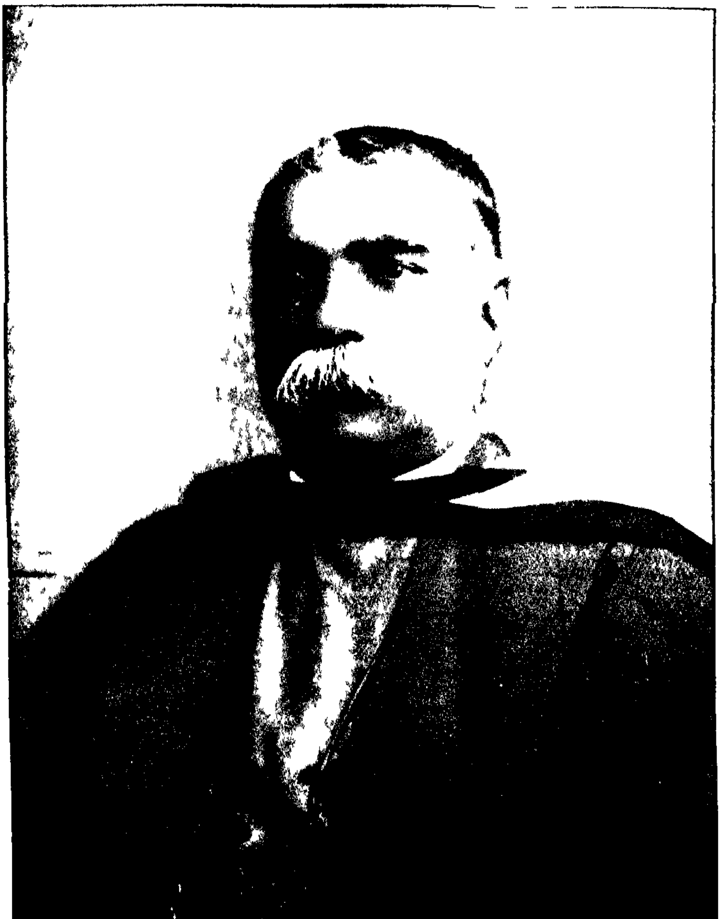

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী

U Ray & Sons Calcutta

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] আষাঢ়, ১৩৩১ [৩য় সংখ্যা

যোগদর্শনের চিত্ত

সাংখ্য ও যোগ এক পর্য্যায়ের দর্শন। কারণ, দেখা যায় যে, পাতঞ্জল দর্শনে কাপিল দর্শনের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব অঙ্গীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে।

সাংখ্যাচার্য্যেরা এই বৈচিত্র্যময় বিবিধ বিশ্বের বিশ্লেষণ ও সমূহন করিয়া এক চরম দ্বৈতে উপনীত হইয়াছেন। সে মহাদ্বৈত—পুরুষ ও প্রকৃতি। যোগদর্শনের ভাষায় পুরুষের নাম দ্রষ্টা (subject—বিষয়ী) এবং প্রকৃতির নাম দৃশ্য (object=বিষয়)। পুরুষ কেবল অমল, অসঙ্গ, অপরিণামী, নিষ্ক্রিয়, নিরীহ, নির্গুণ, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ।

আর দৃশ্য ?

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ২।১৮ ॥

---

* সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্ব কি কি ?

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি র্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।

ষোড়শকস্তুবিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ—সাংখ্যকারিকা, ৩।

যিনি প্রকৃতিও নন, বিকৃতিও নন, সেই পুরুষ ব্যতীত প্রধান বা মূল প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব ও পঞ্চ তন্মাত্র—এই সপ্ত প্রকৃতি—বিকৃতি এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূত—এই ষোড়শ বিকার পতঞ্জলি এই ২৪ তত্ত্বের বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন—

বিশেষাঽবিশেষ লিঙ্গমাত্রা—লিঙ্গানি গুণ পর্ব্বানি

অলিঙ্গ (মূল প্রকৃতি), লিঙ্গমাত্র (মহৎতত্ত্ব) অবিশেষ (অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র) এবং বিশেষ (ষোড়শবিকার)—ত্রৈগুণ্য বা প্রকৃতির এই চারি পর্ব্ব।

সেই জন্য ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যমতের নিরাস করিয়া সূত্রকার লিখিয়াছেন

অনেনযোগঃ প্রত্যুক্তঃ অর্থাৎ ইহার দ্বারায় যোগদর্শনও নিরাকৃত হইল। এরূপ বলার তাৎপর্য্য, এই যে যোগদর্শনে যখন সাংখ্যোক্ত পদার্থাবলীই স্বীকৃত হইয়াছে, তখন সাংখ্য নিরাস দ্বারাই পাতঞ্জলও নিরাকৃত হইল। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যা ইত্যাতি দিশতি তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহদাদীনিচ কার্য্যাণি অলোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যন্তে।

সত্ত্ব প্রকাশশীল, রজঃ ক্রিয়াশীল এবং তমঃ স্থিতিশীল। অতএব পাতঞ্জল দর্শনের দৃশ্য সাংখ্যের প্রধানশব্দবাচ্য ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ; এতেঃ গুণা পরস্পরোপরক্ত প্রবিভাগাঃ পরিণামিনঃ * * প্রধানশব্দবাচ্যা ভবন্তি। এতদ্দৃশ্যমিত্যুচ্যতে—ব্যাসভাষ্য।

এই দৃশ্য বা প্রকৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়াত্মক—কারণ, প্রকৃতির বিকারদ্বারাই বাহ্যবস্তু (objects) ও ইন্দ্রিয়াদি গঠিত।

এই প্রকৃতির পরিচয়স্থলে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানম্—কারিকা ১১।

[বিষয়ঃ = গ্রাহ্যঃ (objects)
সামান্যং = সাধারণং ঘটাদিবৎ অনেকপুরুষৈঃ গৃহীতং—বাচস্পতি]

অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক, অবিবেকী, বিষয় (দৃশ্য), সামান্য (Common —সাধারণ) জড় ও পরিণামী।

অন্যত্র, সাংখ্যাচার্য্যেরা প্রকৃতির পরিচয়স্থলে এই দুইটি প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

সূক্ষ্মমলিঙ্গম্ অনাদিনিধনং তথা প্রসবধর্ম্মি।
নিরবয়বমেকমেবহি সাধারণমেতদ্ অব্যক্তং ॥
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাচ নিত্যং রসগন্ধবর্জ্জিতং
অনাদিমধ্যং মহতঃ পরং ধ্রুবং
প্রধানমেতৎ প্রবদন্তি সূরয়ঃ ॥

অর্থাৎ প্রকৃতি সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ, অনাদিনিধন, পরিণামী, নিরবয়ব, এক ও সাধারণ। প্রকৃতি নিত্য, অব্যয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, আদি-ও মধ্যহীন, মহতের পর এবং ধ্রুব।

এই পুরুষ ও প্রকৃতি—দ্রষ্ট ও দৃশ্যরূপ মহাদ্বৈতের মধ্যে চিত্ত কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত ?

আমরা দেখিয়াছি সাংখ্যাচার্য্যেরা পুরুষকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপ বলিয়াছেন। পতঞ্জলিরও এই মত। তিনি বলেন—

"দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।—২।২০ ॥ সূত্র।

অর্থাৎ দ্রষ্টা বা পুরুষ চিন্মাত্র এবং শুদ্ধ বা কেবল। শুদ্ধ অর্থে বিশেষণাপরামৃষ্টঃ [বিশেষণানি ধর্ম্মাঃ তৈঃ অপরামৃষ্টঃ—বাচস্পতি] অতএব নির্গুণ। চিত্ত কিন্তু ত্রিগুণাত্মক—

চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণম্। চিত্ত যখন ত্রিগুণাত্মক তখন ইহা নিশ্চয়ই প্রকৃতির পর্য্যায়ভুক্ত। প্রকৃতি প্রসবধর্ম্মী অর্থাৎ নিয়ত পরিণামশীল। চিত্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ইহারও সর্ব্বদাই পরিণাম ঘটিতেছে।

চলঞ্চ গুণবৃত্তম ইতি ক্ষিপ্র পরিণামি চিত্তমুক্তং। ব্যাসভাষ্য।

অন্যত্র ব্যাসভাষ্যে উক্ত হইয়াছে :—

খ্যাতিপর্য্যবসানং হি চিত্তচেষ্টিতমিতি। ১।৫০॥

পরিণাম কি ? ইহার উত্তরে ব্যাসভাষ্য বলিতেছেন :—

অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্ব ধর্ম্মনিবৃত্তৌ

ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ—২।১৩।, ব্যাসভাষ্য।

এই পরিণামের সন্তান বা ধারাকে যোগদর্শনে "ক্রম" বলা হইয়াছে। কালের যে 'লব' বা সু-সূক্ষ্ম অংশ তাহার নাম ক্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির এবং প্রকৃতির বিকার চিত্তের পরিণাম ঘটিতেছে।

ক্ষণ প্রতিযোগী পরিণামাপরান্ত নির্গ্রাহ্যঃ ক্রম ॥—॥৪।৩৩॥

চিত্ত যখন প্রকৃতির পর্য্যায়ভুক্ত তখন ইহা চেতন বা স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। তাই পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন :—

নতৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ—৪।১১

সাংখ্যমতে পুরুষ এক নহে—বহু। প্রত্যেক পুরুষ এক একটি চিত্তের সহিত অনাদি কাল হইতে সংযুক্ত আছে।

চিত্ত পুরুষয়োঃ অনাদি স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধঃ। বিজ্ঞানভিক্ষু।

বাচস্পতিও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন :—

অনাদিত্বাচ্চ সংযোগপরম্পরায়াঃ।

এই সম্পর্কে যোগদর্শনের উপদেশ এই :—

তাসামনাদিত্বং আশিষো নিত্যত্বাৎ ৪।১০। যোগসূত্র।

ইহার উপর ব্যাসভাষ্য এইরূপ—

অনাদিবাসনানুবিদ্ধম্ ইদং চিত্তং নিমিত্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনাঃ প্রতিলভ্য পুরুষস্য ভোগায় উপাবর্ত্ততে।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভাষায়—পুরুষেণ সংসৃষ্টা ইয়মনাদিকালপ্রবৃত্তা ক্ষেত্রাকারপরিণতা প্রকৃতিঃ অর্থাৎ চিত্তাকারে পরিণত প্রকৃতির এক খণ্ড বা ভগ্নাংশকে পুরুষ অনাদি কাল হইতে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন—পুরুষ স্বামী—এই চিত্ত তাহার স্ব। *

আমরা দেখিলাম যে, এই চিত্ত যখন প্রকৃতির উপাদানে গঠিত, তখন ইহা নিশ্চয়ই জড় বা অচেতন। কিন্তু যেহেতু ইহার সহিত চিন্ময় পুরুষের অনাদি সংযোগ সিদ্ধ সম্বন্ধ, অতএব জড় হইলেও চিত্তকে সর্ব্বদাই সচেতন মনে হয়। ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

তস্মাৎ তৎ সংযোগাদ্ অচেতনং চেতনাবদ্ ইব লিঙ্গম্—কারিকা, ২০

এবং মহদাদি লিঙ্গং পুরুষসংযোগাৎ চেতনাবদ্ ইব ভবতি—গৌড়পাদ

[লিঙ্গ—সান্তঃকরণাবুদ্ধি বা চিত্ত]

সেইজন্য বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন—বুদ্ধেশ্চ যা চিন্তা সা পুরুষসান্নিধ্যাৎ।

চিত্ত বা বুদ্ধির এই যে চিন্তা তাহা চিৎ বা পুরুষের সান্নিধ্যজনিত।

সাংখ্যসূত্র এই মর্ম্মে বলিয়াছেন :—

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাৎ লোহবৎ অধিষ্ঠাতৃত্বম্—১।৯৯ সূত্র।

* সাংখ্যযোগসমগ্র প্রবাদাঃ "স্ব" সংজ্ঞেন পুরুষামেক স্বামিনং চিত্তস্য ভাক্তারম উপবদন্তি ৪।২১—সূত্রের ভাষ্য।

অন্তঃকরণং হি তপ্তলোহবৎ চেতনোজ্জ্বলিতং ভবতি।

অতস্তস্য চেতনায়-মানতয়া অধিষ্ঠাতৃত্বম্—বিজ্ঞানভিক্ষু।

"যেমন অগ্নির সংস্পর্শে লৌহের উষ্ণত্ব, সেইরূপ চিৎসংস্পর্শে চিত্ত বা অন্তঃকরণের চেতনত্ব। সেই জন্যই চিত্ত (অন্তঃকরণ) সচেতনবৎ প্রতীয়মান হয়। ব্যাসভাষ্যও এই মর্ম্মে বলিতেছেন :—অচেতনং চেতনমিব স্ফটিকমনিকল্পং সর্ব্বার্থমিতি উচ্যতে। অর্থাৎ অচেতন চিত্ত সচেতনবৎ প্রতীত হয়।

ইন্দ্রিয় দ্বারা এই চিত্তের বিষয়ের বা বাহ্যবস্তুর সহিত সংস্পর্শ হইলে চিত্ত তদাকারে আকারিত হয়। যোগদর্শনের ভাষায় ইহাকে 'উপরাগ' বলে—

তদুপরাগাপেক্ষিতত্বাৎ চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতং ৪।১৭ সূত্র।

যেন চ বিষয়েন উপরক্তং চিত্তং স বিষয়ো জ্ঞাতঃ ততোহন্যঃ পুণরজ্ঞাতঃ—ব্যাসভাষ্য।

কিন্তু ঐরূপ উপরাগেই অনুভূতি প্রক্রিয়ার অবসান হয় না। উহার সহিত অতঃপর চিত্তের বা পুরুষের সংযোগ হয় :—

সাচ বৃত্তিঃ অর্থোপরক্তা প্রতিবিম্বরূপেন পুরুষাধিরূঢ়া সতী ভাসতে। অর্থাৎ বিষয় (object,) দ্বারা উপরঞ্জিত বৃত্তি প্রতিবিম্বরূপে পুরুষে অধিরূঢ় হইলে তবে অনুভূতি হয়।

সেইজন্য সাংখ্যকার বলিয়াছেন :—

চিদবসানো ভোগঃ—১।১০৪

পতঞ্জলি এই কথার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন :—

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্—৪।২২

[দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং বিষয়বিষয়িনির্ভাসং চেতনাচেতনস্বরূপাপন্নম্—ব্যাসভাষ্য]

এ সম্বন্ধে বাচস্পতি মিশ্রের বক্তব্য এই :—

জড়স্বভাবোপি অর্থঃ (objects) ইন্দ্রিয়- প্রণালিকয়া চিত্তমুপরঞ্জয়তি। তদেবং ভূতং চিত্তদর্পণম্ উপসংক্রান্ত প্রতিবিম্বাচিতিশক্তিঃ চিত্তম্ অর্থোপরক্তং চেতয়মানার্থম্ অনুভবতি।

ইহাকেই যোগদর্শনের ভাষায় বৃত্তিসারূপ্য বলে—বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র—১।৪।

ব্যুত্থানে যাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ তদ্-অবশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ—ব্যাসভাষ্য।

পুরুষ এই রূপে 'প্রত্যয়ানুপশ্য' হন। (২।১ সূত্র)।

প্রত্যয়ং বৌদ্ধমনুপশ্যতি। তমনুপশ্যন্ ন তদাত্মাপি তদাত্মক ইব প্রত্যবভাসতে।

—ব্যাসভাষ্য।

এই চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন—বৃত্তি পঞ্চবিধ।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয়ঃ—১।৭

প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রাস্মৃতয়ঃ—১।৭

যোগদর্শনের মতে নিদ্রাও বৃত্তি, কারণ, নিদ্রোত্থিতের স্মরণ হয় 'সুখমহং অস্বাপ্‌সং ন কিঞ্চিদ্ অবেদিষম্'। এই অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিকে নিদ্রা বলে। (১।১০ সূত্র) *

স্মৃতির বৃত্তিত্ব বিষয়ে মতভেদ নাই—অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ—১।১১

* স খল্বয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমর্শো ন স্যাদ অসতি প্রত্যয়ানুভবে—ব্যাসভাষ্য।

পতঞ্জলির মতে জ্ঞানক্রিয়ায় বস্তুর সহিত বৃত্তির সামঞ্জস্য থাকা উচিত। যেখানে এই সামঞ্জস্য থাকে, সেই বোধ প্রমাজ্ঞান বা প্রমাণ। আর যেখানে ঐ সামঞ্জস্য না থাকে সে বোধ মিথ্যাজ্ঞান বা বিপর্য্যয়।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম্ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্—১।৮॥

কখন কখন বস্তু নাই, অথচ শব্দজ্ঞানের অনুপাতী বৃত্তির উদয় হয়, তাহাকে বিকল্প বলে; বিকল্পও বৃত্তি।

শব্দ জ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ —১।৯

এতক্ষণ আমরা চিত্তের Psychologyর আলোচনা করিলাম। এইবার চিত্তের Pathologyর আলোচনা করিতে হইবে—নতুবা যোগদর্শনের যাহা উদ্দিষ্ট, আমরা সেখানে পঁহুছিতে পারিব না।

এই যে পঞ্চবিধ বৃত্তি, তাহারা সকলেই সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক—

সর্ব্বাশ্চৈতা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখ-মোহাত্মিকাঃ; কারণ, প্রখ্যা প্রবৃত্তি স্থিতিরূপা বুদ্ধিগুণাঃ পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রীভূত্বা শান্তং ঘোরং মূঢ়ংবা প্রত্যয়ং ত্রিগুণমেব আরভন্তে—২।১৫, ব্যাসভাষ্য।

যেহেতু চিত্তপ্রকৃতির বিকার অতএব ত্রিগুণাত্মক এবং ঐ তিনগুণ (সত্ব, রজঃ ও তমঃ) নিয়ত পরস্পর-উপমর্দ্দশীল, অতএব চিত্তের বৃত্তি বা প্রত্যয় হয় শান্ত (সুখাত্মক), নয় ঘোর (দুঃখাত্মক), না হয় মূঢ় (মোহাত্মক) হইবেই হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে যোগদর্শনের চিত্ত পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অনুমোদিত Tabula Rasa বা clean slate নহে; ইহা সংখ্যাতীত বাসনা দ্বারা বিচিত্রিত

তদ্ অসংখ্যেয়বাসনাভিঃ চিত্রং—৪।২৩

বাসনা = সংস্কার। সংস্কার দ্বিবিধ। ক্লেশরূপ ও কর্ম্মরূপ। অসংখ্যেয়' কর্ম্মবাসনাঃ ক্লেশবাসনাশ্চ চিত্তমেব অধিশেরতে নতু পুরুষং। তথা চ বাসনাধীনা বিপাকাঃ চিত্তাশ্রয়তয়া চিত্তস্য ভোক্তৃতামাবহন্তি।—বাচস্পতি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ কর্ম্মের সংস্কার আশয়রূপে চিত্তে সংলগ্ন আছে।—

কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমেতরেষাম্॥—৪।৭

ক্লেশ ও কর্ম্মের নিয়ত সম্বন্ধ—ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ।—(২।১২ সূত্র)।

এই ক্লেশ পঞ্চবিধ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বা মরণত্রাস। অবিদ্যা = বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান—অতস্মিন তদ্বুদ্ধি। অস্মিতা = অভিমান—দৃক্ ও দর্শনশক্তির একাত্মতা। (২।৯)

এই পঞ্চক্লেশের মধ্যে অবিদ্যাই প্রধান—

অবিদ্যা-ক্ষেত্রম্ উত্তরেষাং প্রসুপ্ত তনুবিচ্ছিন্নো দারানাম॥—১।৪

এই পঞ্চ ক্লেশ সংস্কাররূপে বীজভাবে চিত্তে অনুবিদ্ধ থাকে এবং সহজেই বৃত্তিরূপে উপচিত হইয়া উদার বা লব্ধবৃত্তি হয়। যোগদর্শন বলেন যে, চিত্তকে সম্পূর্ণ বৃত্তিশূন্য করিয়া এই দ্বিবিধ বাসনা বিনির্মুক্ত করিতে হইবে; কারণ, তাহা হইলেই পুরুষ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হইয়া কৈবল্য লাভ করিবেন। ইহাই জীবের পরমার্থ।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ।—১।৩। তদ্ দৃশেঃ কৈবল্যম্ ।--২।২৫

চিত্তের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, চিত্তের পাঁচটি অবস্থা বা ভূমি আছে—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ।

ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্ত ভূময়ঃ—ব্যাস ভাষ্য।

ক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিত্তের পক্ষে যোগ অসম্ভব, কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিতে পারিলে যোগের সম্ভাবনা হয়। সেইজন্য পতঞ্জলি বিক্ষেপের আলোচনা করিয়াছেন; কারণ বিক্ষেপই যোগের অন্তরায় এবং দুঃখ, নৈরাশ্য, চাপল্য ও শ্বাসপ্রশ্বাস বিক্ষেপের নিত্য সহচর। দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্ব শ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপ সহভুবঃ ॥—১।৩৮

বিক্ষেপ কি কি ?

ব্যাধিস্ত্যান সংশয় প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি

চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।—১।৩১

(স্ত্যান = জড়তা, অনবস্থিত্ব-অপ্রতিষ্ঠা)

যথোচিত উপায় দ্বারা ঐ বিক্ষেপের নিরাস করিয়া চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে। পতঞ্জলি প্রথমতঃ সাধককে একতত্ত্বের অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন—তৎপ্রতিষেধার্থম্ একতত্ত্বাভ্যাসঃ।—১।৩২

পরে মৈত্রী,করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার অনুশীলন করিয় চিত্তের প্রসাদন করিতে হইবে। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম ২।৩৩

অতঃপর ক্রিয়াযোগ দ্বারা চিত্তের পরিকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। ক্রিয়াযোগ কি ?—

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ—২ ১ সূত্র

ক্রিয়াযোগের ফল কি ?

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ—২।২

ত্রিবিধ ক্রিয়াযোগের মধ্যে ঈশ্বরপ্রনিধানই মুখ্য। কারণ তদ্দ্বারা বিশেষভাবে অন্তরায়ের বারণ হয়;—

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽন্তরায়াভাবশ্চ।—১।২৯।

বলা বাহুল্য সাধনভিন্ন সিদ্ধি হয় না—ন চ সিদ্ধিরন্তরেন সাধনম্। চিত্তের অশুদ্ধিক্ষয়ের জন্য স্থিরতর উপায়—নিয়মিতভাবে অষ্টাঙ্গযোগের অনুষ্ঠান।—যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদ্ অশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিঃ—২।২৮

যোগের অষ্টাঙ্গ কি কি ?

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি।—(২।২৯)

যোগপ্রক্রিয়ার আলোচনা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে; অতএব আমরা অষ্ট যোগাঙ্গের অনুধাবন না করিয়া চিত্তের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি।

সাধক যখন পূর্ব্বোক্ত প্রণালী ও প্রক্রিয়ার দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র ভূমিতে উপনীত করিতে পারেন, তখন ধারণায় তাঁহার চিত্তের যোগ্যতা হয়। অবশ্য পরিণামী চিত্তের পরিণামের তখনও বিরতি হয় না, কিন্তু তখন বৃত্তির প্রবাহ একতান হয়। ইহাই ধ্যান—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানম্ ।— ৩।২

ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌচিত্তস্য একাগ্রতা পরিণামঃ ।—৩।১২

এইরূপে চিত্তঃ ক্ষীণবৃত্তি হইলে তাহার স্বচ্ছতা সাধিত হইয়া অভিজাত মণির ন্যায় (clear crystal) বস্তুর যথাযথ প্রতিকৃতিগ্রহণের সামর্থ্য উপজাত হয়—ইহাকেই সমাপত্তি বলে।

ক্ষীণবৃত্তেঃ অভিজাতস্যেব মনে গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ—১।৪১

এই সমাপত্তি স্থূলসূক্ষ্ম-গ্রাহ্যভেদে চতুর্বিধ। স্থূলের সমাপত্তি বিকল্পের দ্বারা সঙ্কীর্ণ হইলে তাহাকে সবিতর্ক, এবং বিকল্প হইতে বিশুদ্ধ অর্থাৎ অর্থমাত্র নির্ভাস হইলে তাহাকে নির্বিতর্ক বলে। এইরূপ সূক্ষ্মের সমাপত্তিকে সঙ্কীর্ণ ও বিশুদ্ধভেদে সবিচার ও নির্বিচার বলে। ইহাদিগের সাধারণ নাম সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি।

বিতর্কবিচারানন্দা-স্মিতারূপানুগমাৎসম্প্রজ্ঞাতঃ ॥

এ সকল সমাধিই 'সালম্ব'—'নিরালম্ব' নহে।

সর্ব্ব এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ।

বিতর্কের আলম্বন স্থূল, বিচারের সূক্ষ্ম, আনন্দের হ্লাদ এবং অস্মিতার একাত্মিকা সম্বিৎ।

বিতর্কশ্চিতস্যালম্বনে স্থূল আভোগঃ। সূক্ষ্মো বিচারঃ আনন্দোহ্লাদঃ। একাত্মিকা সংবিদস্মিতা।

এ অবস্থায় ধ্যান পরিপক্ক হইয়া চিত্তবৃত্তি 'অর্থ-মাত্র নির্ভাস', যেন স্বরূপশূন্য হইয়া যায়।

তদেব (ধ্যানম্) অর্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥— ৩।৩

এইবার চিত্তের একাগ্র ভূমির ঊর্দ্ধে নিরুদ্ধ ভূমিতে আরোহণ করিবার যোগ্যতা হয়। তখন একাগ্র পরিণামের স্থলে চিত্তের নিরোধ পরিণাম আরম্ভ হয়।

ব্যুত্থান নিরোধ সংস্কারয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ
নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধ পরিণামঃ ॥—৩।৯, সূত্র।

ইহার ফলে চিত্তনদী প্রশান্তবাহী হইয়া (তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ—৩।১০) চিত্তের সমাধি—পরিণাম আরম্ভ হয়।

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ সমাধি পরিণামঃ ॥—৩।১১

এই সমাধি পরিণামের সংস্কার ব্যুত্থানের সংস্কারকে নিরুদ্ধ করিয়া অসংপ্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধি আনয়ন করে

তজ্জঃ সংস্কারঃ অন্যসংস্কার প্রতিবন্ধী —১।৫০

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ—১।৫১

ইহাই পরিপক্ক যোগ—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ—১।২, সূত্র।

এ অবস্থায় বৃত্তির বিরাম হয় বটে কিন্তু চিত্তের সংস্কার অবশিষ্ট থাকে—

বিরাম প্রত্যয়াভ্যাস পূর্ব্বঃ সংস্কার শেষোঽন্য

অর্থাৎ সে অবস্থাতেও কর্ম্মের সংস্কার ও ক্লেশের সংস্কার বাসনারূপে চিত্তে অনুসৃত থাকে। অবশ্য ক্লেশের বৃত্তি পূর্ব্বেই ধ্যানদ্বারা প্রতিহত হইয়াছে --ধ্যানহেয়াস্তদবৃত্তয়ঃ—২।১১। এবং ক্রিয়া যোগদ্বারা ক্লেশ সকল তনূকৃতও হইয়াছে, সমাধি ভাবনার্থঃ ক্লেশ তনূকরণার্থশ্চ—২।২॥

কিন্তু ক্লেশের সূক্ষ্ম সংস্কার ?

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ—২।১০

যে যোগীর চিত্ত ধ্যানে পরিপক্ক হইয়াছে তাঁহার আর নূতন "আশয়" হয়না।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ং—৪।৬

তত্র যদেব ধ্যানজং চিত্তং তদেবানাশয়ং তস্যৈব নাস্ত্যাশয়োরাগাদি প্রবৃত্তি ততঃ পুণ্যাপাভিসম্বন্ধঃ ক্ষীণক্লেশত্বাদ্যোগিন ইতি—ব্যাসভাষ্য।

এ অবস্থায় যোগী চিত্ত হইতে পুরুষের প্রভেদ উপলব্ধি করেন। সেইজন্য তাঁহাকে বিশেষ দর্শী' বলা হয়। বিশেষ = প্রভেদ (distinction)। এই উপলব্ধিকে বিবেকখ্যাতি বা 'প্রসংখ্যান' বলে। এই বিবেকখ্যাতি হইলে যোগীর চিত্তে আত্মভাবভাবনার নিবৃত্তি হয়।

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনা বিনিবৃত্তিঃ—৪। ৬

যে চিত্ত পূর্ব্বে অজ্ঞান নিম্ন ও বিষয় প্রাগভার ছিল, তাহা এখন বিবেকোন্মুখ এবং কৈবল্য-প্রবণ হয়।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্য প্রাগভারং চিত্তং—৪।২৬।

এইবার যোগীর বিবেকখ্যাতিতেও বিরাগ উৎপন্ন হইয়া সংস্কারবীজ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ধর্ম্মমেঘ সমাধি উৎপন্ন হয়।

প্রসঙখ্যানে প্যকুসীদস্য সর্ব্ব বিবেকখ্যাতি ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।—৪৪।২৯

সংস্কারবীজক্ষয়ান্নাস্য প্রত্যয়ান্তরান্যুৎ পদ্যতে তদাস্য ধর্ম্মমেঘো নাম সমাধি র্ভবতি॥ ব্যাসভাষ্য

তখন যোগীর ক্লেশ সংস্কার ও কর্ম্ম সংস্কার সমূলে বিনষ্ট হয়।

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥৪।৩০॥

তল্লাভাৎ অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূল কাষং কষিতাঃ ভবন্তি। কুশলা কুশলাশ্চ কর্ম্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি—ব্যাসভাষ্য

এইরূপে যোগীর জ্ঞান সমস্ত আবরণমল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অনন্ত ও অপরিসীম হয় এবং আকাশে খদ্যোতের ন্যায় তাঁহার পক্ষে জ্ঞেয় স্বল্পমাত্র থাকে।

তদা সর্ব্বাবরণাপেতস্য জ্ঞানস্য আনন্ত্যাৎ জ্ঞেয়ম্ অল্পম্॥ —৪।৩১

এইরূপে চিত্তের প্রয়োজন অবসিত হওয়ায় তাহার পরিণাম-ক্রম পরিসমাপ্ত হয় এবং চিত্ত স্বয়ং—সে যে প্রকৃতির বিকার সেই প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রম সমাপ্তি গুণানাম্॥—৪।৩২॥

পুরুষার্থ শূন্যানাং গুণানাম প্রতিপ্রসবঃ—৪।৩৪॥

তখন পুরুষ চিত্তের সহিত অনাদি সিদ্ধ সম্বন্ধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অমল; কেবল শুদ্ধ বুদ্ধ অবস্থায় 'স্ব প্রতিষ্ঠ' হন।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্—১।৩।

ইহাকেই কৈবল্য বলে।

কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গুজরাত বিদ্যাপীঠ

(২)

এখন বিদ্যাপীঠের বিধিব্যবস্থার কথা কিছু বলিব। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাকে "বিনীত" পরীক্ষা বলা হয়; এই পরীক্ষায় পাশ করিয়া ছাত্রেরা মহাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়। মহাবিদ্যালয়ে ৪ বৎসর পড়িতে হয়; প্রথম বৎসরের পর যে পরীক্ষা হয় তাহাকে প্রথমা পরীক্ষা বলে। প্রথমা পরীক্ষার পরেই বি এ। বম্বে বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ বৎসর বি, এ, পড়িতে হয়, কিন্তু এখানে পড়িতে হয় ৩ বৎসর। মাননীয় সার মাইকেল স্যাডলার মহোদয়ও এই প্রকার পদ্ধতির অনুমোদন করিয়াছেন, ইণ্টারমিডিয়েটে এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া দুই বৎসরের পরিবর্ত্তে তিন বৎসর কোন এক বিষয় অধ্যয়ন করিলে তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে, ইহাই মনে হয়। সেজন্য দেখা যায় যে গুজরাত বিদ্যাপীঠের বি, এ, পাঠ্যাবলী অন্যান্য ইউনিভারসিটীর Honours পাঠ্যবলীর সমান।

এখানে ইংরাজী অবশ্যপাঠ্য নহে। প্রথমা পরীক্ষায়, ভাষার মধ্যে গুজরাতী এবং হিন্দি বা উর্দ্দু অবশ্যপাঠ্য; ইচ্ছাধীন পাঠ্য (opional) যেমন—ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, বাংলা বা মারাঠী ইহার যে কোনও একটী ভাষা লইতে হইবে। অধিকাংশ ছাত্রই ইংরাজী পড়ে, তবে অনেক বাংলাও পড়ে। বাংলা তাহারা পড়িতে, বুঝিতে, রচনা করিতে বেশ ভাল ভাবেই শেখে, তবে কথা বলিতে তেমন পারে না, কারণ বাংলায় কথা বলিবার বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ হয় না; ক্লাশেই যাহা কিছু সম্ভব—তাহাই হয় ও সেইটুকুই শেখে গুজরাতীরা বাংলা ভাষা খুব পছন্দ করে, এবং অনায়াসে শিখিতে পারে; বাংলার সহিত তাহাদের মাতৃভাষার এত সাদৃশ্য আছে যে বাংলা শিখিতে তাহাদের বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। বিশেষতঃ গুজরাতী, হিন্দি ও মারাঠী ব্যাকরণের তুলনায় বাংলা ব্যাকরণ এত সহজ যে, যে পরিশ্রমে মারাঠী শিখা যায়, তাহার অর্দ্ধেক পরিশ্রমেই বেশ ভাল করিয়াই বাংলা শিখা যায়। ছাত্রদেরই এই মত।

প্রথমা পরীক্ষায় আর যে সব বিষয় আছে তাহার কথা বলিলাম না; এখন বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্যাবলীর কথা বলিল। বি, এতে কয়েকটী "মন্দির" আছে, যেমন ভাষা মন্দির, গণিত মন্দির, ব্যবসায় মন্দির (Commerce), রাজনীতি মন্দির (Politics), আর্য্যবিদ্যা মন্দির (Philosophy), ললিত কলা মন্দির (Fine Arts) ইত্যাদি; বি, এ পরীক্ষাকে এখানে "স্নাতক" পরীক্ষা বলে, এই স্নাতক পরীক্ষায় যে কোন এক "মন্দির" গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু ছাত্র যে কোন মন্দিরই গ্রহণ করুক না কেন, তাহাকে গুজরাতী এবং হিন্দী বা উর্দ্দু পড়িতেই হইবে। এই দুইটী ভাষা স্নাতক পরীক্ষাতেই অবশ্য পাঠ্য।

সকল মন্দিরের বিবরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া যায়। দুই তিনটী মন্দির সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াই অন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিব। আর্য্যবিদ্যা মন্দিরে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়; ললিতকলা মন্দিরে প্রধানতঃ গান এবং বাদ্য শি[ক্ষা] দেওয়া হয়। এখানকার গানের সহিত বাংলা গানের যথেষ্ট প্রভেদ আছে; এখানকার সঙ্গীত পদ্ধতি মারাঠী ছাঁচে ঢালা; অর্থাৎ সঙ্গীতে কালোয়াতী ভাব প্রবল; ওস্তাদের গান বিজ্ঞানসম্মত বটে, কিন্তু তেমন মনোমুগ্ধকর নহে। আবার বাংলা গান চিত্তাকর্ষক বটে, কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহাতে অবৈজ্ঞানিক অনেক দোষ পাওয়া যায়। মোটের উপর, কালোয়াতী গান "very scientific but not very artistic." এই ললিত কলা মন্দিরের অধ্যাপকের নাম শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও পাঠক। ইনি যেমন গান করিতে পারেন, তেমনই বাজাইতে পারেন; বীণ, এস্রাজ, সেতার, বেহালা ও দিলরুবাতে তিনি সিদ্ধহস্ত, কিন্তু বেহালাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বাদ্যযন্ত্র—এ অঞ্চলে তাঁহার ন্যায় বেহালাবাদক দ্বিতীয় কেহ নাই। বম্বে গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে ১৫ বৎসর সঙ্গীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি এ অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি হারমোনিয়মের মোটেই পক্ষপাতী নহেন, সেইজন্য এ মন্দিরে হারমোনিয়মের কোন স্থান নাই। বাঙালী গায়ক হারমোনিয়মের যতই ভক্ত হউন না কেন, এ কথা তাঁহাকে মানিতে হইবে যে একই নিশ্বাসে বীণ, সেতার ও হারমোনিয়মকে বাদ্য যন্ত্র বলিলে, বীণ ও সেতারকে কিছু অপমানিত করা হয়।

ভাষা মন্দিরে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, আরবী, পারসী, সংস্কৃত, বাংলা, মারাঠী ও গুজরাতী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ভাষা মন্দিরের ছাত্রকে যে কোন দুইটী ভাষা শিখিতে হয়; যে বাংলা পড়িবে, তাহাকে দ্বিতীয় আর একটী ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক ভাষায় ৫টী করিয়া প্রশ্ন পত্র। বাংলা ভাষার গ্রন্থগুলির নাম—(১) গদ্য ও প্রবন্ধ রচনা, "প্রাচীন সাহিত্য," "প্রভাত চিন্তা," "প্রতিভা" (২) পদ্য ও কাব্য—"পলাশীর যুদ্ধ," "গীতাঞ্জলি," "মেঘনাদ বধ কাব্য," "শিবাজী কাব্য" (৩) উপন্যাস—গোরা, দত্তা, দুর্গেশনন্দিনী। (৪) নাটক—সাজাহান, চিত্রা, ডাকঘর, বিল্বমঙ্গল, রিজিয়া। (৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রাচীন কাব্য—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ইত্যাদি, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

কলেজে ড্রইং, পেন্টিং ও ফটোগ্রাফিও শিক্ষা দেওয়া হয়। শীঘ্রই যাহাতে কৃষি [শি]ক্ষা [দেওয়া] যাইতে পারে—তাহারও চেষ্টা হইতেছে। বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত

আমদাবাদ মহাবিদ্যালয়ে নাই—সে বন্দোবস্ত আছে বম্বে মহাবিদ্যালয়ে। সেখানে chemistry, physics, dyeing, cleaning, soap making ইত্যাদি ব্যবহারিক শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজের এই বিজ্ঞান বিভাগে নির্দ্ধারিত সংখ্যার অধিক ছাত্র লওয়া হয় না। বিজ্ঞান বিভাগ ব্যতীত Arts বিভাগও এই কলেজে আছে। এই কলেজও গুজরাত বিদ্যাপীঠের অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রিন্সিপ্যালের নাম শ্রীযুক্ত পুস্তাম্বেকার। ইনি অক্‌সফোর্ড হইতে এম এ পাশ করিয়া আসিয়া সুরাত কলেজে কার্য্য করিতেছিলেন, শ্রীযুক্ত গিডওয়ানির সংশ্রবে আসিয়া ইনি সুরাত কলেজ ছাড়িয়া বম্বে মহাবিদ্যালয়ে আসেন। তিনি অতি সুদক্ষ ও সুবিজ্ঞ প্রিন্সিপ্যাল।

গুজরাত বিদ্যাপীঠের একটী প্রধান বিশেষত্ব যে যতদূর সম্ভব সব বিষয়ই গুজরাতীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমা পরীক্ষায় অর্থশাস্ত্র (Economics), প্রমাণশাস্ত্র (logic) এমন কি গণিতশাস্ত্রও গুজরাতীতে শিখান হয়। স্নাতক বিভাগে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা গুজরাতীতে বুঝান কঠিন; সাধারণতঃ তাহা ইংরাজীতেই শিখান হয়; কিন্তু তবুও যতদূর সম্ভব চেষ্টা চলিতেছে, চেষ্টার ত্রুটী নাই। তবে এ বিষয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক হইতেছে গুজরাতী অধ্যাপকের অভাব। গুজরাতীরা ব্যবসাদার জাতি; তাহারা প্রথমে বোঝে টাকা। শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকলেরই ব্যবসার দিকে ঝোঁক। যতই উচ্চশিক্ষিত হউক না কেন তাহারা সহজে টাকা ভুলিতে পারে না। অথচ, গুজরাত বিদ্যাপীঠের এমন ক্ষমতা নাই যে বেশী মাহিযানা দিয়া এই সকল উপযুক্ত লোককে কলেজে নিযুক্ত করিতে পারে। তাহারা এই কলেজে যোগ দিলে গুজরাতের এবং গুজরাতী ভাষার অনেক উপকার হইত, তাহা সকলেই বোঝে, কিন্তু কোন উপায় নাই। সেইজন্য নিকটস্থ মারাঠী ও সিন্ধি অধ্যাপক আনিয়া কাজ চালান হইতেছে। তাঁহারা গুজরাতী জানেন না; গুজরাতী শিখিয়া গুজরাতীর বক্তৃতা করা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং তাহা ভাল হইবে কিনা তাহাও সন্দেহজনক। সেইজন্য তাঁহারা ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। তবে যে সব গুজরাতী অধ্যাপক আছেন, তাঁহারা যত দূর পারেন গুজরাতীতে বক্তৃতা করেন। গুজরাত বিদ্যাপীঠ আশা করে যে, যে সকল উপযুক্ত ছাত্র কলেজ হইতে ভালভাবে পাশ করিয়া বাহির হইবে, তাহারা আবার তাহাদের কলেজেই ফিরিয়া আসিবে; এখানে শিক্ষকতা করিয়া বিদ্যাপীঠের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবে এবং তাহাদের দেশের ও মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করিতে থাকিবে। বিদ্যাপীঠে এম এ পড়াইবার কোন ব্যবস্থা নাই, কয়েকটী বিষয়ে পাঠ্যাবলী নির্দ্দিষ্ট করা আছে। স্নাতক হইয়া কোন বিষয়ে প্রবন্ধ (Thesis) পাঠাইলে এবং তাহা অনুমোদিত হইলে তাহাকে এম, এ উপাধি দেওয়া হয়।

বিদ্যাপীঠের আর্থিক অবস্থার কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা প্রায় দুইশত। প্রত্যেক ছাত্রের কলেজ ফি বাৎসরিক ৯০৲, কিন্তু বাৎসরিক আঠার হাজার বা কুড়ি হাজার টাকায় কোন বিদ্যাপীঠ চলিতে পারে না; গুজরাত বিদ্যাপীঠের পুস্তকাগার অতি বৃহৎ—প্রথমে যে ৪০ হাজার টাকার পুস্তক খরিদ করিয়া লাইব্রেরী উদ্ঘাটন করা হয়, তাহা ছাড়াও গত কয়েক বৎসর লাইব্রেরীর জন্য

বাৎসরিক দশহাজার টাকা দেওয়া হইতেছে। লাইব্রেরীর "পুরাতত্ত্ব" বিভাগে কয়েক জন অধ্যাপক research কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বিদ্যাপীঠের খরচ সামান্য নহে। কিন্তু বিদ্যাপীঠ টাকার জন্য তত ভয় বা ভাবনা করে না, গুজরাত বিদ্যাপীঠের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ভাল ভাবে কাজ করিতে পারিলে এবং ভাল কাজ দেখাইতে পারিলে, গুজরাতের লোক বিদ্যাপীঠকে অর্থ সাহায্য করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। গুজরাত কেন, সর্ব্বত্রই একই নিয়ম—ভাল কাজ করিতে থাকিলে টাকার অভাব হয় না; টাকা আসিবেই আসিবে। কেবল মাত্র বাক্য ব্যয় করিলে এবং Prospectus ছাপাইলে ও কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে টাকা আসে না; মূলে আসল কাজ চাই। ইতিমধ্যেই গুজরাত বিদ্যাপীঠ গুজরাতের এক গর্ব্বের ও গৌরবের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন উপলক্ষে গুজরাতবাসীগণ তাহাদের এই স্নেহের জিনিষটাকে ১২লক্ষ টাকা উপহার দিয়াছিল। গুজরাত বিদ্যাপীঠ চাহিয়াছিল দশলক্ষ—পাইয়াছিল ১২লক্ষ। ২রা অক্টোবর (মহাত্মার জন্মদিন) অতিবাহিত হইয়া গেলে আর টাকা লওয়া হইল না। সেই টাকায় বিদ্যাপীঠের কলেজ ও হষ্টেলের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় যাইয়া বিদ্যাপীঠের ভিত্তি স্থাপন কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। বার লক্ষ টাকা শীঘ্রই খরচ হইয়া যাইবে—তখন আরও টাকার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু ভাবনা কি? বিদ্যাপীঠের Chancellor মহাত্মা মোহনদাস আজ স্বয়ং কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত। যাঁহার আহ্বানে সমস্ত হিন্দুস্থান কাঁপিয়া উঠে, সমস্ত গুজরাত যাঁহার চরণে ভক্তিভরে প্রণত—তাঁহার প্রিয় বিদ্যাপীঠের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই উজ্জ্বল।

শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শুদ্ধ মানববুদ্ধিগোচর বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, যদি আমরা খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত, খৃষ্টীয় সমাজের অভিব্যক্তির ইতিহাস আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিব এই সময়ের মধ্যে ইহা তিনটি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে।

একেবারে প্রথম অবস্থায় খৃষ্টীয় সমাজ কেবল মাত্র এক ধর্ম্মবিশ্বাস ও এক ধর্ম্মভাবে মিলিত সম্প্রদায়মাত্র ছিল। এই আদিম খৃষ্টীয় সমাজ কতকগুলি ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাস একত্র পোষণ

---

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোন দৃঢ়বদ্ধ ধর্ম্মবাদ ছিল না, শাসন পদ্ধতি ছিল না, ধর্ম্মশাসনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যাজকসংঘ ছিল না।

অবশ্য কোন সম্প্রদায়ই—তা সে যত শিশুই হউক না কেন, তাহার গঠন যতই দুর্ব্বল হউক না কেন,—কোন সম্প্রদায়ই একটা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির নেতৃত্ব ভিন্ন টিকিতে পারে না। এই নেতৃশক্তিব্যতীত তাহাকে পরিচালন করিবে কে, তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া রাখিবে কে? আদিমযুগের এই বিভিন্ন খৃষ্টীয় উপাসকসংঘের মধ্যে এমন লোক অবশ্য ছিলেন, যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, শিক্ষা দিতেন, শাসন করিতেন, কিন্তু কোন সর্ব্বজনমান্য সুনির্দ্দিষ্ট শাসনবিধি ছিল না, বিধিনির্দ্দিষ্ট কোন ধর্ম্মশাস্ত্রও ছিল না। বিশ্বাস ও ভাবের ঐক্যে গ্রথিত একটী শিথিলগ্রন্থি উপাসকসম্প্রদায়মাত্র, এই ছিল খৃষ্টীয় সমাজের আদিম অবস্থা।

যে পরিমাণে খৃষ্টধর্ম্ম দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল ও বিস্তার লাভ করিতে লাগিল, সেই পরিমাণে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট মতবাদ, নিয়মপদ্ধতি, শাসনবিধি ও শাসন-কর্ত্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল। এক শ্রেণীর ধর্ম্মশাসকের নাম হইল প্রেস্‌বিটার বা প্রাচীন, তাঁহারাই পরে যাজক বা পুরোহিত হইলেন, আর এক শ্রেণীর নাম হইল এপিস্কোপয় অর্থাৎ পরিদর্শক, তাঁহারা পরে হইলেন বিসপ্, অন্য একশ্রেণীর নাম হইল ডিয়াকোনয় বা ডিকন্, তাঁহারা দরিদ্র পোষণ ও ভিক্ষা বিতরণের ভার পাইলেন।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ধর্ম্মাধিকারীবর্গের কাহার কি কার্য্য, কাহার কি অধিকার ছিল, তাহা সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করা এখন এক প্রকার অসম্ভব। পরস্পরের অধিকারের সীমারেখা সম্ভবতঃ অস্পষ্ট ও পরিবর্ত্তনশীল ছিল, কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। তথাপি এই দ্বিতীয় যুগের এই একটা বিশেষত্ব ছিল যে ধর্ম্মশাসনব্যবস্থায় তখন সাধারণ উপাসকবৃন্দেরই প্রাধান্য ছিল। কর্ম্মচারিনিয়োগ, বিধিনিষেধ-প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সকল বিষয়েই সাধারণ উপাসকবৃন্দের মতই প্রবল ছিল। চর্চ্চের শাসনব্যবস্থা ও সাধারণ খৃষ্টীয় সমাজ এ দুইএর মধ্যে তখনও পর্য্যন্ত কোন পার্থক্য ছিল না। পরস্পর পরস্পর হইতে ব্যবহিত বা স্বতন্ত্র ছিল না। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ে তখন সাধারণ জনবর্গের প্রভাবই প্রবল ছিল।

তৃতীয় যুগে সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তখন সাধারণ সমাজ হইতে পৃথক্ একটি যাজকসংঘ গঠিত হইল। এই যাজকসংঘের নিজেদের ধনসম্পত্তি ছিল, নিজেদের নির্দ্দিষ্ট এলাকা ছিল, নিজেদের একটা বিশেষ সংগঠনপদ্ধতি ছিল। এক কথায় ইহারা নিজেরাই একটা অন্যনিরপেক্ষ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজে পরিণত হইল। যে বৃহৎ সমাজের সম্পর্কে এই যাজকসংঘের সৃষ্টি ও স্থিতি, যে সমাজের উপর নেতৃত্ব করিয়া ইহাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি, সেই সাধারণ খৃষ্টীয় সম্প্রদায় হইতে পৃথক্‌ভাবে ও স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সামর্থ্য ও সঙ্গতি ইঁহারা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই হইল খ্রীষ্টীয় চর্চ্চের সংগঠনক্রমের তৃতীয় ক্রম। এই আকারেই পঞ্চমশতাব্দীর প্রারম্ভে ইহার আবির্ভাব। রাজশাসনের সঙ্গে প্রজাবৃন্দের যে সমস্ত সম্পর্ক রহিত হইয়া গিয়াছিল তাহা নহে; বরং এমন সর্ব্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা আর কখনও হয় নাই; কিন্তু যেখানে যেখানে যাজকবৃন্দের

সহিত উপাসকসম্প্রদায়ের সম্পর্ক, সে সমস্ত বিষয়ে যাজকবৃন্দের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল।

এই সময়ে খৃষ্টীয় যাজকসংঘের প্রভাব বৃদ্ধির আর একটী অন্যপ্রকারের কারণ ছিল। বিসপ্ ও যাজকগণই প্রধান প্রধান পৌরকর্মচারী ছিলেন। আপনারা দেখিয়াছেন যে বাস্তবিকপক্ষে বলিতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত রোমীয় সাম্রাজ্যের কেবল এই পৌরশাসনতন্ত্রটুকুই অবশিষ্ট ছিল। সম্রাট্দিগের যথেচ্ছশাসনের উপদ্রবে ও নগরগুলির অধঃপতন হওয়ায়, পৌরসংসদের পারিষদ্বর্গ নিরাশ ও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে নবজীবনসম্পন্ন ও নবোদ্যমে বলীয়ান্ বিসপ্ ও যাজকবৃন্দ স্বভাবতঃই সকল বিষয় পরিদর্শন ও পরিচালন করিতে প্রস্তুত ও অগ্রসর হইলেন। এজন্য তাঁহাদিগকে দোষ দিলে, সমাজের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহারা অনধিকার সত্ত্বেও গ্রাস করিয়াছেন বলিলে, অন্যায় হইবে। কারণ এই ব্যাপার স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পন্ন হইয়াছিল। কেবল যাজকেরাই তখন নৈতিকবলে বলীয়ান্ ও সজীব ছিলেন, কাজে কাজেই তাঁহারা সকল ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। বিশ্বজগতের এই নিয়ম! তদানীন্তন সম্রাট্দিগের সমস্ত বিধিবিধানেই এই পরিণতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। থিওডোসিয়াস্ বা জষ্টিনিয়ানের বিধিসংহিতা খুলিয়া দেখুন, দেখিবেন এমন অনেক বিধি আছে যাহা দ্বারা বিসপ্ ও যাজকদিগের উপর পৌরব্যাপার পরিচালনের ভার দেওয়া হইতেছে। এখানে জাষ্টিনিয়ানপ্রবর্ত্তিত কয়েকটী বিধি দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) নগর সমূহের বাৎসরিক কার্য্য পরিচালনের জন্য আমরা নিম্নোক্ত বিধান প্রবর্ত্তন করিতেছি। পৌর সম্পত্তির উপস্বত্ব বা দানসূত্রে প্রাপ্ত নগরের যত আয় আছে তাহার ব্যবস্থা করা; পূর্ত্তকার্য্য; শস্য ভাণ্ডার স্থাপন; পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ, স্নানাগার, বন্দর প্রভৃতির পরিরক্ষণ; প্রাচীর ও সেতু নির্ম্মাণ; পৌরব্যাপারসম্পৃক্ত মামলা মোকদ্দমা চালান, এসমস্ত ব্যাপারই এই পৌর কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত। আমরা বিধান করিতেছি যে বিসপ ও নগরের সর্ব্বোচ্চ-শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত তিনজন লোক একত্র হইয়া একটি সমিতি গঠন করিবেন। তাঁহারা প্রতিবৎসর যে যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবেন; কার্য্যকারকগণ যাহাতে যথারীতি সমস্ত কার্য্য পরিচালন করেন, রীতিমত হিসাবনিকাশ দেন, পৌরকীর্ত্তি, রাজপথ, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার বা অন্যান্য কর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ যাহাতে যথাযুক্তভাবে নিয়োগ করেন, এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

(২) ৫০০ সুবর্ণ মুদ্রার অনধিক আয়সম্পন্ন নাবালকদিগের অভিভাবক নিয়োগ সম্বন্ধে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অনুমতির অপেক্ষা করিতে হইবে না, কারণ তাহাতে অনর্থক ব্যয়বাহুল্য হয়। আমরা বিধান করিতেছি যে এই সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় ও বিশপ্ ও অন্যান্য পৌরপদধারি-বর্গের সহযোগে পৌরশাসনকর্ত্তাই অভিভাবক নিয়োগ করিবেন।

৩। আমাদের ইচ্ছা বিশপ্, যাজকবর্গ, ভূস্বামিবর্গ, প্রধানবর্গ ও পৌরসংসদের পারিষদ্বর্গ একত্র হইয়া পুররক্ষক নির্ব্বাচন ও নিয়োগ করিবেন।

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। সর্ব্বত্রই এক ব্যাপার লক্ষিত

হয় যে রোমীয়দিগের পৌরতন্ত্র ও মধ্যযুগের পৌরতন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থলে যাজকতন্ত্র ও পৌরতন্ত্রের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। প্রাচীন পৌরতন্ত্রে পৌরশাসনকর্ত্তৃগণের প্রাধান্য ছিল; আধুনিকযুগের পৌরতন্ত্রগঠন অন্যবিধ, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থলে দেখা যায় পৌরতন্ত্রে যাজকবর্গের প্রাধান্য।

এখন আপনারা দেখিতে পাইতেছেন যে খৃষ্টীয় চর্চ্চ, কতকপরিমাণে তাহার গঠন প্রণালীর দরুণ, কতকপরিমাণে খৃষ্টীয় জনবৃন্দের উপর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের দরুণ এবং কতকপরিমাণে পৌরব্যাপারে যোগ দেওয়ার দরুণ, কি প্রভূত ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিল। এইরূপে খৃষ্টীয় চর্চ্চ এই যুগ হইতেই আধুনিক সভ্যতার বিকাশ সাধনে ও প্রকৃতি সংগঠনে প্রধান সহায় হইয়া চলিল। এখন একবার দেখা যাউক তখন হইতে খৃষ্টীয় চর্চ্চ কোন্ কোন্ বস্তু, কোন্ কোন্ উপাদান ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

প্রথমতঃ এইটাই একটা পরম লাভ যে সেই জড়শক্তিপ্লাবিত সমাজের মধ্যে এমন একটা শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল, যাহার প্রভাব ও শক্তি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক,যাহার প্রতিষ্ঠা মানুষের বিশ্বাস ও ধারণার রাজ্যে, মানুষের হৃদয়বৃত্তির রাজ্যে। যদি সে সময় খৃষ্টীয় চর্চ্চ না থাকিত তাহা হইলে সমগ্র জগৎ বিশুদ্ধ জড়শক্তির কবলে নিপতিত হইত। একমাত্র চর্চ্চই কেবল নৈতিক শক্তির আধার ছিল। শুধু তাই নয়, সমস্ত মানববিধানের উর্দ্ধে যে একটা শ্রেষ্ঠতর বিধান আছে, শ্রেষ্ঠতর শাসন পদ্ধতি আছে, এ ধারণাটা চর্চ্চ ই পোষণ ও প্রচার করিয়াছিল। মানবের মুক্তিসাধনকল্পে, চর্চ্চ এই এক মৌলিক সত্য প্রচার করিল যে সমস্ত মানববিধানের উর্দ্ধে এমন একটা শাসনবিধি আছে,যাহা যুগভেদে ও প্রথাভেদে কখনও বা বিচারবুদ্ধিসিদ্ধ, কখনও বা বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট বলিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু যাহা সর্ব্বত্রও সর্ব্বকালে —আখ্যাভেদসত্বেও— মূলতঃ এক, নিত্য, সনাতন।

এক কথায়, এই ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় ব্যাপার সাধিত হইল, সেটি হইতেছে ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক শাসনের পার্থক্য সাধন। এই পার্থক্য হইতেই ধর্ম্মবিবেকের স্বাধীনতা সাধন সম্ভব হইল। সুসম্পূর্ণ ও সুবিস্তৃত বিবেকস্বাতন্ত্র্যের মূলে যে তত্ত্ব, এই শাসনপার্থক্যের মূলেও সেই তত্ত্ব ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্ব নাই। মানুষের আত্মার উপর, বিশ্বাসের উপর, সত্যের উপর যে জড়শক্তির, বাহুবলের কোন প্রভাব বা অধিকার নাই, এই ধারণার উপরই এই শাসনস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা। চিন্তাজগৎ ও কার্য্যজগৎ, বাহ্যব্যাপার ও অন্তর্ব্যাপারের মধ্যে যে প্রভেদ স্থাপিত হইল, তাহা হইতেই ইহার উদ্ভব। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে নৈতিক স্বাধীনতার জন্য ইউরোপ এত যুঝিয়াছে, যে নীতির প্রতিষ্ঠা হইতে এত দীর্ঘকাল লাগিল, অনেক সময় যাজকসংঘের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যে নীতি অগ্রসর হইয়াছে, ব্যক্তিগত বিবেকবুদ্ধির সেই স্বাধীনতন্ত্রনীতি ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবেই ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক শাসনের স্বাতন্ত্র্যনামে উপস্থাপিত হইয়াছিল। এবং চারিদিকের বর্ব্বর প্রাধান্যের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য খৃষ্টীয় চর্চ্চই এই নীতির প্রবর্ত্তন ও সংরক্ষণ করেন।

তাহা হইলে পঞ্চম শতাব্দীতে খৃষ্টীয় চর্চ্চ ইউরোপীয় সমাজের তিনটি মহৎ কল্যাণ সাধন করেন,—(১) সমাজে নৈতিক প্রভাবের প্রতিষ্ঠা, (২) পার্থিব ব্যাপারে বিধাতৃবিহিত শাসননীতির সংরক্ষণ ও (৩) পার্থিব ও অপার্থিব শাসনতন্ত্রের স্বতন্ত্রসাধন এমন কি, সে

সময়েও কিন্তু এই চর্চ্চের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে সমাজস্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। সেই পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই এমন কতকগুলি অকল্যাণকর নীতির আবির্ভাব হইল, ইউরোপীয় সভ্যতার অভিব্যক্তির ইতিহাসে যাহার প্রভাব নিতান্ত অল্প নয়। প্রথমতঃ এই সময়ে চর্চ্চের শাসন ব্যবস্থায় শাসক ও শাসিত বর্গের মধ্যে একটা পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। শাসনকর্ত্তৃগণ শাসনাধীন জনবৃন্দের সম্পর্কে যাহাতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে জনবৃন্দের উপর স্বকীয় বিধান অবাধে চালাইতে পারেন, তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন বুদ্ধির সম্মতিসাপেক্ষ না হইয়া তাঁহাদের মন প্রাণ অধিকার করিয়া বসিতে পারেন, সেই দিকে চেষ্টা হইতে লাগিল। উপরন্তু চর্চ্চের চেষ্টা হইল যাহাতে সমাজে যাজকতন্ত্রনীতির প্রাধান্য স্থাপিত হয়, যাহাতে তাঁহারা পার্থিব শাসন ক্ষমতার উপরও স্বীয় অধিকারবিস্তার করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা সমাজে একেশ্বর হইয়া রাজত্ব করিতে পারেন। এবং চর্চ্চ যখন পার্থিব রাজক্ষমতা করায়ত্ত করিতে, এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে অলক্ষ্য গতিতে যাজকতন্ত্র নীতির প্রাধান্য স্থাপন করিতে অপারগ হইলেন, তখন তিনি পার্থিক রাজবর্গের যথেচ্ছশক্তির ভাগী হইবার নিমিত্ত জনবর্গের স্বাধীনতার হানি করিয়া তাঁহাদের সহিত সহায়তাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

ইরোকোআদের গোষ্ঠি প্রথা

(৪) সংযুক্ত-জাতি

আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের ভিতর একাধিক জাতি সম্মিলিত হইয়া এক একটা লীগ বা জাতিসমবায় বা যুক্তজাতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই ধরণের "যুক্তজাতি"ই ইণ্ডিয়ান সমাজ-বিন্যাসে চরমতম কেন্দ্র।

অল্পসংখ্যক লোকের জাতিগুলা পরস্পর লড়াই করিয়া মরিত। ইহাদের অধীনে জমি থাকিত অনেক। পরস্পরের ভিতর ব্যবধানও স্থানহিসাবে যথেষ্ট। এই সকল অসুবিধা এড়াইবার জন্য মাঝে মাঝে আত্মীয় বা কুটুম্ব শ্রেণীর জাতিরা লীগ গড়িয়া তুলিতে ঝুঁকিত। কিন্তু লীগগুলা বেশীদিন টিঁকিত না। আবার দুর্যোগ চলিয়া গেলেই জাতিরা স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়িত। শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই কোনো কোনো জাতি লীগ ভাঙ্গিয়া দিবার পরও আবার এক লীগ কায়েম করিয়াছে। ইরোকোআরা ইণ্ডিয়ানদের "সংযুক্ত জাতি" গঠনের প্রয়াসে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

মিসিসিপি দরিয়ার পশ্চিমে ইরোকোআদের আদিম বাসস্থান। ইহারা বোধ হয় বিশাল ডাকোটা সমাজেরই এক অংশ। নানা জনপদে বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে ইহারা বর্ত্তমান নিউইয়র্ক প্রদেশে আসিয়া আড্ডা গাড়ে। ইরোকোআদের পাঁচ জাতি :—সেনেকা, কায়ুগা, ও নোণ্ডাগা, ও নাইডা এবং মোহক।

মাছ এবং হরিণের মাংস ইরোকোআদের প্রধান খাদ্য। আদিম ধরণের বাগান হইতে শাক শজীও আসে। ইহাদের পল্লীগুলা খুঁটার বেড়া দিয়া দুর্গাকারে সুরক্ষিত। ইহাদের লোক সংখ্যা বিশ হাজার। কোনো কোনো "গোষ্ঠী" পাঁচ জাতির প্রত্যেকটায়ই বিদ্যমান। ইহাদের সকলের ভাষা প্রায় এক ভাষারই বিভিন্ন শাখা স্বরূপ। "দেশগুলা"ও পরস্পর লাগা।

পুরাণা ইণ্ডিয়ানদিগকে খেদাইয়া দিয়া ইরোকোআ ইণ্ডিয়ানরা নিউইয়র্কের জনপদে জনপদে জুড়িয়া বসিয়াছিল। শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের ফলে ইহাদের দখল অধিকার হইয়াছে। এই কারণে,—বোধ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—পাঁচ বিজয়ী জাতি "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" এক লীগ বা মিত্রসঙ্ঘে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে ইরোকোআ যুক্ত রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ইহাদের তাঁবে ছিল বিপুল জনপদ। বহু নরনারী ইহাদের করদাতায় পরিণতও হইয়াছিল।

মেক্সিকো, নিউমেক্সিকো এবং পেরু এই তিন দেশের ইণ্ডিয়ানরা "বার্ব্বার" যুগের উচ্চতর স্তরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু আমেরিকার অন্যান্য আদিমবাসীরা কোনোদিন বার্ব্বার অবস্থার নিম্নতর কোঠা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। নিউইয়র্ক প্রদেশের ইরোকোআ যুক্ত-রাষ্ট্র এই সকল নিম্নতর বার্ব্বার সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

ইরোকোআদের যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নলিখিত বিধানের পরিচয় পাই :—

১। সমরক্ত পাঁচ জাতি চিরকালের জন্য মিত্রসঙ্ঘে পরিণত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক জাতি পুরাপুরি স্বাধীন। জাতিগুলার ভিতর পরস্পর সাম্যও সুরক্ষিত। রক্তের ঐক্যই এই যুক্তজাতির গোড়ার কথা। তিনটা জাতিকে জনকস্থানীয় বিবেচনা করা উচিত। ইহারা পরস্পর ভাই বলিয়া ডাকিত। অপর দুই জাতি ছিল সন্তান-স্থানীয়। ইহারাও পরস্পর ভাই স্বরূপ।

প্রত্যেক জাতির ভিতরকার 'গোষ্ঠী'গুলার ভিতরও রক্তের টান বেশ স্পষ্ট। সব্বপ্রধান তিনটা গোষ্ঠী পাঁচ জাতির প্রত্যেকটায়ই জীবিত ছিল। গোষ্ঠীর লোকেরা (বিভিন্ন "জাতির" অন্তর্গত থাকা সত্ত্বেও) পরস্পর ভাই বলিয়া ডাকিত।

আর তিনটী গোষ্ঠীর লোকজন মাত্র তিনটা জাতির ভিতর জীবিত ছিল। ইহারাও পরস্পর ভাই বলিয়া ডাকিত।

ভাষার ঐক্যও পাঁচ জাতিকে এক পূর্ব্বপুরুষের এবং এক রক্তের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। ইরোকোআ যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তির দুর্ব্বলতার কোনো কারণ ছিল না।

২। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ছিল সংযুক্ত সভা বা পরিষৎ। এই ফেডার‍্যাল সভায় বসিত পঞ্চাশজন সাখেম। ইহাদের ক্ষমতা এবং ইজ্জৎ সমান সমান। যুক্ত-জাতিসম্পর্কিত অর্থাৎ ফেডার‍্যাল সকল কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধেই এই পরিষদের অধিকার।

৩। যুক্তজাতিসম্পর্কিত কাজ কর্ম্মের জন্য প্রত্যেক জাতিকে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীকে দায়িত্ব লইতে হইত। সেই সকল দায়িত্বের কাজে সংযুক্ত পরিষৎ পঞ্চাশ সাখেমকে বাহাল করিত। বস্তুতঃ ফেডার‍্যাল নামে এই পঞ্চাশটা পদ নয়া কায়েম করা হইয়াছিল। পদগুলার

জন্ম কর্ম্মচারী বাছাই করা গোষ্ঠীর অধিকার। গোষ্ঠী দ্বারা ইহাদিগকে বরখাস্ত করাও সম্ভব। কিন্তু সংযুক্ত সভা মঞ্জুর না করিলে কোনো সাখেম সংযুক্ত কাজের গদিতে বসিতে পারিত না

৪। সংযুক্ত পরিষদের কর্ম্মচারীস্বরূপ এই সাখেমরা নিজ নিজ জাতির সাখেমও থাকিত। নিজ নিজ জাতি সভায়ও ইহাদের আসন ছিল।

৫। সংযুক্ত পরিষদের সকল বিধানে "সর্ব্বসম্মতি" আবশ্যক।

৬। প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র দলবদ্ধ ভাবে মত দিত। অর্থাৎ জাতি সভার লোকেরা সংযুক্ত সভায় বসিয়া আলাদা আলাদা যার যেরূপ খুসী ভোট দিতে পারিত না।

৭। যে কোনো জাতি সংযুক্ত সভার বৈঠক বসাইতে অধিকারী ছিল আপন খেয়ালে সংযুক্ত সভা নিজের বৈঠক ভাঙিতে পারিত না।

৮। সংযুক্ত-পরিষৎ খোলা বাজারে কাজ চালাইত। ইরোকোআ সমাজের যে কোনো লোক সভায় উপস্থিত থাকিতে অধিকারী ছিল এবং আলোচনায় যোগ দিতেও পারিত। কিন্তু ভোট দিবার ক্ষমতা ছিল একমাত্র পরিষদের সভ্যদের।

৯। ইরোকোআ যুক্ত রাষ্ট্রের মাথায় কোনো নায়ক বা স্থায়ী কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিল না।

১০। লড়াইয়ের জন্য দুইজন নায়কের ব্যবস্থা ছিল। উভয়ের ক্ষমতা এবং কাজ কর্ম্ম একরূপ ও সমান। স্পার্টায় এই ধরণেরই দুই রাজাকে এবং রোমে দুই কন্সালকে শাসন পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ স্বরূপ দেখিতে পাই।

এই গেল ইরোকোআদের রাষ্ট্র শাসনের রীতি। চারশ বৎসর ধরিয়া ইহারা এই পদ্ধতি অনুসারে সার্ব্বজনিক কাজ কর্ম্ম চালাইয়া আসিয়াছে। আজও এই শাসন পদ্ধতিই চলিতেছে।

(৫) সেকাল ও একাল

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ইরোকোআদের জীবন যাত্রায় খাঁটি "রাষ্ট্র" নামক কোনো বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছিল কি? মর্গ্যানের মতে ইরোকোআদের শাসন ব্যবস্থাগুলাকে "সমাজ" সঙ্ঘের বা সামাজিক কেন্দ্রের নিয়ম কানুনই বিবেচনা করাই উচিত। এই সমাজের লোকেরা রাষ্ট্র নামক সঙ্ঘ বা কেন্দ্র চিনিত না। রাষ্ট্র বলিলে "দণ্ড" দিবার ক্ষমতাওয়ালা একটা বিশেষ সঙ্ঘ বুঝায়। এই সঙ্ঘ সমাজের জনসমষ্টি হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু সেইরূপ দণ্ডধরের ধারণা ইরোকোআদের জন্মে নাই।

প্রাচীন জার্ম্মাণ "মার্ক" বা পল্লীসমাজের প্রতিষ্ঠানগুলা বর্ণনা করিতে যাইয়া মাওরারও এইরূপই বলিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় জার্ম্মাণরা সমাজশাসনের অধীনে জীবন ধারণ করিত। রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান তাহাদের জানা ছিল না। সামাজিক কেন্দ্র-গুলা হইতেই রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রও গড়িয়া উঠিতে পারিত সন্দেহ নাই, পরে গড়িয়া উঠিয়া ছিলও। এই কারণে মাওরার প্রাচীনতম পল্লীপ্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডধরের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ ও স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন।

উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে একটা জাতি ক্রমশঃ বিশাল মহাদেশে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। এক একটা জাতি ভাঙিয়া

ঘুরিয়া নানা স্ব স্ব প্রধান জাতিতে পরিণত হয়। ভাষাও ভাঙিতে ভাঙিতে একদম স্বতন্ত্র নতুন নতুন বহু ভাষার সৃষ্টি করে। সেই গুলার ঐক্য ত দূরের কথা, পরস্পর সম্বন্ধও বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়। এক একটা গোষ্ঠীও নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইতে থাকে। সাবেক গোষ্ঠী গুলাকে ফ্রাত্রীরূপে বজায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতম গোষ্ঠীদের নাম এমন কি সুদূর-বিস্তৃত পরস্পরবিচ্ছিন্ন জাতির ভিতরও প্রচলিত। নেকড়ে এবং ভল্লুক ইণ্ডিয়ান সমাজের বহু জাতির ভিতরই গোষ্ঠীর নাম জোগাইতেছে। আর ইরোকোআদের যে শাসন প্রণালী বিবৃত হইল তাহা এক প্রকার প্রায় সকল ইণ্ডিয়ানসম্বন্ধেই খাটে। এইমাত্র প্রভেদ যে, কোনো কোনো জাতি উচ্চতম ফেডারাল বা সংযুক্ত জাতি গড়িয়া তুলিতে পারে নাই।

এই সমাজ শাসনের গোড়ার কথাই গোষ্ঠী। এই গোড়া হইতে ফ্রাত্রী এবং ফ্রাত্রী হইতে জাতি নামক সমাজ কেন্দ্রের উৎপত্তি। প্রত্যেক কেন্দ্রই রক্তের ঐক্যে গঠিত,—তবে ধাপের পর ধাপে ঐক্যটা কথঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। প্রত্যেক কেন্দ্রই স্বরাট্ এবং তিন কেন্দ্রের পরিপূর্ণ জনসমাজ মানবজীবনের সকল কর্ত্তব্য পালনেই পূরাপুরি সমর্থ। সার্ব্বজনিক কাজের জন্য এই তিন প্রকার সমবক্তজ সমাজকেন্দ্রের অতিরিক্ত আর কোনো কেন্দ্র বা সঙ্ঘ আবশ্যক হয় না।

জগতের যেখানে যেখানে "গেন্‌স্" বা গোষ্ঠী নামক রক্ত কেন্দ্র বা বিবাহ ও পারিবারিক কেন্দ্র দেখিতে পাই সেই খানেই গোষ্ঠী ফ্রাত্রী জাতি সমন্বিত তিন কেন্দ্র পরিপূর্ণ জন সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে বিচারে ভুল হইবে না। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমাণ সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য ঐতিহাসিকগণের নিকট পাইয়াছি। সেইগুলা সবই এই ইণ্ডিয়ানদের শাসন প্রণালীর অনুরূপ। যেখানে যেখানে গ্রীক রোমাণ জীবন বিষয়ক তথ্য কম মিলে, সেই সকল ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান সমাজের নজির দেখিলেই প্রাচীনতম ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইতে পারিবে।

কি অপূর্ব্ব সুন্দর সরল এই গোষ্ঠীপ্রথা! কোন ফৌজ, বরকন্দাজ, পাহারাওয়ালা, নবাব, আমীর, জমিদার, রাজাবাদসা, কোতোয়াল, হাকিম, জজ, জেল, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদির দরকার হয় না। অথচ সকল কাজই চলিতেছে সিজিল মিছিল।

ঝগড়াঝাঁটি সবই গোটা কেন্দ্রের—গোষ্ঠীর ফ্রাত্রীর অথবা জাতির শালিসীতে মীমাংসা করা হয়। রক্ত-প্রতিহিংসার বিধান আছে বটে, কিন্তু সে প্রায় এক প্রকার ব্যতিরেক বিশেষ—চরম অবস্থার ব্যবস্থা মাত্র। আজকালকার প্রাণদণ্ড তাহারই আধুনিক রূপ। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা মাফিক সকল প্রকার সু-কু ইহার সঙ্গে জড়িত।

বর্ত্তমান কালের জটিল আমলাতন্ত্র এই সমাজে অপরিচিত। অথচ তাহার বিধানে আজকালের চেয়ে বেশী পরিমাণ সর্ব্বজনিক কাজ সামলানো হইয়া থাকে। বাস্তুভিটায় একাধিক পরিবার সমবেত ভাবে বসবাস করে। জমিজমা গোটা জাতির সম্পত্তি। তবে বাগান গুলাকে বাস্তুভিটার সামিল বিবেচনা করা হয় মাত্র। অর্থাৎ সাময়িক ভাবে এই জাতিগত সম্পত্তির উপর পরিবারের ভোগস্বত্ব থাকে।

মামলার বিচারে দুই দলই খোলসাভাবে সামনাসামনি নিষ্পত্তি করিতে অভ্যস্ত।

যুগযুগান্তরের গতানুগতিক সনাতন নিয়মগুলাই বিচার কার্য্যে আইনবিশেষ। নির্দ্ধন বা অভাবগ্রস্ত নামক কোনো শ্রেণী এই সমাজে নাই। বুড়া, রোগী এবং অকর্ম্মণ্য নরনারীর জন্য যৌথ সম্পত্তি হইতে ব্যবস্থা করা হয়। ব্যক্তিমাত্রেই স্বাধীন এবং পরস্পর সমান। মেয়েদের স্বাধীনতাও বাদ যায় না। গোলামের উৎপত্তি হয় নাই। পরাধীন বলিয়াও কোনো জাতি এখানে দেখা যায় না। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইরোকোআরা ঈরী এবং আর এক উদাসীন জাতিকে হারাইয়া নিজেদের সঙ্গে সমান ভাবে সংযুক্ত জাতির সামিল করিয়া লইতে চাহিয়াছিল। পরাজিতেরা এই সংযোগ বিধানে আপত্তি করায় তাহাদিগকে তাহাদের মুলুক হইতে খেদাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদিগকে গোলামে পরিণত করিবার অথবা বিজিত জাতি রূপে নিজ তাঁবে রাখিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

এই সমাজের নরনারী কি খাসা! যে সকল শ্বেতাঙ্গ পর্য্যটক ইণ্ডিয়ানদের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহারা ইহাদের আন্তরিকতা, ব্যক্তিত্ব, চরিত্রবত্তা এবং সৎসাহস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে।

সাহসিকতার দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আফ্রিকার আদিম অধিবাসিদিগের জীবনেও অনেক পাওয়া গিয়াছে। জুলু এবং নিউবিয়ান জাতির লোকেরা বিনা বন্দুকে এক মাত্র বল্লমের সাহায্যে ইয়োরোপীয় সৈন্যদিগকে কাবু করিতে পারিয়াছে। ইংরেজ পল্টন ইহাদের রণনৈপুণ্যে অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। ইংরেজরা বলে যে এক এক কাফির চব্বিশ ঘণ্টায় ঘোড়ার চেয়ে বেশী চলিতে সমর্থ।

সেকালের নরনারী ছিল এইরূপই। বর্ত্তমান যুগের ধনী-নির্দ্ধনশ্রেণীবিভক্ত সমাজের মজুর চাষীরা, বার্ব্বার যুগের গোষ্ঠীশাসিত স্বাধীন ব্যক্তিদের তুলনায়, যারপরনাই নগণ্য। দুয়ে প্রভেদ বিপুল।

কিন্তু এই খানেই সেই গোষ্ঠী সভ্যতার সীমানা। ইণ্ডিয়ানরা জাতি কেন্দ্রের উপরে উঠিতে পারে নাই। সন্ধির ফলে যে যে ক্ষেত্রে লীগ বা সংযুক্ত জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই সকল ক্ষেত্রে একটা উচ্চতর কেন্দ্রের অধীনে শান্তি ও শৃঙ্খলা চলিত। কিন্তু অপারপর জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিত মাত্র খাদ্যখাদকের। জাতির বাহিরে অতএব গোষ্ঠীর বাহিরে অতএব শত্রু—এই ছিল নীতি শাস্ত্র। আর শত্রুর উচ্ছেদ সাধনে পাশবিক নির্দ্দয়তার যথেচ্ছ ব্যবহার চলিত।

প্রকৃতিকে ব্যবহার করিয়া প্রচুর পরিমাণে ধনোৎপাদন করিতে ইণ্ডিয়ানরা শিখে নাই। এই জন্যই সুবিস্তৃত মহাদেশের অতি সামান্যমাত্র জনপদে অল্প সংখ্যক নরনারীর বিকাশ সাধিত হইতে পারিয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাদের জীবনের উপর প্রকৃতি অতি ভীষণ ভাবে দখল বসাইয়াছিল। জগতের যা কিছু সবই তাহাদের চিন্তায় গুহ্য, রহস্যময়, পবিত্র। এমন কি গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী, জাতি ইত্যাদি সমাজকেন্দ্রগুলাও যেন প্রকৃতির গড়া প্রতিষ্ঠান, অতএব প্রণম্য, সকল অবস্থায়ই স্বীকার্য্য। এই রূপ ছিল তাহাদের চিন্তাপদ্ধতি, ইহাই তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি।

বার্ব্বার যুগের গোষ্ঠীশাসিত জনসমাজগুলা সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রকৃতির দাস।

কোনো একটা জাতিকে অপর কোনো জাতি হইতে সহজে পৃথক করা সম্ভব নয়। শিশুর মতন প্রত্যেকের নাড়ীই আদিম প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত। সেই সমাজ জগতের সর্ব্বত্রই ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু গোষ্ঠী প্রথার পরিবর্ত্তে সভ্যতার জগতে আসিয়াছে কি বস্তু? ধনীনির্দ্ধনপ্রভেদ, অর্থ পৈশাচিকতা, পরনিপীড়ন এবং সমবেত সামাজিক ধর্মজীবনের উপর দুইচার দশজনের প্রভুত্ব। সেকাল আর একালে কি প্রভেদ? গোষ্ঠী-সমবায় বনাম "শ্রেণী"-বিরোধ।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

বিদ্বজ্জনবরেণ্য স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের রাজনৈতিক জীবনের এক পৃষ্ঠা

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব্বাভাষে লর্ড কার্জ্জন চট্টগ্রাম বিভাগ মাত্র আসাম প্রদেশের সামিল করার জন্য প্রস্তাবের ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, তখন ত্রিপুরা চট্টগ্রাম ও নওয়াখালী জেলার কলিকাতাস্থ ছাত্রাবাসসমূহে এক মহা আতঙ্কমূলক গভীর আন্দোলন উপস্থিত হইল। তখন উক্ত চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মিলনী তদনীন্তন কলিকাতায় রাজনৈতিক গগনের প্রধান প্রধান ভাস্করদের সহিত দিনের পর দিন দরবার করিতে যাইয়া, কোথায়ও বা ব্যর্থ মনোরথ হইতেন, কোথায়ও বা সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইতেন। সুদূর চট্টগ্রাম বিভাগের কথায় কাহারও প্রাণে তেমন বেদনার সঞ্চার হয় নাই। কিন্তু প্রথম দর্শনেই সৌম্যমূর্ত্তি প্রিয়দর্শন চৌধুরী মহাশয় আমাদের অতি আপনার হইয়া দাঁড়াইলেন। তখনও আন্দোলনটী কলিকাতায় ছাত্রাবাস হইতে সুদূর মফস্বলে কেন্দ্রীভূত হয় নাই। উদারহৃদয় চৌধুরী মহাশয় ছেলেদের এই আন্দোলনকে হেলার চক্ষে দেখিলেন না, বরং উৎসাহ দিয়া ইহার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

তৎপূর্ব্বে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার চট্টগ্রাম বিভাগ আসামভুক্ত হওয়ার প্রস্তাব হয়। তখন ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামবাসী ছাত্রদের চেষ্টায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পরলোকগত মহামতি আনন্দ চার্লু দ্বারা প্রশ্নের সাহায্যে ইহার বিরুদ্ধে প্রবল লোক মত জ্ঞাপন করায়, সরকারের সেই কুচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

তাঁহার নিকট আমরা ছাত্রবৃন্দ যে আন্তরিক সহানুভূতি পাইয়াছি, তাহা ভুলিবার নয়। আমাদের ছাত্রাবাসের ছাত্রদের চেষ্টার ফলে বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার পত্রিকায় চট্টগ্রাম বিভাগের আসামভুক্ত হওয়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে প্রবন্ধ প্রকাশিত লাগিল। ক্রমে প্রধান প্রধান স্থানে আন্দোলনের ক্ষীণ রেখা দেখা দিল। তখন পর্য্যন্ত চৌধুরী মহাশয় শুভানুধ্যায়ী উপদেষ্টা মাত্র, আন্দোলনের কর্ম্মক্ষেত্রে স্বয়ং ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই।

লর্ড কার্জ্জন বেঙ্গলী ও অমৃত বাজারের এই তীব্র আন্দোলনের ফলে জেদটী ভালরূপেই জাহির করিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ এক শুভ প্রাতকালে সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইল শুধু

চট্টগ্রাম বিভাগ নয়, ঢাকা বিভাগ ও রাজসাহী বিভাগের সমগ্র জুড়িয়া আসাম সহ এক নব প্রদেশ গঠিত হইবে।

চৌধুরী মহাশয় আর আসরে না নামিয়া পারিলেন না। মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী সে সময়ে কলিকাতায় লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থান করিতেছিলেন। যে দিন সেই সংবাদ বাহির হইল, সেই দিন সন্ধ্যায় চৌধুরী মহাশয় মহাশয় মহারাজ সূর্য্যকান্তের বাসভবনে হাইকোর্ট হইতে আসিয়া হাজির হইলেন। উভয়ের মর্ম্মব্যথা একই স্থানে, কাজেই পরামর্শ ও অভিসন্ধি স্থির হইতে সময় লাগিল না। তাঁহারা স্থির করিলেন প্রতিষ্ঠিত মফস্বলের জমীদারদের মুখপাত্র বঙ্গীয় জমিদারী সভাকে (Bengal Landholder Association) কেন্দ্র করিয়া এমন রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহার প্রভাবে সরকার বাহাদুর কম্পিত হন ও রাজনৈতিক লোকশিক্ষায় দেশবাসীর আগ্রহ জন্মে। চৌধুরী মহাশয় মনে মনে স্থির করিলেন বাঙ্গালার রাজনৈতিক জীবনে নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে ; আন্দোলনকে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় কেন্দ্রীভূত করিয়া শত শত শাখা প্রশাখায় দেশময় তাহার তীব্র প্রভাব আপামর সর্ব্বসাধারণের উপর বিস্তার করিতে হইবে। মোট কথা তাহাকে মূর্ত্তিমান জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

সেই সময়ে বঙ্গীয় জমীদার সভার সভাপতি মহারাজা সূর্য্যকান্ত ও সম্পাদক চৌধুরী মহাশয়। সহযোগী সম্পাদক ত্রিপুরাবাসী ছৈয়দ সমসুল হুদা।

মহারাজা বাহাদুরের যুক্তি ও তর্কের উপর প্রবল বন্যা বহাইয়া চৌধুরী মহাশয় মহারাজাকে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকে জীবন্ত মূর্ত্তিমান আন্দোলনে পরিণত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। রাজপুরুষদের রোষ ভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া জাতীয় জীবন যজ্ঞে আহুতি দিতে মহারাজা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সেই শুভসন্ধ্যায় দুই মহা কর্ম্মবীরের প্রাণের প্রতিজ্ঞায় বঙ্গদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের নব ধারার সূত্রপাত হইল।

বঙ্গীয় জমীদার সভাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি সমবেত ভাবে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এই লোকশিক্ষারূপ বঙ্গভঙ্গআন্দোলনের ভিতর দিয়া যে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করিলেন তাহা এ দেশে নূতন। লোকমত গঠনের জন্য সহস্র সহস্র পুস্তিকা প্রচারিত হইয়া বিলি হইতে লাগিল। গণতন্ত্রবাদী পাশ্চাত্য দেশের অনুরূপ রাজনৈতিক আন্দোলনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাহার প্রভাব বিস্তারের অভিনব প্রয়াস তিনিই প্রথম করেন। লক্ষ লক্ষ পুস্তিকার সাহায্যে এক দল দেশহিতৈষী শিক্ষিত যুবকবৃন্দ উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অতি অল্পকালমধ্যে যে মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করেন ও প্রবল লোকমত গঠন করেন, তাহার প্রভাব দেখিয়া লর্ড কার্জ্জন বিস্মিত ও চকিত হইয়া উঠিলেন। তাহার অঙ্গুলি চালনায় নাইট সাহেবের প্রতিষ্ঠিত রেটক্লীফ্ সম্পাদিত ষ্টেটসমান বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে সতেজে লেখনী চালাইলেন। এমন কি বাঙ্গালীবিদ্বেষী ইংলিষমানও সময় সময় বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতেন। বঙ্গীয় জমীদার সভার কার্য্যালয়ে প্রণালী স্থির হইয়া দেশময় তাহার কার্য্যের প্রভাব বিস্তৃত হইত। প্রতি সন্ধ্যায় জমীদার সভাগৃহে একটী পরামর্শসভা বসিত। সংবাদ পত্রের মতামত সংগ্রহ জন্য, পুস্তিকা প্রচার জন্য, মফস্বলে

কর্ম্মী পাঠাইবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ ছিল। আমরা ইহার পর জাতীয় জীবনে এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, বর্ত্তমানে ইহাকে গুরুতর কার্য্য বলিয়াই মনে হইবে না, কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সফলতা হইতেই আমরা আত্মনির্ভরের ভাব ও কার্য্য প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত করিবার শিক্ষা পাইয়াছি।

এই আন্দোলনে অস্থির হইয়া লর্ড কার্জ্জন মৈমনসিংহ ও ঢাকা যাইতে বাধ্য হইলেন। মহারাজার শশীকান্ত লজকে ২৪ ঘণ্টার জন্য সরকারী বাসভবনে পরিবর্ত্তিত করিয়া লর্ড কার্জ্জন মহারাজার অতিথি হইলেন। এবং ভোজনের টেবিলে মহারাজকে বলিলেন আপনি এই আন্দোলনের কর্ণধার কেন? মহারাজ উত্তর কবিলেন আপনার দেশে টুইড নদীকে সীমানা করিয়া দুইটা কাল্পনিক প্রদেশের সৃষ্টি করিলে আপনার প্রাণে কি ব্যথা হয় না? যুক্তিতে হার মানিয়া লর্ড কার্জ্জন তাহার পর ঢাকায় আসিয়া নবাব ছলিমুল্লাকে মধ্যবিন্দু করিয়া আন্দোলনটিকে হিন্দু মুসলমানের একটী জীবন্ত বিরোধে পরিণত করেন।

চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্বাহ্নে হাইকোর্টে মহামতি কটন সাহেবের বঙ্গভঙ্গ বিষয়ের রিপোর্ট সংগ্রহ করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় জনৈক বন্ধুর সাহায্যে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া তৎপরবর্ত্তী দিবসে তাহা পত্রিকা ও বেঙ্গলীতে ছাপাইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের বাজীমাত দেখাইয়া রাজপুরুষদের চমকাইয়া দেন।

দেশের জন শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া লোকমত গঠন করিলে তাহার শক্তি যে অপরাজেয় এবং সেই শক্তির নিকট প্রবল রাজশক্তিকেও মাথা নোয়াইতে হয় এই শিক্ষা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ভিতর দিয়া মহাপ্রাণ আশুতোষ দিয়া গিয়াছেন। আন্দোলনকে মূর্ত্ত করিতে হইলে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে তাহার প্রতি শিরায় উপশিরায় লোক মত গঠিত করিতে হইবে, এই শিক্ষা আশুতোষ দিয়া গিয়াছেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষার যে কল্পনা দেশের মানস চক্ষে প্রতিভাত হয় তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা আশুতোষই করেন। সেই সুবিখ্যাত পান্তির মধ্যেই তিনি সেই বর্ষের এম, এ, পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা না দিতে উপদেশ দেন। ইহাই সেই গোলামখানার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান। সেই সুবিখ্যাত পান্তের মাঠেই পরলোকগত সুবোধ মল্লিক ও বাবু ব্রজেন্দ্র কিশোর হইতে ৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের Bengal National Council of Education প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা চাহিনা তব শিক্ষা, চাই নব দীক্ষা এই মন্ত্রে দেশকে অনুপ্রাণিত করেন।

পরবর্ত্তী যুগে মহাত্মা গান্ধী যে অসহযোগ আন্দোলন সৃষ্টি করেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বয়কটের ভিতরের, নূতন জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভিতরে ও পল্লীতে পল্লীতে দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতরে সেই বীজ অঙ্কুরে লুকায়িত ছিল। তাহার মূলে সেই মহাপ্রাণ আশু চৌধুরী। আজ তাহা ফল পুষ্প শোভিত হইয়া মহামহী-রূপে পরিণত হইয়াছে। আজ তাহার শক্তিতে দেশ শক্তিমান, নির্ভরশীল। তাহার পরিণতিতে নবজাগ্রত দেশ আত্মত্যাগের ও সত্যাগ্রহের বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে।

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত

যুগসমস্যা

এই ভাবে যদি আমরা চলি, সমাজ যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধা করে চলে, আর ব্যক্তি যদি আপনার স্বাধীনতা সাধন করতে গিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে সংযম সাধন করে চলে, তাহলে দেখবে মানব সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ নষ্ট হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের বৃহত্তর জীবনে আপনার ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে সমাজের বৃহত্তব শক্তির সঙ্গে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি মিলিয়ে দিয়ে, সমাজকে বড় করে নিজে বড় হয়েছে। এই ভাবে যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলন চাই, তেমনি জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে মিলন চাই, ভারতবর্ষের এটা বিশেষভাবে প্রয়োজন। রাজা রামমোহন রায় তাই এ মিলন করবার চেষ্টা করেছিলেন।

এই মুহূর্ত্তের প্রধান সমস্যা এই যে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ, এটাও একটা মহাবিরোধ। বিরোধ সর্ব্বত্র ধর্ম্মে বিরোধ, সমাজে বিরোধ, রাষ্ট্রে বিরোধ, এই বিরোধে আমাদের উন্নতি কতকটা আটকা পড়েছে। এর মীমাংসা করতে হবে, বাইরের মিলনের পূর্ব্বে ঘরের মিলন করতে হবে, বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের পূর্ব্বে আমাদের সমাজের কোলাহল নিবৃত্ত করতে হবে।

এ কাজ ব্রাহ্ম সমাজ আরম্ভ করেছিল, রাজা রামমোহন রায় এ কাজ আরম্ভ করেছিলেন; তিনি একদিকে বেদান্ত, অন্যদিকে খৃষ্টান শাস্ত্র ও মুসলমান শাস্ত্র, এর মধ্যে মিলন বা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, সকল ধর্ম্মের ভিতর সত্য রয়েছে, তার আশ্রয়ে তিনি একটা সম্মিলন ক্ষেত্র গড়তে চেষ্টা করেছেন, এটা মৌলিক সমন্বয়। তার পর কেশব চন্দ্র তার প্রচারের কাজ অনেক করেছেন, সে কাজ আর কেহ করে নি। গিরীশ বাবু হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য যে কাজ করেছেন সে কাজও আর কেহ করে নি, গিরীশ বাবু প্রথম কোরান বাংলায় অনুবাদ করলেন। আমি হিন্দু ব্রাহ্ম সকলকে অনুরোধ করি এই গ্রন্থ কয় খানা—১০ ভাগ তাপসমালা—যদি পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন—ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে যারা আছেন তাঁদেরও বিশেষ ভাবে বলি, হিন্দু ভাইদেরও বিশেষ ভাবে বলি—তাঁরা যদি তাপস মালা পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন তাঁরা যে ধর্ম্মের আদর্শের অনুসরণ করছেন, সে আদর্শ খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মেও প্রকাশিত হয়েছে ; এই যে একত্ব, এ একত্ব চিরন্তন একত্ব, সনাতন একত্ব। তখন তাঁরা মুসলমানকে মুসলমান বলে অগ্রাহ্য অশ্রদ্ধা করতে পারবেন না।

মুসলমানদেরও তাই করতে হবে ; এই ভারতবর্ষে যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন বিদেশী ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, খৃষ্টান আছে, মুসলমান আছে, পার্শী আছে, তাদেরও এ বিষয়ে একটা কর্ত্তব্য আছে। এই যে মুসলমান ভারতবর্ষে এসেছে, এতে ভারতবর্ষের ইসলাম ক্রমেই গড়ে উঠছে, ভারতবর্ষের মুসলমানদের ভিতর নূতন ভাব, নূতন সাধনা ক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হচ্চে। আমি যখন সিন্ধু দেশে করাচী, হায়দ্রাবাদে যাই, সেখানে দেখেছি হিন্দু গুরু আছে, তার মুসলমান শিষ্য সে শিষ্য হিন্দু সাধনা করে না, তাদের সুফিবাদ, এটা ভারতবর্ষের ইসলামের শাখা স্বরূপ। ভারতবর্ষের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ভারতবর্ষের চিন্তার প্রভাবে থেকে ইসলাম সাধনা যে আকার ধারণ করেছে, সুফিদের ভিতর তাইই দেখা যায়। এ স্বাভাবিক, গ্রীসের চিন্তার ও সাধনার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রাচীন ইহুদী ধর্ম্ম যেমন গভীর উদার ও বিশ্বপ্রাণ হল, তেমনি ইসলাম

ভারতবর্ষে আসায় ভারতবর্ষের ইসলাম নূতন আকার গ্রহণ করবে না কেন? এখানকার প্রভাবে ভারতবর্ষের ইসলাম কি নূতন ভাবে গড়ে উঠবে না? ভারতবর্ষের মুসলমান নেতাগণের এটা কর্ত্তব্য যে ভারতবর্ষের মুসলমানগণের বৈশিষ্ট্য দ্বারা জগতের ইসলাম সাধনাকে পরিপূর্ণ করেন।

এ কাজ ব্রাহ্ম সমাজ আরম্ভ করেছিল। খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই, ধর্ম্মেই মিলন করতে হলে এই সূত্রে করতে হবে. এদেশে যে সকল খৃষ্টান এসে বাস করেছেন তাঁরা ভারতবর্ষের সাধনার সঙ্গে খৃষ্টান সাধনা যুক্ত করে, ভারতবর্ষের সাধনার সঙ্গে খৃষ্টান সাধনা মিলিয়ে দিয়ে, ভারতবর্ষের সাধনার প্রভাবে খৃষ্টান সাধনাকে গড়ে তুলে, বিরাট একটা খৃষ্টান সাধনা জগতের সম্মুখে কি দাঁড় করাতে পারেন না?

আজ কাল যাকে হিন্দু ধর্ম্ম বলি এটা অবান্তর জিনিষ নয়, নানা স্রোতে মিশে বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম গড়ে উঠেছে। তেমনি ভারতবর্ষের সাধনা স্রোতের সঙ্গে মিশে ইসলামের সাধনা নূতন ভাবে গড়ে উঠবেনা কেন? খৃষ্টান সাধনা নূতন ভাবে গড়ে উঠবেনা কেন? এই ভাবে সমন্বয়ের চেষ্টা করতে হবে।

তারপর জাতিতে জাতিতে সমন্বয়। এটাও একটা বড় কাজ। এই যে বিরোধ, এ বিরোধকেও নষ্ট করতে হবে। যদি এই বিরোধকে নষ্ট করতে না পারি তাহলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে—ইউরোপ আশঙ্কা করছে, অনেকে তাই আশঙ্কা করছে—ইউরোপীয় সভ্যতা বুঝি ভেঙ্গে গেল। এই যে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই যে সমর আয়োজন, এতে ইউরোপ ধ্বংসের মুখে যাবে, যে বিপ্লব এসেছে এই বিপ্লবের মাঝখানে ভারতের প্রাচীন সাধনা ও সভ্যতা যা যুগযুগান্ত ধরে বজায় ছিল সেটা কি নিশ্চিহ্ন হবে, মুছে যাবে? এটা ভাবতে হবে, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে মিলনের চেষ্টা করতে হবে, এ মিলনে স্বাধীনতা বিন্দু পরিমাণেও সঙ্কুচিত হবে না, এ মিলনে দাস আর প্রভুর মিলন হবেনা—এ মিলন সৌখ্যের মিলন হবে, সমকক্ষের মিলন হবে, সুতরাং এই মহামিলনে আমাদের সাহায্য করতে হবে। তাহ'লে ভারতবর্ষকে বড় করে তুলতে হবে, জগতের অন্যান্য জাতির সমকক্ষ করে তুলতে হবে। এই ভাবে যদি এই সকল সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের যতটুকু শক্তি সেই পরিমাণে বর্ত্তমান যুগ সমস্যার মীমাংসার কতকটা সাহায্য করতে পারব।

এ বিষয়ে এই আমার শেষ কথা—এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, এ বিষয়ে ব্রাহ্ম যুবকদের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব যে পরিমাণে নষ্ট হয়েছে, সেই পরিমাণে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান যুগ সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা হ্রাস হয়ে গিয়াছে। আর কাকেও দেখি না, যার দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হতে পারে—ব্রাহ্ম সমাজে দেখি না। এখানে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারব না। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়েছিলেন প্রাচীন ব্রাহ্ম সমাজ। সে ব্রাহ্ম সমাজ আমরা দেখে এসেছি। সে ব্রাহ্ম সমাজ যে আদর্শ ধরে চলেছিল, সে আদর্শ আজ কোথায়? ব্রাহ্ম যুবকেরা কি সে আদর্শের অনুসরণ করছেন, না, তাঁরা অন্যান্যের মত বিষয়ে লিপ্ত হয়ে যাতে ধন মান যশ হয় তাতে ব্যস্ত

হয়ে আছেন ; যখন ব্রাহ্ম সমাজে এসেছিলাম তখন ব্রাহ্ম সমাজে স্বাধীনতার মহা যজ্ঞ কুণ্ড রচিত হয়েছিল কোথায় সেই কুণ্ড, কোথায় সেই অগ্নি, কোথায় হোতা, কোথায় যজমান, কোথায় সেই পুরোহিত ? ব্রাহ্ম সমাজে যখন প্রথম এসেছিলাম তখন বালকেরও মুখে শুনতাম এক প্রশ্ন—সত্য কি ? ধর্ম্ম কি ? সেই সত্যের অন্বেষণ আজ কোথায় ? ব্রাহ্ম সমাজে যখন প্রথম এসেছি, তখন দেখিছি ব্রাহ্মদের ভিতর জ্বলন্ত বিষয়বৈরাগ্য ? সেই বিষয় বৈরাগ্য আজ কৈ ? সে ভাব ত কারো ভিতর দেখি না, ব্রাহ্ম সমাজে যখন প্রথম এসেছি, তখন দেখেছি একটা জ্বলন্ত মানব প্রীতি, কেবল আমার গণ্ডী নয়, কেবল আমার সমাজ নয়, কেবল আমার পরিবার নয়, সমগ্র মানবের কল্যাণ করতে হবে, সমগ্র দেশের কল্যাণ করতে হবে, সমগ্রের উন্নতির উপর আমার উন্নতি নির্ভর করে, সমগ্রের অভ্যুদয়ের উপর আমার অভ্যুদয় নির্ভর করে, আমি যেমন আমার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যক্তিগত জীবন লাভ করি তেমনি আমার পরিবার, সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর জীবন লাভ করে। আবার তেমনি আমার সমাজ হাজার হাজার সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তম জীবন লাভ করে, এই বৃহত্তম জীবন যদি ব্রাহ্ম সমাজকে লাভ করতে হয় তবে কেবল আপন গণ্ডীতে বদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না, কেবল ঘরের দরজা বন্ধ করে সাধন ভজন করলে চলবেনা। ভিতরে যেতে হবে, সাধনের শক্তি লাভ করে বাহিরে আসতে হবে, আপনার সাধনলব্ধ জ্ঞান জগতকে দিবার জন্য আসতে হবে, প্রচারকভাবে নয়, কেবল দেবার জন্য নয়, তার নেবার কি কিছু নাই ? অতি কৃপণ সে, যে নিতে সঙ্কুচিত হয়। অতি দরিদ্র সে, যে অপরের কাছ থেকে নিতে লজ্জা বোধ করে। প্রকৃত ধনী সে, যে নিতে জানে এবং দিতে পারে। প্রকৃত উদার সে, যে কারো কাছ থেকে কিছু নিতে লজ্জা বোধ করে না। আমার নিতে লজ্জা হবে কেন ? এই যে নিতে লজ্জা, কারো কাছ থেকে নেব না, ইউরোপের কাছ থেকে নেব না, আমেরিকার কাছ থেকে নেব না, এই যে স্বজাত্যাভিমান— এ ত অভিমান নয়, এ ত আপনার মহত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ক্ষুদ্রত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে ছোট সে ভাবতে পারে যদি কারো কাছ থেকে কিছু নিই তা হ'লে "আমি ছোট" এই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। যে বড়, সে সেটা ভাবেনা। সে যেমন দিতে পারে, তেমন নিতেও পারে। ব্রাহ্ম সমাজ একদিন বাহিরের থোক নিয়েছে, দুই হাত দিয়ে নিয়েছে। পিপাসিত যেমন জল নেয়, একদিন ব্রাহ্ম সমাজ চতুর্দ্দিক থেকে তেমনি নিয়েছে, আজ কি ব্রাহ্ম সমাজ নিবেনা ? বিধাতার প্রেরণা কি কেবল বেদেতেই আছে, তার পর কি নাই ? উপনিষদেই আছে, তার পর কি নাই ? কেবল কোরানেই কি আছে, তার পর কি নাই ? আজও কি বিধাতা লীলা করেন না ? এই ভারতবর্ষে এই বাংলাদেশে চারিদিকে কত জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা হচ্ছে, চারিদিগে কত প্রচেষ্টা হচ্ছে, এই সকলের ভিতর থেকে ব্রাহ্ম সমাজের কি কিছু নেবার নাই ? নিতে হলে যেতে হবে তাদের মাঝখানে, ঝাপিয়ে পড়তে হবে, আপনাকে বড় ভেবে নয়, তাদের উদ্ধারের জন্য নয়। নিজে উদ্ধার হবার জন্য তাদের মাঝখানে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। সকলের কাছে যেতে হবে, সকলকে গুরু মেনে যেতে হবে, শিক্ষক মেনে যেতে হবে, যার যা দিবার দাও ভাই ! কি আছে তোমার গোপন

ধন? আন, আন, আন, আমি যে ভিখারী, আমার যে পিপাসার শেষ নাই, হে সাধক! হে যোগী, হে সন্ন্যাসী, হে ভক্ত, কি দেবে দাও, প্রাচীন নয়, নূতন।

সকলের সঙ্গে মতে না মিলতে পারে, মত বড় নয়। মতের চাইতে বড় সত্য, মতের চাইতে বড় জীবন, মতের চাইতে বড় সাধন, মতের চাইতে বড় সিদ্ধি, মত মনোময় কোষের কথা, প্রকৃত সত্য বিজ্ঞানময় কোষের কথা, তার উপরে সিদ্ধি, তার উপরে আনন্দময় কোষ ব্রহ্মলোক। সুতরাং এখানে সঙ্কুচিত হলে চলবেনা। কি কোথায় আছে দাও। আজ এই উৎসবের মুখে ব্রাহ্ম সমাজ কি বলতে পারে এস, এস এস, কে দেবে এস। তোমার কি আছে নিয়ে এস, এই আমার মন্দির, এই আমার ঠাকুর এখানে আমি বড় প্রদর্শনী খুলেছি এই প্রদর্শনীতে কার কি আছে নিয়ে এস। ভক্ত তোমার কি আছে নিয়ে এস, বাউল তোমার কি আছে নিয়ে এস, খ্রীষ্টান তোমার কি আছে নিয়ে এস। বৈষ্ণব, শাক্ত, মুসলমান, বৌদ্ধ তোমার কি আছে—নিয়ে এস। এরূপ ভাবে যদি একটা জ্বলন্ত বুভুক্ষা নিয়ে, জ্বলন্ত পিপাসা নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজ আবার সত্যের সন্ধানে যেতে পারে, আবার যদি আদর্শের সঙ্কেত ধরে চলতে পারে, তবে আবার নব জীবন আনতে পারে। বড় প্রয়োজন, ব্রাহ্ম সমাজ একসময়ে স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে সংস্কার বর্জ্জন করে এসেছিল। সংস্কার বর্জ্জিত স্বাধীনতার ধ্বজা তোলার আবার প্রয়োজন হয়েছে।

স্বরাজের কথা যে যাই বলুক না কেন, স্বাধীনতার ধ্বজা কোথাও দেখতে পাই না, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাতে তার একটা সত্য আদর্শ দেখতে পাই না। সামাজিক স্বাধীনতাতেও তার একটা সত্য আদর্শ দেখতে পাই না। আদর্শের পশ্চাতে পাগলের মত হয়ে ছুটে গিয়েছে তেমন লোক ত দেখতে পাই না। সকলে রামও বলে কাপড়ও তোলে। আদর্শের কথা কেবল মুখেই শুনি, সকলেই লাভ ক্ষতি গণনা করে বলে, হে যুবক তুমি বৃদ্ধ হও নাই হে ব্রাহ্ম সমাজের যুবক, তুমি বৃদ্ধ হও নাই, ১৬ বৎসরে তুমি বুড়া হও নাই। ২৫ বৎসরে বার্দ্ধক্যে অবসন্ন হয়ে পড় নাই, তোমাদের ক্ষতি লাভ গণনা করলে চলবেনা। লাভ ক্ষতি গণনা করে যদি চল, তবে সত্য লাভ হবেনা। যা বুঝবে সত্য বলে, ছুটে যাও তার পশ্চাতে; পেছনে কেউ তোমার বিদ্রূপ করলে, তোমার প্রতিবাদ করলে অসংযত হবে না। এই ভাবে ব্রাহ্ম সমাজকে চালাতে পারি, আমার এমন শক্তি নাই। তোমাদের প্রাণে আগুন জ্বেলে দিই সে শক্তি আমার নাই কিন্তু ইচ্ছা হয় মরবার আগে আবার যেন অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত দেখতে পারি, যে আগুন দেখে পতঙ্গের মত নিজে ছুটে এসেছি। ভগবান তোমাদের কৃপা করুন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মগধের রাজনীতিবিদগণ কিন্তু প্রাচীন ভারতের এই সনাতন রীতির পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মগধপ্রদেশ ধর্ম্মবিপ্লবের সৃজন করিয়াছে—এখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সে একটী বিশিষ্ট মতবাদ লইয়া উপস্থিত হইল। মগধ আর অন্যান্য দেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিল না—সে একেবারে সকলদেশ জয় করিয়া নিজের শাসনাধীনে আনিতে চাহিল। মহারাজ বিম্বিসার অঙ্গদেশ জয় করিয়া এই নীতির সূত্রপাত করেন। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু লিচ্ছিবি ও তাহাদের মিত্র মল্লদিগকে পরাজিত করিয়া মগতের সীমাবৃদ্ধি করিলেন ও অপরদিকে কোশলের সহিত যুদ্ধ করিয়া কোশল অধিকার করিয়া লইলেন। এইস্থানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে মগধের রাষ্ট্রনেতৃগণ চিরকাল ক্রমাগতভাবে গণতন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। জরাসন্ধ বৃষ্ণি সংঘের মধ্যে ভেদনীতির বীজ বপন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে—; আবার অশ্বঘোষকৃত "সুমঙ্গল বিলাসিনী" পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে অজাতশত্রুর মন্ত্রী বাৎসকার বজ্জিদের প্রতি উক্ত নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎপরে কৌটিল্য, লিচ্ছিবিক, ব্রিজিক, মল্লক, মদ্রক, কুকুর, কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি সংঘের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার জন্য কিরূপ কূটনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তৎকৃত অর্থশাস্ত্রের "সঙ্ঘভেদ" অধ্যায় পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়।

বিম্বিসারীয় বংশের পর নন্দগণ মগধের সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াও মগধের চিরন্তন জয়নীতির (Policy of annexation) অনুসরণ করিয়াছিলেন। পুরাণসমূহ একবাক্যে বলিতেছেন যে নন্দবংশীয়গণ ক্ষত্রিয়দিগকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করতঃ "রাজচক্রবর্ত্তী" পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠিক্ এই সময়েই আমরা অবন্তী ও কৌশাম্বীর রাজবংশের চিহ্ন আর দেখিতে পাই না—তজ্জন্য অনুমান হয় যে পুরাণের উক্ত বাক্য সত্য ও নন্দগণ উচ্চআকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষত্রিয়গণের রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। আর নন্দবংশীয়দের রাজ্য যে খুব বিস্তৃত ছিল একথা সেকন্দর সাহের সহিত আগত গ্রীকদিগের বিবরণী পাঠ করিলেও অবগত হওয়া যায়।

পররাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ রাজ্যের বিস্তারনীতি কৌটিল্য কেবলমাত্র গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই—তিনি নিজের জীবনেও এই নীতি পালন করিতে যাইয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে সমগ্র উত্তরভারতের একচ্ছত্র সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার কূটনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিভা যেরূপ বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল, সেরূপ আর ভারতবর্ষে দ্বিতীয়বার হয় নাই। তিনি বিজীগিষু নৃপতিকে উপদেশ দিতেছেন যে নিজের রাজ্যের নিকটবর্ত্তী শত্রুরাজ্য গ্রহণ করিয়া পরে মধ্যম রাজার রাজ্য গ্রহণ করিবে এবং তাহার পরে উদাসীন নৃপতির রাজ্যও বলপূর্ব্বক হরণ করিবে—পৃথিবী জয় করিবার ইহাই প্রথম নীতি। এই রাজনৈতিকের দৃষ্টি কেবলমাত্র রাজ্য-প্রসারের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। সেই লক্ষ্য সম্পাদন করিবার জন্য কোন নৈতিক নিয়ম মানিবার প্রয়োজন তিনি বোধ করিতেন না।

তাই তিনি বিষ বা গুপ্তঘাতক দ্বারা প্রতিবেশী নৃপতিকে হত্যা করিতে উপদেশ দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করেন নাই। উক্তকার্য্য সাধন করিবার জন্য বেশ্যা নিযুক্ত করাকেও পাপকার্য্য মনে করেন নাই। বিজীগিষু নৃপতির সহিত বন্ধুত্ব করিয়াও যে কেহ নিস্তার পাইবে, সে উপায় নাই—যখনই সেই বন্ধু কোন প্রকার রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিবেন, তখনই তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত ও সম্ভব হইলে তাঁহার নিকটস্থ কোন শত্রু-রাজার সহিত তাঁহার ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া কণ্টক দিয়া কণ্টক দূর করা হইত।

এইস্থলে আমাদের বিশেষরূপে মনে রাখা প্রয়োজন যে কৌটীল্যের এই অধর্ম্মমূলক রাষ্ট্রনীতির সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারার কোন সামঞ্জস্য ছিল না। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে প্রাচীন ভারতে পররাজ্য নিজ অধিকারে আনিয়া সাম্রাজ্যগঠন করা হইত না—এক্ষণে মগধের রাজনৈতিকগণ এই নূতন নীতি অবলম্বন করায় জনসাধারণ হয়ত ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই, এজন্য কৌটীল্যকেও এ নীতি যতদূর সম্ভব শিথিল করিয়া লোকমতানুসরণ করিতে হইয়াছে। এইরূপ মতগ্রহণ করিলেই আমরা কৌটীল্যের অর্থশাস্ত্রের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব—নতুবা ইহা কতকগুলি পরস্পর বিরোধী বাক্যের সমষ্টি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কারণ যখন তিনি বিজয়ী রাজার প্রতি উপদেশ দিতেছেন যে নিহত রাজার দেশ, ধন স্ত্রী বা পুত্রের প্রতি লোভ করিও না ও সেই রাজ্যে নিহত রাজার আত্মীয়কে স্থাপন করিবে, তখন কৌটীল্য কেবলমাত্র প্রাচীনযুগের রাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা করিতেছেন—তাঁহার নিজের মত বলিতেছেন না। (৮।১৬)। কেননা অন্যত্র (১৩।৫) তিনি বলিয়াছেন "যশ্চ তৎকুলীনঃ প্রত্যাদেয়মাদাতুং শক্তঃ প্রত্যন্তাটবীস্থো বা প্রবাধিতুমভিজাতঃ; তস্মৈবিগুণাং ভূমিং প্রযচ্ছেৎ; গুণবত্যাশ্চতুর্ভাগং বা। কোশ দণ্ডদানমবস্থাপ্য যদুপকুর্ব্বাণঃ পৌরজানপদান্ কোপয়েৎ, কুপিতৈস্তৈরেনং—ঘাতয়েৎ" অর্থাৎ শত্রুকুলের মধ্যে যদি কেহ এমন থাকে যে বিজিতদেশ পুনরধিকার করিতে পারে ও সে প্রান্তদেশে বন্য ভূমিতে অবস্থান করে ও বিজয়ীর প্রতি উৎপাত করে, তবে তাহাকে অনুর্ব্বর ভূমি বা উর্ব্বর ভূমির একচতুর্থাংশ দিবে—কিন্তু এই সর্ত্ত করিবে যে বিজয়ীকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধন ও সৈন্য দিবে। সে যখন ঐ ধন ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবে—তখন প্রজারা তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইবে ও তাহারা তাহাকে হত্যা করিবে"। কৌটীল্যের মতে এইরূপ সাধু উদ্দেশ্যের জন্য বিজিতরাজের আত্মীয়কে রাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করিতে হইবে!

যদি কোন রাজা পরাজিত হইয়া শরণাপন্ন হন, তাহা হইলেও তিনি যে প্রাচীন যুগের ন্যায় নিজরাজ্যে স্বচ্ছন্দে শাসন করিতে পারিবেন, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। মৌর্য্যযুগে পরাজিত রাজা যে অবস্থা লাভ করিতেন, তাহা রোমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত রাজ্য অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট ছিল। পরাজিত রাজা সম্বন্ধে কৌটীল্য বলিতেছেন—"দুর্গাদীনি চ কর্ম্মস্থাবাহবিবাহ পুত্রাভিষেকাশ্চ পণ্যহস্তিগ্রহণ সত্র যাত্রাবিহারগমণানি চানুজ্ঞাতঃ কুর্ব্বীত" অর্থাৎ—দুর্গাদি-নির্ম্মান, কোন দ্রব্যলাভ, বিবাহ, পুত্রের অভিষেক বাণিজ্য, হস্তিসংগ্রহ, যুদ্ধের জন্য স্থান নির্ম্মান, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা এই সকল কার্য্যেই স্বাধীন রাজার অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে রোমাণগণ প্রদত্ত Jus commercium বা Jus

privatium কিছুই পরাজিত রাজাকে মৌর্য্যগণ দিতেন না। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত রাজ্য কতদিন যে তাহার নামমাত্র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিত, তাহা যাঁহারা রোমান বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার কাহিনী অবগত আছেন তাঁহাদিগকে আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না।

এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়াও কিন্তু মৌর্য্য সাম্রাজ্য অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। তাহার পতনের নানারূপ কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে ঐ পতনের অন্যতম কারণ এই যে মৌর্য্যগণ ভারতের সনাতন রাষ্ট্রনীতিকে অবহেলা করিয়া উচ্ছেদতন্ত্র অবলম্বন সাম্রাজ্য করায় অনেকেই ইহার দুর্ব্বলতার দিন ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। সুঙ্গগণের সময়ে যে উক্ত নীতির প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আমরা কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র পাঠে অবগত হইতে পারি। অগ্নিমিত্রের সৈন্য বিদর্ভ জয় করিল কিন্তু উক্ত রাজ্য নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া মাধবসেন ও যজ্ঞসেনের মধ্যে উহা বিভাগ করিয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রোমান সাম্রাজ্য যে Divide et empera, বা ভেদনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা এদেশে অপরিজ্ঞাত ছিল না। যখন মাধবসেন ও যজ্ঞসেনের মধ্যে বিদর্ভ ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে স্থির হইল তখন অমাত্যগণ বলিতেছেন—

দ্বিধা বিভক্তাং শ্রিয়মুদ্বহন্তৌ
ধুরং রথাশ্ববিব যংগ্রহীতুঃ।
তৌ স্থাস্যতস্তে নৃপতে নিদিশে
পরস্পরাবগ্রহ নির্ব্বিকারৌ॥

অর্থাৎ "যেমন রথাশ্বযুগল পরস্পর আক্রমণের অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া সারথির বশে থাকিয়া দুইভাগে বিভক্ত রথভার বহন করিয়া থাকে, তেমন তাঁহারাও পরস্পরের আক্রমণে উদাসীন হইয়া আপনার অধীনে দ্বিধা বিভক্ত রাজ্যভার বহন করিবেন।"

মৌর্য্য যুগের রাজনীতির প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেও দেখিতে পাই। মনু (৭।২০২) বলিতেছেন যে সকলের ইচ্ছা ভাল করিয়া অবগত লইয়া পরাজিত রাজার সিংহাসনে, উক্ত রাজার কোন আত্মীয়কে স্থাপন করা হউক ও বিজয়ী তাঁহার নিজের সর্ত্ত প্রদান করুন। বিষ্ণুও এই মতের কথা বলিতেছেন "শত্রুর রাজধানী জয় করিয়া তাহাতে উক্ত বংশের কোন বংশধরকে স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই রাজ সম্মান দিবে"। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনাকালে এই ভাবের কথা বলিতেছেন—

"গৃহীত প্রতিমুক্তস্য স ধর্ম্ম বিজয়ী নৃপঃ
শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার নতু মেদিনীম্"

বাণভট্ট কাদম্বরীতে বলিতেছেন যে দিগ্বিজয়কালে চন্দ্রাপীড় কোন রাজাকে উচ্ছেদ করেন নাই তাঁহাদের স্তুতিনতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যেই করদরাজারূপে রাখিয়াছিলেন

"শনৈঃ শনৈশ্চ পরিভ্রমন্নুন্নতানু নময়ন, আশ্বাশয়ম্ ভীতান্, রক্ষণ শরণগতান্, উন্মূলয়ন্

বিটপকান্ উৎসাদয়ণ কণ্টকান্, অভিষিন স্থান স্থানেষু রাজ পুত্রান্, সমর্জ্জয়ন রত্নানি, প্রতীচ্ছন পায়নানি, গৃধ্বন্ বারান্ আদিশন্ দেশব্যবস্থাঃ, স্থাপয়ন্ স্বচিহ্নানি, কুর্ব্বন্ কীর্ত্তনানি, লেখয়ন্ শাশনানি, পৃথিবীং বচচার”

ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপদেশ ও কাব্য নাটকের বর্ণনা হইতে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াও আমার মৌর্য্য নীতির পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। এলাহাবাদের স্তম্ভলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে সমুদ্রগুপ্ত নিকটবর্ত্তী রাজ্যগুলির উচ্ছেদ করিলেও মৌর্য্যগণের ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস করেন নাই—দক্ষিণাপথের রাজাদিগকে তিনি পরাজিত করিয়াও স্বরাজ্যে পুনস্থাপিত করিয়াছিলেন “সর্ব্বদক্ষিণাপথরাজগ্রহণ মোক্ষানুগ্রহজনিত প্রতাপ।”

এই প্রসঙ্গে একটী কথা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কোন দেশ তাহার অতীত ইতিহাসকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। মৌর্য্যগণের বিশাল সাম্রাজ্য পরবর্ত্তী কালের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, কিন্তু ওরূপভাবে স্থানীয় প্রতিভার বিকাশের পথে বাধা দিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিবিরুদ্ধ হওয়ায়, গুপ্ত সম্রাটগণ একটী সামঞ্জস্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী রাজ্যগুলি লইয়া সাম্রাজ্য গঠন করিতেন, কিন্তু সেই সাম্রাজ্যকে অতিবিস্তৃত করিবার প্রয়াসী হয়েন নাই।

দাক্ষিণাত্য সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজনীতিও এইরূপ ছিল—লাটমালবের গুর্জ্জর কোশল কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ তিনি জয় করিলেও, তাহা রাজ্যান্তর্ভুক্ত করিয়া লন নাই। রাজ তরঙ্গিনীতে দেখা যায় কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য বিজিত রাজাদিগের নিকট বিনয়বাক্য পাইলেই সন্তুষ্ট হইতেন, তাঁহাদের রাজ্য হরণ করিতেন না।

নয়াঞ্জলিষু বদ্ধেষু—রাজভির্ব্বিজয়ো দ্যমে
পার্থিব পৃথুবিক্রান্তি যুধি ক্রোধং মুমোচ বঃ॥ ৪।১১৯॥

প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, খণ্ড খণ্ড প্রদেশ গুলির স্বতন্ত্র প্রতিভাকে বিকাশ করাইবার সুযোগ এখানে প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই সুযোগ দিবার জন্যই প্রত্যেক প্রদেশের অল্পাধিক পরিমাণে স্বাধীনতা দেওয়া হইত। কৌটীল্য উচ্ছেদ মন্ত্রের মহাপুরোহিত হইলেও, ভারতের সনাতন প্রথা যে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা, তাহা বিলোপ করেন নাই। তিনি বিজয়ী রাজাকে বলিয়াছেন “তস্মাৎসমানশীলবেষ ভাষাচারতা মুপগচ্ছেৎ। দেশদৈবতসমাজোৎববিহারেষু চ ভক্তিমনুবর্ত্তেত॥ তিনি সেই দেশের বেশ ভূষা আচার ব্যবহার ভাষা ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চলিবেন। মনুও (৭।২০৩) উক্ত প্রকার উপদেশ দিয়াগিয়াছেন। বিষ্ণুও (৩।৪২) বলিতেছেন যে শত্রুর রাজ্যজয় করিয়া সে দেশের বিধি যেন রহিত না করা হয়। স্থানীয় প্রথাকে এতদূর সম্মান করা হইত যে, সমস্ত সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া একপ্রকার মুদ্রা প্রচলনের পর্য্যন্ত চেষ্টা হয় নাই, যেস্থানে যেরূপ মুদ্রা প্রচলিত ছিল, সেই স্থানে সেইরূপ মুদ্রাই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। Rapson বলেন Indian coin types are essentially local in character. At no period with which we are acqnainted, whether in the history of ancient or mediaeval

India, has the same kiud of coinage been carrent throughout one of the great empires. Each province of such an empire as a rule retained its own coin

এইরূপে সর্ব্বতোভাবে স্থানীয় প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্র ভারতবর্ষে ছিল বলিয়াই আমরা বাৎস্যায়নের কামসূত্রে প্রত্যেক প্রদেশের স্বতন্ত্র সভ্যতার পরিচয় পাই—প্রত্যেক প্রদেশের স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতন্ত্র ধর্ম্ম গঠিত হইয়াছিল। আর সেই জন্যই ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এতগুলি মতবাদ পাইয়াছি।

কিন্তু কোন নীতিই সর্ব্ব গুণের আকর হইতে পারে না। মানব অসম্পূর্ণ—তাহার সকল কাজেই অসম্পূর্ণতা থাকিবে। তাই ভারতীয় সম্রাজ্যে উক্ত গুণ বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইলেও, তাহার এই মহৎ দোষ ছিল যে বিভিন্ন প্রদেশগুলি পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হইয়াও একরূপ জীবন যাপন করিয়া সুদৃঢ় ভাবে সংযুক্ত হইতে পারে নাই—ভারতীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে একটীও রোমান সাম্রাজ্যের ন্যায় সুদৃঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া দিলে উপনিবেশগুলি লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বোধ হয় পুনরায় সেই সমস্যার অবির্ভাব হইবে।

শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার

বিপদে

[রামশর্ম্মার (৺নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের) ইংরাজী কবিতা হইতে]

দুখ বিপদের গভীর রজনী যবে
ছড়াবে হৃদয়ে অন্ধকাররাশি যত,
হয়োনা নিরাশ, হয়োনা নিরাশ ভবে,
বিশ্বাসআলোকে দীপ্ত করো তব পথ।
অগ্রসর হ'য়ো, বিপদে না করি ভয়,
অন্ধকারতম রজনীও নাহি রবে,
হেরিবে অদূরে আশা-সূর্য্যালোকোদয়,
আনন্দ-প্রসূন পথে প্রস্ফুটিত হ'বে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

স্বর্গীয় রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শারদীয় পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণধারায় যখন ব্রজভূমি প্লাবিত হইতেছিল, পুষ্পভারে অবনত পাদপশ্রেণী যখন মধুধারা বর্ষণ করিতেছিল, মত্তভ্রমরগুঞ্জনে কুঞ্জবন মুখরিত হইতেছিল, অকস্মাৎ বাঁশী বাজিয়া উঠিল, যমুনা পুলকে ফুলিয়া ফুলিয়া বিপরীত দিকে বহিল। বায়ু স্তম্ভিত হইল, কুলবালাগণ আপন আপন কর্ম্ম অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া সুর লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এ কি কবির কল্পনা? সুরের আকর্ষণী শক্তি কি অস্বীকার করা যায়? হরিণ ব্যাধের বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া ধরা পড়ে, এ কথা কি মিথ্যা? পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ৺ নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে একজন সাধু মহাজনের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া একটী কুকুর এত অচলপ্রায় হইয়াছিল, অনেক তাড়নায়ও সে নড়িল না। অবশেষে গান থামিলে পর চলিয়া গেল। শব্দের উদ্দীপনা শক্তি এবং সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি অস্বীকার করা যায় না।

পঁয়তাল্লিশ বৎসরের কথা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমার অশিক্ষিত স্বরেই তখন ভক্তেরা তৃপ্ত হইতেন। অকস্মাৎ একদিন উপর হইতে একটী নূতন সুর ভাসিয়া আসিল। ভক্ত নরনারীর প্রাণপাত্র ছাপাইয়া ভাব উচ্ছ্বসিত হইল। শিক্ষিত কণ্ঠ হইতে গান উঠিল—

"প্রাণ পিঞ্জরের পাখী
গাও না রে"

ভক্তিভাজন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বেদী হইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেন "আবার গাও, আবার গাও," একটা গানই এক ঘণ্টা ধরিয়া চলিল। সঙ্গীত সুধা পান করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইলেন এবং উৎসুকচিত্তে গায়কের সন্ধান নিয়া জানিলেন তিনি রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রামপুরহাটের স্কুলের পণ্ডিত।

গোস্বামী মহাশয়ের ভজনা ও রাজকুমার বাবুর কণ্ঠ, ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির যুগ আনয়ন করিয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সঙ্গীতে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, একদিন সশিষ্য তাঁহার গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কানে কানে বলিয়াছিলেন

"তোমার হৃদয় আমার হইল,
আমার হৃদয় তোমার হইল"।

শেষ জীবনে রাজকুমার বাবুকে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের কসাঘাতে ক্লিষ্ট হইয়াও তিনি সঙ্গীতচর্চ্চা ছাড়েন নাই। আমি "নৌকা বিলাস" প্রভৃতি পালা প্রস্তুত করিবার পর তিনি কথকতা প্রণালীতে ভক্তি প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়া "জগাই মাধাই উদ্ধার" "ধ্রুবচরিত্র" "প্রহ্লাদ চরিত্র" "বামণ ভিক্ষা" প্রভৃতি অতি সুন্দর পালা ব্যাখা করিতেন এবং সুকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনে সকলকে মুগ্ধ করিতেন।

তাঁহার প্রথম গুরু ৺ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়। তাঁহারই নিকট তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষা।

মৃত্যুর চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি একজন সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব অল্প ছিল না। রামপুরহাটে তিনি পুলিশপীড়িত বহু যুবককে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীতে উদ্দীপনার তড়িৎ প্রবাহিত হইত। একদা "বল মা বিধির এ কি বিধি" এই গানের দ্বারা জনসংঘকে এত উত্তেজিত করিয়াছিলেন, যে অবশেষে পুলিশ আসিয়া তাঁহার গান থামাইয়া দিল।

শেষবার কলিকাতায় আসিয়া দেহরক্ষার জন্যই যেন স্বধাম নবদ্বীপে সত্বর ফিরিয়া গেলেন। ভক্তেরা আনন্দধামে তাঁহাকে পাইয়া উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন।

শ্রীসুন্দরী মোহন দাস।

স্বর্গীয় সার আশুতোষ চৌধুরী।

১৮৮৬ সালে আমি প্রথম স্বর্গীয় মহাত্মা আশুতোষ চৌধুরীকে জানিতে পারিয়াছিলাম। ১৯০১ হইতে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবার আমার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতম আশা ও আকাঙ্খা এবং তাঁহার দেশ সেবার ও জন সেবার প্রণালী সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। বাংলার তিনি কি ছিলেন তাহা জানিবার সেইরূপ সুবিধা হয়ত অনেকের হয় নাই। বোধ হয় সেই জন্য সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক ঐ স্মৃতির তর্পণে যোগ দিতে আদিষ্ট হইয়াছি। এই অতর্কিত আদেশে বাধ্য হইয়া নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায়, যাহা দেখিয়াছিলাম ও জানিয়াছিলাম তাহারই কয়েকটি কথা বলিবার জন্য, আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়, মৃত মহাত্মার সর্ব্বজনপ্রীতি, ব্যবহার সৌজন্য, জাতীয় শিক্ষা প্রচার, তাঁহার অগাধ অনুরাগ ও অপরিসীম যত্ন, তাঁহার সুকুমার ও সর্ব্বপ্রকার কলা শিল্পের প্রতি অশেষ অনুরক্তির কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার অতুলনীয় সৌভ্রাত্র, তাঁহার, কমনীয় পরিজনপ্রিয়তা, তাঁহার দেশপ্রেম, দীনে দয়া, বিপন্নের সহায়তার অশেষ দৃষ্টান্তের বিস্তৃত বিবরণ আপনারা শুনিয়াছেন। কিন্তু সকলাপেক্ষা যে সাধনায় তাঁহাকে সর্ব্বদা অভিভূত রাখিত, তাঁহার সেই একনিষ্ঠ দেশপ্রেমের কথা শ্রীযুত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় বলিতে গিয়াও থামিয়া গিয়াছেন—কেন না তাঁহার মতে সাহিত্যপরিষদে "রাজনীতির আলোচনা না করাই সমীচীন।" তিনি হয়ত মনে করিয়াছেন সব কথা বলিতে গেলে হয়ত রাষ্ট্রনীতির ভিতরে আসিয়া পড়িতে হয়। কিন্তু জীবিত ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা রাষ্ট্রনীতি স্বর্গগত মহাত্মাদের সম্বন্ধে তাহাই ত ইতিহাস। ইতিহাসের আলোচনায় কখনও

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শোকসভায় পঠিত।

কোনও দোষ হইতে পারে না, সাহিত্য পরিষদেও না। আশা করি সভাপতি মহাশয় আমাকে ঐরূপ ঐতিহাসিক কথার দুই একটা দৃষ্টান্তের অবতারণায় অনুমতি দিতে দ্বিধা করিবেন না। বৰ্দ্ধমানে বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি পরাধীন জাতির রাষ্ট্রনীতি চর্চ্চার ব্যর্থতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই স্মরণ আছে এবং আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মহাশয়েরা সকলেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় কেহই এই সংক্ষিপ্ত চুম্বক মূলসূত্রটির কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মনে হয় মহাত্মাজির Doctrine of non-co-operationএর ইহা একটি খাঁটি পূর্ব্বাভাস। আপনারা আজকাল, পরাধীন জাতির রাষ্ট্রনৈতিক সাধন মন্ত্ররূপে, Passive Resistance, Non-co-operation, Responsive Co-operation, Civil Disobedience প্রভৃতি কত কথাই শুনিতেছেন। আমি এই সকল চুম্বকসূত্র গুলির কোনও বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিব না। কেবল আপনাদের নিকট ইহাই নিবেদন করিতে চাই যে আপনারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে চৌধুরী মহাশয়ের A subject race has no politics কথার মধ্যে এই সব সংক্ষিপ্ত সূত্র স্থান পায় কি না। ভারতব্যাপী আন্দোলনে আজ কাল পথে ঘাটে সর্ব্বত্র যে সব কথার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইতেছে, প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অসীম সাহসিকতার সহিত চৌধুরী মহাশয় দেশের মঙ্গলকামীদের ভিতর অকুতোভয়ে তাহারই পূর্ব্বাভাস ঘোষণা করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক সভা সমিতির কি ব্যবস্থা ছিল, তাহা হয়ত আজ অনেকেরই স্মরণ নাই। ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভা ও ভারত-সভা তখন রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের নেতৃত্বে বাঙ্গালার ভূস্বামীগণ ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার পৃষ্টপোষক। সুরেন্দ্র বাবু ভারতসভার প্রাণ ও কর্ণধার। উভয় সভাই আবেদন নিবেদন লইয়া ব্যস্ত। কংগ্রেস কনফারেন্সেও সেই সব প্রচলিত ধারার অনুসরণে সমস্ত শক্তি প্রার্থনাপত্রের উদ্গিরণে পর্য্যবসিত হইতেছিল। আর ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভা, বেসরকারী সাহেবীদলের সহযোগিতার মোহে দেশদ্রোহিতার সীমায় আসিয়া পৌছিয়া ছিলেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়াও বলিতে পারি যে বাঙ্গলার ভূস্বামীগণ সেই যুগে নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনচিত্ততা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়া ছিলেন। দুর্গতির চরম সীমার উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে অতি হীনভাবে সাহেবী সহানুভূতি আকর্ষণ করার জন্য লর্ড রিপনের খাজনার আইনের খসড়াকে তাঁহারা Ilbert Bill No II বলিয়া প্রকাশ্যভাবে অভিহিত করিয়া ছিলেন। এই সব ব্যবহারে দেশের দুর্গতির প্রতিরোধের জন্য চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গলায় একটি স্বাধীনচেতা ও স্বাবলম্বী মনস্বী সম্প্রদায় গঠনে একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃজন করিয়া বঙ্গদেশের চিন্তার ধারার গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। মৃত মহাত্মার নির্দ্দেশে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় পরলোকগত মহারাজা সূর্য্যকান্ত ও আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে এখনও বর্ত্তমান মহারাজা নাটোর বাঙ্গলার অধঃপতিত ভূস্বামীদের মধ্য হইতে কয়েকটিকে লইয়া এক নির্ভীক, স্বাবলম্বী ও স্বাধীনচেতা সম্প্রদায় গঠন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, লাল-

মোহন ঘোষ, তারকনাথ পালিত, এস্ পি সিংহ, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, সত্যরঞ্জন দাস, চিত্তরঞ্জন দাস, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, রায় পার্ব্বতীশঙ্কর প্রভৃতি প্রবীন ও নবীন ব্যবহারাজীব ও দেশের একনিষ্ঠ সেবক লইয়া সেই মণ্ডলী গঠিত হইয়া ছিল। লর্ড কার্জ্জন যখন Indian Universities Commissionএর সৃষ্টি করিয়া দেশে উচ্চশিক্ষার বিভ্রাট ঘটাইতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তখন ইহারাই চৌধুরী মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে সেই চেষ্টার প্রথম পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ান। তারপর বাঙ্গলা বিধ্বস্ত করিবার দ্বিতীয় অমোঘ অস্ত্র বাঙ্গলা বিভাগ। আজ বিস্তারিত-ভাবে সেই পুরাতন কথার অবতারণা করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে সাহস হয় না, কিন্তু আশা করি আজ সকলেই স্মরণ করিবেন যে মহাপুরুষ সাক্ষাতে ও পরোক্ষে সেই বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই পবিত্র স্মৃতির সম্মান করিবার জন্য আমরা একত্রিত হইয়াছি। এই আন্দোলনে যাঁহারা প্রাণপাত করিয়া অশেষরূপে চৌধুরী মহাশয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন, বিশেষভাবে আজ তাঁহাদিগকেও মনে পড়িতেছে—পরলোকগত একনিষ্ঠ-দেশসেবক ভ্রাতৃযুগল স্বর্গীয় শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষ। কেহ অত্যুক্তি মনে করিবেন না, সেই আন্দোলনেই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে প্রথম সাড়া পড়িল। জন মর্লীর "Settled Fact"এর কথা আপনাদের সকলেরই স্মরণ আছে। সেই আন্দোলনের তরঙ্গ "Settled Fact" কোথায় উড়িয়া গেল। মেমোরিয়াল গেল বটে, কিন্তু আর সেই কার্জ্জনীর গাথুনী তাহাতে রহিল না। জোরের সহিত বলা হইল ইহা সমগ্র বাঙ্গলার অধিবাসীর সমবেত দৃঢ় আকাঙ্খা—ইহা অবশ্যই শুনিতে হইবে It must be heard আন্দোলন বাঙ্গলা হইতে ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল—বাঙ্গলার গৃহকথা ভারতের সম্মিলিত বাণী হইল। মহারাষ্ট্রীয় চিৎ পাবন ব্রাহ্মণ হইতে পঞ্জাবের আর্য্য ও মান্দ্রাজের পঞ্চমা দেশমাতৃকার আহ্বানে জাগিয়া উঠিলেন—আন্দোলনের ঢেউ সজোরে সাগর পারে গিয়া পৌছিল। ভারতের ভাগ্যবিধাতা—লর্ড হার্ডিংকে পাঠাইয়া দ্বিধাবিভক্ত বাঙ্গলাকে জোড়া লাগাইলেন। বাঙ্গালীর নব জীবন লাভ হইল। চৌধুরী মহাশয় চিরদিনের মতন বাঙ্গলার হাওয়া ফিরাইয়া দিতে সক্ষম হইলেন। আজ আপনাদের স্মরণ করা উচিত কাহার অদম্য চেষ্টায় ও অসীম সাহসিকতায় খাটোয়াদের সেই নির্ব্বাণোন্মুখ লক্ষ্মীতুলসী কাপড়ের কল বাঙ্গলার বঙ্গলক্ষ্মী মিলে পরিণত হইয়াছিল। "স্বদেশীর" প্রতিজ্ঞা বৃদ্ধ প্রৌঢ়ের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া যুবক ও বালক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিস্তার করিয়া চলিল। ঘরে ঘরে Hatersey loom ও fly shuttle loom এর আবির্ভাবের আয়োজন হইল। চৌধুরী মহাশয় গ্রামে গ্রামে সুতা যোগাইয়া এই সব তাঁত বাচাইয়া রাখিলেন। স্বদেশী জিনিষের ডাক পাতিয়া গেল। খাঁটী দেশী মাল সরবরাহ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান ষ্টোরের সৃষ্টি হইল। আর চামড়া ট্যানিং শিখাইবার জন্য চৌধুরী মহাশয় নিজব্যয়ে মান্দ্রাজে পরলোকগত দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরীকে পাঠাইলেন। ইনি দেশী ট্যানিং কিছু কিছু জানিতেন। কাজেই খুঁজিয়া তাহাকেই বাহির করা হইল। দেবেন বাবু ট্যানিং শিখিয়া ফিরিয়া আসিলে চৌধুরী মহাশয় ও আরও চারিজন লোকের প্রদত্ত সামান্য মূলধন লইয়া

একটি ছোটখাট ট্যানিংয়ের কারখানা চারিনম্বর পুলের নিকট খোলা হইল। দেবেন চৌধুরী সেই কারখানার অধ্যক্ষ ও expert হইলেন। দেবেন বাবু কিছুকাল পর ডাক্তার নীলরতন সরকারের নিকট এই ক্ষুদ্র কারখানা বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। জানি না আজ কয়জনে জানেন যে সেই ক্ষুদ্র আয়োজন হইতে আজ এই সুবৃহৎ National Tannery দাঁড়াইয়াছে। সুদক্ষকর্ম্মী মিঃ বিরাজ মোহন দাসের তত্ত্বাবধানে ও গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় আজ ইহা প্রকাণ্ড মহীরুহ। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কথা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। জাতীয় শিক্ষাবিধানে ব্যবহারিক শিক্ষার স্থান কত প্রয়োজনীয় তাহা চৌধুরী মহাশয় বিশেষরূপে জানিতেন বলিয়াই Bengal Technical Institute এর প্রতিষ্ঠা। পরলোকগত তারকচন্দ্র পালিত ও ডাক্তার নীলরতন সরকারের প্রবর্ত্তনে Bengal Technical Instituteএ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রধান পরিণতি।

আজ যে বাঙ্গালী "স্বদেশী", আজ যে বাঙ্গলার যুবক স্বাবলম্বী হইবার আকাঙ্খা দেখাইতেছে, ইহার সকলের গোড়ায় স্বর্গীয় চৌধুরী মহাশয়ের একনিষ্ঠ চেষ্টা ও অনুপ্রাণনা। আজ যে আমরা বঙ্গলক্ষ্মীমিল, ন্যাসেনেল ট্যানারী, বেঙ্গল টেকনিকেল ইনিষ্টিটিউট প্রভৃতি যে সমুদয় প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গলার জাগরণের পরিচয় পাই তার সবগুলির মূলেই তিনি।

আজ আরও মনে হয় তাঁহার সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান "রাখিবন্ধন", আনন্দসভা, সঙ্গীত ও শিল্পকলার সমাবেশ। ইহাদের সকলেরই মূলে তাঁহার ঐকান্তিক দেশ-প্রাণতা। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি; কেননা দিগ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালী জাতিকে উপনিষদের রম্যকাননে ফিরাইয়া নিতে ইহাই যুগ প্রবর্ত্তক রামমোহন রায়ের প্রধান প্রচেষ্টা। তিনি Oriental Art Societyর পৃষ্টপোষক, কেননা সেই সুকুমার কলা তাঁহারই দেশের অজন্তা, ইলোরা, বেশনগর, মামলাপুরাম, এলিফান্টা, বোরোবোদুর (Borobodur) প্রভৃতির প্রাচীন আদর্শের লুপ্তোদ্ধারের সুবৃহৎ আয়োজন। রাফেল, রানোওের পদানুসরণ না করিয়া দেশী-কলম তুলিয়া লইবার প্রতিষ্ঠান। পিয়ানো, হারমোনিয়াম ও গ্রামোফোনে যখন দেশ প্লাবিত তখন তাঁহারই চেষ্টায় বাঙ্গালী মোজার্ট হাণ্ডেল ও জোয়াকিমকে ছাড়িয়া আবার তানসেনের তানপুরা আর তামিলের বীণ্‌ মৃদঙ্গ পাখোয়াজের সঙ্গতে সুর মিলাইয়া শ্মশান ভারতে প্রাচীন রাগরাগিনীর স্বরালাপের সূত্রপাত করিয়াছে। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে সর্ব্ববিষয়ে হৃত গৌরবের পূর্ব্বাভাস দেখাইয়া জাতির চিন্তার ধারা এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে দেশপ্রাণতায় ফিরাইয়া নিতে যিনি নিজের অতুল শক্তি অকপটে অজস্রভাবে ঢালিয়া দিয়াছিলেন আজ তাঁহার শোকে সমবেদনা জানাইতে পরিষদের এই বিশিষ্ট আয়োজন।

জীবনের শেষ অধ্যায়ের দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। বাঙ্গলার বিপ্লবযুগের দুই একটি কথা না বলিলে এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। সরকার বাহাদুর তখন উন্মার্গগামী বাঙ্গলী জাতিকে ও বিধ্বস্ত বাঙ্গলা দেশকে শান্ত করিতে ব্যস্ত। Minto-Morley, Montford, প্রভৃতি নানারূপ মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা হইতেছে, দ্বিধা-বিভক্ত শাসন-তন্ত্রের মোহে কত কর্ম্মী মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। বাঙ্গালীকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদের লোভ দেখাইয়া প্রচলিত শাসনপ্রণালীর অনুরাগী করার চেষ্টা হইতেছে।

এস, পি, সিংহ সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিয়া হাইকোর্টের ব্যবসা ছাড়িয়াছেন। চৌধুরী মহাশয়ের ব্যবসা ক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রতাপ, বিপুল অর্থ আসিতেছে, আর অর্থ হইতেও তাঁহার নিকট অধিকতর আদরণীয় দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা, তাঁহার নায়কত্ব ও উপদেশ পরামর্শের প্রার্থনায় তাঁহাকে চারিদিক হইতে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সেই সময় সুচতুর Sir Lawrence Jenkins কে দ্বিতীয়বার হাইকোর্টের কর্ণধার করিয়া পাঠান হইল। বিলাতী শাসন পরিষদ ইহা বাঙ্গলা শান্ত করার একটি বিশিষ্ট উপায় মনে করিয়া ছিলেন। Sir Lawrence Jenkins রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র হইতে এই তেজস্বী মনস্বীকে বিচারকের উচ্চ আসনে বসাইতে অতিমাত্রায় উদ্যোগী হইলেন। জেঙ্কিসের নানারূপ বাকজালে ও মন্ত্র কৌশলে চৌধুরী মহাশয় বিপুল অর্থ ও জাতির ভবিষ্যত পশ্চাতে ফেলিয়া হাইকোর্টের বিচারাসনে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন। আমরা আমাদের নেতা ও নিয়ন্তা হারাইলাম। তাঁহার বিচারাসনের কার্য্যের সম্বন্ধে কোনও কথা বলার আমার অধিকার নাই। কালপূর্ণ হইলে তিনি পুনরায় ব্যবসা-ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃত স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না। সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য ও পরিশ্রান্ত দেহ লইয়া তিনি আর একবার দেশ সেবার জন্য পরিশোধিত বাঙ্গলা-শাসন-পরিষদে ঢুকিলেন কিন্তু আর তেমন করিয়া কিছুই ধরিতে পারিলেন না। আজ ঐসব কথার আলোচনার সময় নহে। আমাদের আজ কেবলই মনে হইতেছে এই নীরবকর্ম্মী প্রথম ও মধ্য জীবনে নানারূপে নানাভাবে জীবন্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে, দ্বিধা বিভক্ত বাঙ্গলাদেশকে, হতাদৃত প্রাচীন কলা শাস্ত্রকে, গতগৌরব শ্রমশিল্পকে পুনরায় দেশে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে কত অধিক কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া গিয়াছেন। শোকাচ্ছন্ন আমরা তাঁহাকে চিরদিনের মত হারাইয়াও তাহার কর্ম্মময় জীবনের সর্ব্বোতোমুখী সফলতার প্রমাণ পাইয়া আশ্বস্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি। পূর্ণব্রত কর্ম্মবীর নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনন্তশয্যায় চিরশান্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অমর আত্মার আশীর্ব্বাদ তাঁহার দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বর্ষিত হউক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মনুষ্যজীবনের কর্ম্ম শেষ করিয়া 'অমানব লোকে' প্রয়াণ করিলেন; মানুষের জীবনে ইহা নূতন ঘটনা নয়। 'জন্মিলে মরিতে হইবে' ইহা অলঙ্ঘনীয় বিধান। কত আসিতেছে—কত যাইতেছে; এরূপ আবার কত আসিবে যাইবে; কাজেই এরূপ আসা যাওয়া ব্যাপার সাধারণ অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের মনে কোনরূপ গভীর রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য সমাজ প্রায়ই ইহার হিসাব নিকাশ লইয়া মাথা ঘামাইতে ইচ্ছা করে না; কারণ তাহাতে সমাজের বড় কিছু আসে যায়

না। যেমন একটী চলিয়া যায়, পর মুহূর্ত্তেই আবার একটী আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করে। কিন্তু সময়ে সময়ে এই মানুষের মধ্যেই এমন একটী মানুষের আবির্ভাব হয়, যাঁহার আবির্ভাব বা তিরোভাবের ব্যাপারটীকে সাধারণপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া মনুষ্য সমাজ উদাসীন থাকিতে পারে না, তাঁহারা যখন আসেন তখন যেমন তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীর স্থান পূর্ণ করিতেই আসেন না, তাহা হইতে অনেক উচ্চ, অনেক মহান্, বিধাতার একটী নূতন সৃষ্টি রূপেই প্রতিভাত হন, আবার যখন চলিয়া যান, তখন তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিতেও আর বড় কেহ আসে না। যাহারা আসে তাহারা তাঁহাদের তুলনায় বড় ক্ষুদ্র, বড় নগণ্য; কাজেই এ শ্রেণীর মানব বা মহামানবের আবির্ভাব ও তিরোভাবে সমাজের মধ্যে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাদ্বারা সমাজের মূলদেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হয়, আর সে কম্পন দুমাস ছমাস বা দু দশ বৎসরেই প্রশমিত হয় না। যুগের পর যুগ ধরিয়া তাহা সমানভাবেই চলিতে থাকে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ দেশে এই শ্রেণীর মানব বা মহামানব। তাঁহার বিয়োগে এ দেশে আজ যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে—দু'দশ দিনে বা দু দশ বৎসরেই তাহা প্রশমিত হইবে না; কারণ তাঁহার অভাব যে বড় অভাব, সে অভাব যে পূর্ণ হইবার নয়।

আশুতোষ যে কেবল বাঙ্গালার পুরুষশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা নহে, তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার মনস্বিতা যে কেবল বাঙ্গালীরই সম্পত্তি ছিল তাহা নহে, তাহা সমগ্র মনুষ্যসমাজেরই সম্পদ। কোন একটা ক্ষুদ্র জাতি বা কোনও ক্ষুদ্র প্রদেশের আকাঙ্খা পূর্ণ করিবার যোগ্য শক্তি সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সেই জাতির পুরুষ বা প্রাদেশিক পুরুষরূপে গণ্য হইতে পারেন, কারণ, তাঁহাদের শক্তি সেই ক্ষুদ্র জাতি বা প্রদেশ বিশেষের আকাঙ্খা পূরণেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়, কিন্তু যাঁহারা তদপেক্ষা অধিক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, একটা জাতি বা একটা প্রদেশের আকাঙ্খা পূরণেই যাঁহাদের শক্তি নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া যায় না, যাঁহাদের শক্তি সমগ্র মনুষ্য সমাজের আকাঙ্খা পূরণে সমর্থ, তাঁহাদিগকে কোনও একটা বিশেষ জাতির বা প্রদেশের মনুষ্য বলিয়া মনে করা সঙ্গত নয়। এই হিসাবে আশুতোষকে কেবল বাঙ্গালারই একটী বিশিষ্ট সম্পদ বলিয়া মনে করিলে তাঁহার সম্বন্ধে অবিচার করা হইবে। বিশ্বের আকাঙ্খা পূর্ণ করিবার যোগ্য শক্তি লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে যে মনীষা, যে প্রতিভার অভাব হইয়াছে, তদ্দ্বারা কেবল যে বাঙ্গালা দেশ বা বাঙ্গালী জাতিই হতশ্রী হইল তাহা নহে—তাহাতে সমগ্র মনুষ্য সমাজই হীনপ্রভ হইয়াছে।

আশুতোষ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলাদেশের অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ বংশ। ইঁহার বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে জিরেট বলাগড় গ্রামে আসিয়া অধিবাস করেন। এই বলাগড় হইতে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য ৮০।৮৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া ভবানীপুরে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাস করেন। এই সময়ে ইনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ছিলেন।

১৮৬৪ সালের ২৮ এ জুন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষ ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। হেমন্তকুমার তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। শৈশবে তাঁহার স্বাস্থ্য খুব খারাপ ছিল, রোগ তাঁহার লাগিয়াই ছিল। শরীরে বল লাভের জন্য কয়েক মাস তাঁহাকে মথুরায় থাকিতে হইয়াছিল। তখন তিনি কোন বিদ্যালয়ে পড়িতেন না। নয় বৎসর বয়সেও তিনি বাড়ীতে পড়াশুনা করিতেন। পিতার যত্ন ও চেষ্টায় এই অল্প বয়সেই তাঁহার অদ্ভুত গুণাবলী বাহিরে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, বয়স যখন তাঁহার সবে মাত্র নয় বৎসর, তখন তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির চারিটী ভাগ (Book) পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন; এমন কি জ্যামিতির সমস্ত অনুশীলনীগুলি তিনি স্বচ্ছন্দে প্রমাণ করিতে পারিতেন। বীজগণিতের সমীকরণ (Equations) গুলিও তিনি সহজেই কষিতে পারিতেন। ইহা হইতেই দেখা যায় তিনি কি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন, তাঁহার অদ্ভুত বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ বিকাশের জন্য তাঁহার গুণগ্রাহী পিতা তাঁহাকে গণিতবিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসকল কিনিয়া দিতেন। ঐ সমস্ত পুস্তক হইতে বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের সমাধান করিয়া খাতায় বেশ ভাল করিয়া তিনি লিখিয়া রাখিতেন। শৈশব হইতেই তিনি বিশেষ কালনিষ্ঠ ছিলেন। একটী মুহূর্ত্তও তিনি বাজে নষ্ট করিতেন না। উত্তর কালে তিনি যে গভীর জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া পূর্ণবিকশিত কুশাগ্র ধীর প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ পুত্র দুইটীকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার পিতার প্রগাঢ় যত্ন ও ঐকান্তিক আগ্রহ। কেবল পুঁথিগত বিদ্যার ও তাহার প্রভাবলাভে আমরা যেরূপ নিষ্ঠাবান তাহাতে প্রকৃত শিক্ষায় নানারূপ অসুবিধাই হইয়া থাকে। কিন্তু আশুতোষের পিতা তাঁহাকে সযত্নে শৈশব হইতে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। তাঁহার নিজজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে স্বাধীন চিন্তা প্রণালী ব্যতীত যথার্থ শিক্ষালাভ করা যায় না। তাঁহার এই চিন্তা পদ্ধতি আশুতোষের অন্তরে এমনি বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল যে তিনি যাবজ্জীবন মৌলিক গবেষণা পরিপোষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্কুলে পড়িবার সময় তাঁহার পিতা স্বীয় পরিপক্ক অভিজ্ঞতা দিয়া তাঁহার বিদ্যানুশীলনের সহায়তা করিতেন। বড় বড় লোকের জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া পুত্রের কল্পনাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিতেন। সময়ের অপব্যবহার করা যে মহাপাপ তাহাও তিনি তাঁহার হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ভাগের ২৫শ প্রতিজ্ঞার এক নূতন প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয়স্বরূপ এই প্রমাণ ১৮৮০ সালে Combridge Messenger of Mathematicsএ প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর। ইহার পূর্ব্ব বৎসর তিনি ভবানীপুর সাউথ সুবর্ব্বন্ স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ এ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি গণিতশাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে এম্ এ পরীক্ষার উপযোগী জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষার পূর্ব্বে তাঁহার কঠিন পীড়া হওয়ায় তিনি আশানুরূপ স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৮৪ সালে ২০ বৎসর বয়সে তিনি বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও প্রথম স্থান অধিকার

করিয়া গণিতে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর বৎসর (১৮৮৬) তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া ৮,০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসর তিনি পদার্থ বিজ্ঞায়ও এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৭ সালে তিনি এম্ এ পরীক্ষায় গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। এই বৎসর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্তকুমারের মৃত্যু হয়। ১৮৮৮ সালে সিটি কলেজ হইতে তিনি বি এল পরীক্ষা দেন। কিন্তু পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে (১৮৯৪) ৩০ বৎসর বয়সে আশুতোষ Honours in Law পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া D. L. উপাধি লাভ করেন।

১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাস হইতে আশুতোষ কলিকাতা হাইকোর্টে (appellate side এ) ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তখনকার বড় বড় counselদের Junior হইয়া তিনি এত সাবধানতা ও দক্ষতার সহিত কাজ করিতেন যে তাঁহাদের আশুতোষ না হইলে চলিত না। সাত বৎসরের মধ্যে তিনি হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবদের মধ্যে অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়া এক নামজাদা ব্যবহারাজীব হইলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি Togore Law Lecturer নিযুক্ত হন। তিনি তিন তিন বার Tagore Law Gold Medal প্রাপ্ত হন। বিচারালয়ে যাহা কিছু যশোলাভ করা যায় একে একে তিনি সমস্তই পাইলেন। ১৯০৪ সালে তিনি অস্থায়ী বিচারপতির আসনলাভ করেন। ঐ পদে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া বরাবর প্রতিষ্ঠার সহিত কার্য্য করেন।

১৮৮৬ সালে ৫ই মে তারিখে তিনি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য মনোনীত হন। তাহার পূর্ব্বেই তিনি F. R. A S ও F. R. S. E. হইয়াছিলেন। তিনি ১৯০৮ সালে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। ঐ পদে তিনি আটবার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সভায় তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অপ্রতিহত ছিল। ১৮৮৯ সালে Lord Landsdowne তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য (fellow) নিযুক্ত করেন। ইহার দুই মাস পরে সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৬ সাল বাদে তিনি আমরণ প্রতি বৎসর সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ সালে তিনি প্রথম পরীক্ষক নিযুক্ত হন। চারি বৎসর উপর্য্যুপরি পরীক্ষক থাকেন। ১৮৯৬ সালে এম্ এ পরীক্ষায় গণিতের পরীক্ষক হন। ১৮৯০ ও ১৮৯৬ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

১৮৯৯ সালে এবং পুনরায় ১৯০১ সালে এই দুইবার তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। ১৯০৩ সালে আবার তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ বড়লাটের সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ঐ বৎসর তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলর পদে আসীন হইয়া আশুতোষ শিক্ষাসংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে যথেষ্ট সংস্কার করিয়াছেন।

আশুতোষ রচিত প্রবন্ধাবলী

১। **A paper on an important generalization of a theorem of Dr. Salmon on Conic Sections...Cambridge Messenger of mathematics, 1883.**

২। **A geometrical proof of a fundamental theorem on Elliptic Functions—The Quarterly Journal of Mathematics, 1885.** [পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে প্রমাণগুলি বড়ই জটিল ছিল। Dr. Cayley ইহাকে বিশেষ সহজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।]

৩। **On the Differential of a Trajectory (with a woodcut) —J. A. S. B. 1887.**

৪। On Monge's Differential Equation to all Conics—J A. S. B. 1887.

৫। A Memoir on Plane Analytic Geometry (with three wood cuts) J. A. S. B. 1887.

৬। A General Theorem on the Differential Equations of Trajectories--J. A. S. B. 1888.

৭। On Poisson's Integral (with a woodcut)—J. A. S. B. 1888.

৮। On the Differential Equation of all Parabolas—J. A. S. B. 1888.

৯। The Geometric Interpretation of Monge's Differential Equation to all Conics—J. A. S. B. 188৯. ["Nature" পত্রে এই সম্বন্ধীয় একটী প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল।]

১০। Some applications of Elliptic Functions to Problems of mman Values (first paper) with a wood cut—J A. S. B 1889.

১১। ঐ ঐ (2nd paper)—J A. S. B. 1889.

১২। On Clebsch's Transformation of the Hydrokinetic Equations—J. A. S. B. 1890.

১৩। Note on Stokes's Theorem and Hydrokinetic Circulation J. A. S, B. 1890.

১৪। On a curve of Aberrancy—J. A, S. B. 1893

১৫। ১৮৯৪ সালের The Indian Engineering পত্রে তাঁহার তিনটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

[এ গুলির মধ্যে Interpretation of Curves সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটীর জ্যামিতিক পদ্ধতি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া মুদিত হয়]

আশুবাবু চারিবার বাঙ্গালায় তিনটী প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। দুইবার সাহিত্য সম্মিলনে, একবার কৃত্তিবাসের জন্মভূমিতে তদীয় স্মৃতিউৎসবে এবং আর একবার মাইকেলের বার্ষিক উৎসবে। এই কয়টী অভিভাষণই মুদ্রিত হইয়াছে।

আশুতোষের গ্রন্থাবলী

১। Conic Sections

২। Law of Perpetuities

৩। জ্যোতিষবিষয়ক একখানি গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন।

আশুতোষের সাহিত্যানুশীলন

বিদেশী সাহিত্যেও আশুতোষের অধিকার ছিল। ইংরেজী ভাষায় অনূদিত য়ুরোপীয় সাহিত্যে তিনি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আশুতোষ ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কার্য্য পরিচালনোপযোগী জর্ম্মাণভাষাও কিছু তাঁহার জানা ছিল। আরবী ভাষায় তিনি সাহিত্যাদি বেশ পড়িতে পারিতেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়ছিলেন। তিনি হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রসকল মূল সংস্কৃত ভাষাতেই পাঠ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ অধিকার দেখিয়া নদীয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধি মণ্ডিত করিয়াছিলেন। সিংহলের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণও তাঁহার বিশ্বাবত্তায মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের গৌরবজনক 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী' উপাধি প্রদান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন।

মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। অবসর অভাবে যদিও তিনি মাতৃভাষার তাদৃশ সেবা করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি মাতৃভাষার জন্য যাহা করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। তিনি মাতৃভাষার গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্, এ পরীক্ষায় মাতৃভাষার স্থান করিয়াছিলেন এবং তন্নিম্ন পরীক্ষা গুলিতে বঙ্গভাষা অবশ্য পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহার জন্য বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষাভাষী মাত্রই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এক সময়ে কৃত্তিবাস, কাশীদাস ও মধুসূদনের গ্রন্থপাঠ তাঁহার নিকট বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সহকারী সভাপতি হইয়া কাশীদাসী মহাভারত সম্পাদনে ব্রতী হইয়া প্রথম খণ্ড পরিষৎ হইতে প্রকাশ করেন। সাহিত্য সভারও তিনি একবার সভাপতি হইয়াছিলেন।

নির্ভীকতায় আশুতোষ অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সঙ্কল্প হইতে কেহই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেন না। ১৯০৮ সালে যখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিতে হইবে, তখন তাঁহার সঙ্কল্প হইতে কেহ তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। ঐ বৎসরই সহস্র বাধা ও তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেদিন বাঙ্গালার লাটকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে কিরূপ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি হুজুগে স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ স্বদেশবৎসল খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অশনে বসনে তিনি খাঁটী হিন্দুত্বেরই পরিচয় দিতেন। বিদেশী পরিচ্ছদ ও বিদেশী আহারের তিনি কখনও পোষকতা করিতেন না; বাঙ্গালা দেশ আশুতোষকে হারাইয়া যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

শ্রীসত্যব্রত বর্ম্মা

পরলোকে আশুতোষ

জগতে সর্ব্বযুগে, সর্ব্বকালে এমন দুই একটী মহাত্মার আবির্ভাব হয়, যাঁহারা অন্য সকল হইতে স্বতন্ত্র, তাঁহাদের জীবন বাত্যাতাড়িত ধূলিরাশির মত নয়, বীচীবিক্ষোভচালিত তৃণখণ্ডের মত নয়। তাঁহারা অসাধারণ শক্তিধর, প্রভঞ্জনের মত আসিয়া জগতের সকল বিধি-ব্যবস্থা ওলট্ পালট্ করিয়া নূতন করিয়া নিজের ইচ্ছামত গড়েন। এই সকল মহাপুরুষের নাম যুগপুরুষ দেওয়া যাইতে পারে। ইঁহাদের সকলেরই কার্য্যক্ষেত্র এক হইবে এরূপ কোনও কথা নাই, কাহারও কর্ম্মক্ষেত্র রাজনীতি, কাহারও বা কোনও নির্দ্দিষ্ট সমাজ, কেহ বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে নিজের সকল শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই শুধু আপনাপন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না—সকলেই যুগটার উপর নিজের ছাপ রাখিয়া যান।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এমন একজন শক্তিধর পুরুষ। রাজনীতির বাগ্‌বিতণ্ডামুখর মন্ত্রণাগার কিম্বা অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দপরিবেষ্টিত বক্তৃতামঞ্চ তাঁহার স্থান ছিল না—সমাজের নানাবিধ দোষ ত্রুটি তাঁহার সমগ্র মন আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাঁহার জীবনযজ্ঞ শুধু একই দেবতার মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ছিল—শুধু এক চিন্তা, এক কর্ম্ম তাঁহার দিবসের সাধনা, রাত্রির স্বপ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেবী সরস্বতীকে কি করিয়া বঙ্গীয় যুবকজের চিত্তমন্দিরে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় ইহাই ছিল তাঁহার জপ তপ, সাধন ভজন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। দিনক্ষণ, সন বৎসর, ইহাদের কোনও বিশেষ অর্থ আছে কিনা জানি না, কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের যাঁহারা ভাগ্যনিয়ন্তা, যাঁহারা ইহাকে গড়িয়াছেন, যাঁহাদের প্রভাব আজও দেশে সমভাবে ক্রিয়া করিতেছে—তাঁহাদের সকলেরই জন্ম হইয়াছিল ১৮৬০—৭০ এই দশকে। কলিকাতায় ধনীর গৃহে তাঁহার জন্ম—ছাত্র জীবনে তাঁহাকে দেখি জ্ঞানানুসন্ধানে লিপ্ত। তাঁহার সহাধ্যায়িগণের নিকট শুনিতে পাই ছোট্ট একটি ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া তিনি বাড়ী হইতে কলেজে আসিতেন, এবং ফিরিতেন এক গাড়ী বই লইয়া। শুধু বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়েই তাঁহার মন আবদ্ধ ছিল না—সকল বিষয়ের জ্ঞানই তাঁহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলেজে তিনি পড়িতেন Philosophy, আর বাড়ীতে পড়িতেন Physics—এবং বাড়ীতে তাহা এমনই ভাবে পড়িতেন যে কলেজে কোনও সহপাঠীকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া তাঁহার নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল।

প্রশংসার সহিত পরীক্ষা কয়টি উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া চাকুরী দিতে চাহিলেন। আশুতোষ তাহা লইতে স্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন—যদি কলিকাতা হইতে বাহিরে কোথাও যাইতে না হয়, আর যদি Imperial serviceএ ৫০০৲ পাঁচশত টাকা মাহিয়ানায় নিযুক্ত করা হয়, তবে তিনি ভাবিয়া দেখিতে পারেন। বলা বাহুল্য, ডিরেক্টর সাহেব এই দুইটির কিছুতেই রাজী হইতে পারিলেন না; বলিলেন, How can that be? The exigencies of service may require your presence either at Cuttack or Chittagong. তখনকার দিনে ঐ দুইটি স্থান ছিল দুর্গম। আশুতোষ তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে ডিরেক্টার সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া নিজের অভিজ্ঞতা বলিলেন, তিনি বিলাত হইতে আমদানী হইয়াছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শন অধ্যাপনা করিবার জন্য, কিন্তু হঠাৎ একদিন গেজেট খুলিয়া দেখিলেন, তাঁহাকে ঢাকাবিভাগের স্কুলসমূহের ইন্‌স্‌পেক্টার করিয়া বদলি করা হইয়াছে! তিনি তখনকার ডিরেক্টারের কাছে গিয়া ইহার প্রতিবাদ করিলে, ডিরেক্টার সাহেব ধীরভাবে বলিলেন,—My dear Sir, have you brought in your resignation? এই তো সরকারী চাকুরীর অবস্থা। আশুবাবু চাকুরী প্রত্যাখ্যান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন—তাঁহার পিতার কাণে যখন এই কথা গেল, তখন তিনি পুত্রকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। তার পরে আশুতোষের ওকালতী আরম্ভ;—প্রথমত কিছুই হইত না, কিন্তু পরে ঢাকার নবাবের এক মোকদ্দমায় তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; তার পরে দ্রুতবেগে উন্নতির তুঙ্গ শিখরে তাঁহার গতি। রাজকীয় বিভাগে আইন শাস্ত্রে বাঙ্গালী যতদূর উঠিতে পারে তাহা তিনি উঠিয়াছিলেন। যখনই তাঁহার লেখনী হইতে কিছু বাহির হইত তখনই আমরা একটা পুরুষের উক্তি পাইতাম। স্বাধীনচেতা, সতেজ জ্ঞানগর্ভ কিছু পাইতাম। তা' সে বরেণ ঘোষের রায়ই হউক, আর লিটন্ সাহেবের পাল্টা জবাবই হউক, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণই হউক, আর মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে প্রদত্ত বিহার উড়িষ্যা গবেষণাসমিতির বক্তৃতাই হউক। বিচারাসন হইতে মাত্র কয়মাস অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ ভাবে নাই যে তিনি এমন ভাবে অতর্কিতে চলিয়া যাইবেন। দেশের জন্য, দশের জন্য, শিক্ষার জন্য তিনি আরো অনেক কিছু করিবেন, যাহা করিয়াছেন তাহার ভিত্তি দৃঢ় করিবেন ইহাই দেশের লোক আশা করিয়াছিল।

সারাজীবনই তাঁহাকে লোকের বিরাগ সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু সকল প্রকার নিন্দাবাদের মধ্যেও তিনি স্থির অবিকল থাকিতে চেষ্টা করিতেন। কলেজে যখন পড়িতেন, তখন ভবানীপুরের Wrangler বলিয়া এবং তাঁহার নানা বিষয়ের চর্চ্চাকে audacity মনে করিয়া সহপাঠীরা বিদ্বেষবশতঃ তাঁহাকে উপহাস করিত। M. A পাশ করিবার পরই যখন তাঁহাকে M. A.র পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয় তখনও ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন হইয়াছিল।

পরে যখন বিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ দেন, তখনও সহস্রকণ্ঠে জনসাধারণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। অসহযোগ আন্দোলনে যখন বিশ্ববিদ্যালয় টলমল করিতেছিল, তখন স্যার আশুতোষই লোকমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করেন। জীবনের শেষ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে কতই না প্রতিকূল সমালোচনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই আত্মস্থ কর্ম্মনিষ্ঠ নরশার্দ্দুল কিছুতেই আপন কর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই, যাহা নিজে ভাল বুঝিয়াছিলেন, তাহার পোষকতাকল্পে জনমত উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। সেই যে তিনি বলিয়াছিলেন Timidity never appeals to me. But boldness does. Boldness first, boldness second, boldness always.—তাহাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। পরে যখন বঙ্গীয় রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধারের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইতে হয়, তখনও তাঁহার এই অদম্য আত্মবিশ্বাস এতটুকু টলে নাই। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, যে পথে গেলে ভাল হইবে মনে করিয়াছেন, রাজরোষ, লোকাপবাদ কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া সোজা সেই লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন। "দুটো চোখ, দুটো কান, কিন্তু একটা মুখ—শুধু উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা"—স্বামীজীর এই কথা কয়টি যেন তাঁহারও কথা ছিল।

কিন্তু এই উপেক্ষার সহিত তাঁহার মনে অন্য কোনও ভাব ছিল না, সাম্প্রদায়িক ভাব, বা কোনও প্রকার সঙ্কীর্ণতা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। যেখানে গুণের পরিচয় পাইয়াছেন তাহারই আদর করিয়াছেন, তা সে গুণী ইংরেজই হউন, আর মারাঠীই হউন, পার্শী হউন, আর দ্রাবিড় হউন, আমেরিকান হউন, আর ফরাসি হউন। এক কথায়, তাঁহার নিষ্ঠা ছিল—সঙ্কীর্ণতা ছিল না।

লর্ড কার্জ্জনের সময় যখন ইউনিভার্সিটি বিল পেশ করা হয়, তখন আশু বাবু ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহোদয়, দুই জনেই ছিলেন রাষ্ট্রীয় পারিষদের সদস্য। উভয়েই কর্জ্জন সাহেবের বিলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোখলে মহোদয় সারাদিন ইউনিভার্সিটির কথা পড়িতেন, ভাবিতেন, আলোচনা করিতেন, ইউনিভার্সিটির কাযে তাঁর মন প্রাণ পড়িয়া থাকিত, আর আশুবাবুর ওকালতী ছিল, নানা রূপ সভাসমিতি ছিল, ইউনিভার্সিটির কায কর্ম্ম ছিল, সেই সঙ্গে বিল সম্বন্ধীয় আলোচনা তাঁহার স্থির হইয়া থাকিত। দেশবন্ধুর সেই অভিমত "greater than a mere educationist"—অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভারতবন্ধু তিনি ছিলেন কি না তাহার শুধু ভাবজগতেই পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি যে ছাত্রবন্ধু ছিলেন, সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে ছাত্রেরা যে তাঁহার কাছে যাইত এবং গেলেই সাহায্য মিলিত, তাহা বঙ্গের ছাত্রবৃন্দ জানিত। অনেক সময় হয়ত ছাত্রদের জন্য কিছু বলিতে গিয়া তিনি নিন্দাভাজন হইয়াছেন। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজের হিন্দু হোটেলের ছাত্রদের সঙ্গে সরস্বতী পূজার বিসর্জ্জনের দিন পুলিসের মারামারি হয়। মিছিলের মধ্য হইতে ৭।৮ জন ছেলেকে কনষ্টেবলরা থানায় আটকাইয়া রাখে ও তাহাদিগকে নির্দ্দয় ভাবে মারিতে থাকে। আশুতোষ এই খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। আর একবার, ফুলারি আমলে, কি তাহার কিছু পরে আসামে কোন এক স্কুল হষ্টেলে ইন্‌স্পেক্টার সাহেব টেবিলের উপরে যে কাগজ ছিল, তাহাতে 'বোমা' (তখন মেদিনীপুরের মোকদ্দমা বিচারাধীন ছিল) এই কথাটি ছাপার অক্ষরে দেখিতে পান, এবং ইহার জন্যই এইরূপ খবরের কাগজ দিয়া টেবিল ঢাকার জন্যই ছেলেটিকে সেই প্রদেশের স্কুলসমূহ হইতে বাহির করিয়া দেন। ছেলেটি অনেকস্থানে দরবার করিয়াও কিছু করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া অবশেষে আশুবাবুর শরণাপন্ন হয়। আশুবাবু তাহাকে কলিকাতারই কোনও স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন, এবং যতদিন তাহার অন্য কোনও

ব্যবস্থা না হয়, ততদিন নিজের বাড়ীতেই তাহাকে রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি তাঁহার নখ দর্পনে; তাই তিনি কোথায় কি করিলে ভাল হয় তাহা অন্য সকলের অপেক্ষা ভাল বুঝিতেন। ছাত্রদের সুখসুবিধার প্রতি তাঁহার সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকিত, এবং অনেক সময় ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য, আর কাহারও ক্ষতি না করিয়া, তিনি অনেক কিছু করিয়াছেন। যখন তাঁহার সময় ছিল, তিনি ছাত্রাবাসে নিজে গিয়া দেখাশুনা করিতেন। সকলেরই তাঁর নিকট অবারিত দ্বার ছিল। তাঁহার সকল অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা—তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশীরা পর্য্যন্ত যে নামে ডাকিত—তাহা হইতেই অনুমেয়—তাহাদের কাছে তাঁহার নাম ছিল 'জজ বাবু'। "সাহেব" তিনি কোনও দিনই হন নাই। মাতৃ ভাষার প্রতি, স্বজাতির প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল তাহা সর্ব্বদা সুপরিস্ফুট থাকিত। যাকে বলে aggressive nationalism তাহাই তাঁহার ছিল। তাঁহার অভাবে আজ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে সমাবৃত।

লোকে যাকে বলে ইন্দ্রপাত, তাহাই হইয়াছে। একজন দিকৃপাল অনন্ত রহস্যময় গহ্বরে অন্তর্হিত হইয়াছেন। সারাজীবন, বা তাহার অধিকাংশ সময়ই, কলিকাতায়, পরিবারের মধ্যে কাটাইয়া কলিকাতার বাহিরে অধিকাংশ আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে যে এমন ধারা সর্ব্বনাশ ঘটিবে, তাহা কে মনে করিয়াছিল? তাঁহার জীবনী লিখিবার, তাঁহার কৃত কর্ম্মের মূল্য নিরূপণের সময় এখনও আসে নাই। তাঁহার প্রভাব এখনও আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, সে প্রভাব কত মহান, তাহা মাপিয়া ওজন করিয়া দেখিবার সাধ্য আমাদের এখন ত নাই। কোনও ব্যক্তির বিয়োগ আমরা শুধু জাতির দিক্ হইতে কত ক্ষতি হইল তাহাই দেখি, আবার কাহারও বিয়োগ (যেমন পরিবারের মধ্যে) আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি, আশুতোষের এই আকস্মিক বিয়োগে উভয়বিধ ক্ষতি হইয়াছে। জাতির দিক দিয়া ক্ষতি ত হইয়াছেই, অনেকে স্বজনবিয়োগবৎ দুঃখও অন্তরে অনুভব করিতেছেন। এই প্রতিভাসমুজ্জ্বল বঙ্গদেশেও তাঁহার স্থান লইবার মত লোক কোথায়?

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন।

সঙ্কলিকা

অতি অল্পদিন ব্যবধানে দেশের দুই অত্যুজ্জ্বল রত্ন খসিয়া পড়িয়াছে। এমন উপর্য্যুপরি দুইটী শ্রেষ্ঠ সন্তানের তিরোধান দেশের বড়ই দুর্দ্দিনের পরিচায়ক। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে যে শুধু বঙ্গদেশের বা ভারতের বিশেষ অনিষ্ট হইল তাহা নয়, বর্ত্তমান জগত একজন দিকপাল হারাইল। তাঁহার চাকুরী জীবনের শেষ হওয়ার পর তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম্মজীবনের সূচনার আভাষ পাওয়ার পুর্ব্বেই আমরা তাঁহাকে হারাইলাম। এরূপ দৃঢ়চিত্ত, কর্ম্মক্ষম, তীক্ষ্ণধী নির্ভীক পুরুষ পৃথিবীতে বিরল। অন্য দেশে জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাঁহার নাম লিখিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশে তাঁহার কর্ম্ম ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ প্রসারণ হয় নাই। নিজে এত বড় শক্তিশালী ও পদমর্য্যাদাসম্পন্ন লোক হইয়াও লোকের সঙ্গে এরূপ ভাবে মিশিতেন যে তাহার তুলনা মিলে না। ঘরে ঘরে তাঁহার সম্বন্ধে কত কাহিনী শোনা যাইতেছে। সকলেরই মনে আজ এক আতঙ্ক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কি হইবে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রাণ ছিল, ইহার জন্য তিনি কি যে করিয়াছেন তাহা লিখিতে গেলেই বোধ হয় এক পুস্তক হইয়া পড়ে। ছাত্রদের জন্য তাঁহার কি অপরিসীম সহানুভূতি ছিল। ছাত্রদের

পক্ষে তিনি আশু-তোষই ছিলেন। যেমন উদার হৃদয়, তেমনি দৃঢ় ও নির্ভীক তাঁহার বিধবা কন্যার বিবাহে তাঁহার হৃদয় যে "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি"—তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আজ এই বিষাদের সময়ে শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমরা শুধু আমাদের তীব্র বেদনার কথাই বিকাশ করিলাম।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তিরোধানের কাহিনীতে ৺আশুতোষ চৌধুরীর তিরোধানের কথা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। জীবনক্ষেত্রে চৌধুরী মহাশয় যেমন পশ্চাতে থাকিয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পশ্চাতে থাকিয়া প্রশান্ত নিরীহ ভাবে যোদ্ধা আশুতোষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন, মৃত্যুর পরেও পুরুষসিংহ আশুতোষের কাহিনীর কাছে আজ তাঁহার কথার আলোচনা অনেকটা নীরব হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার সদ্‌গুণাবলী এবং বঙ্গভঙ্গের ইতিহাসে তাঁহার কর্মকীর্ত্তি চিরকাল অমর থাকিবে।

গত সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগের প্রশংসার জন্য যে রিজলিউসন হইয়াছে তাহা লইয়া দেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালী সমাজের মুখপত্র কাগজ সমূহে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজ পক্ষীয়গণ সেই রিজলিউসনকে সোজাসুজি হত্যার বা হিংসা নীতির সমর্থক বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। স্বরাজ্য দলে আপন পক্ষ সমর্থনের নানারূপ চেষ্টা হইতেছে।

স্বরাজ্যদল কি মনে করিয়া এই প্রস্তাবনা উপস্থিত করাইয়াছিলেন তাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে যাওয়া এখন কঠিন। কিন্তু আমাদের দেশের আইনজ্ঞ নেতারা বাক্যবিন্যাসদ্বারা কিরূপ চুলচেরা তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন, তাহা এই ব্যাপারে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগ হইতে শ্রেষ্ঠতর আত্মত্যাগ দেশে হইয়া গিয়াছে। কোন কনফারেন্সে সে বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত হয় নাই। কোন কাজ হয় নাই বলিয়া যে হইবে না এমন নহে। কিন্তু বিষয়ের আবশ্যকতা ও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কানাইলালের সঙ্গে গোপীনাথের তুলনা করাতে কানাইলালের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু ইহাতে বোঝা যায় আমরা এখনও ঠিক জিনিষের ঠিক মূল্য বুঝিতে শিখি নাই। গোপীনাথ সাহার দেশের সেবা করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও তজ্জন্য বিপদের সম্মুখীন হইয়া কাজ করিবার চেষ্টাতে তাহার দেশ সেবার ইচ্ছাটী যে অকৃত্রিম তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই প্রস্তাবের পর ইহাকে যে ভাবে দলিয়া মুচড়াইয়া অহিংসনীতির সমর্থক বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা হইতেছে, তাহাকে শুধু আত্মপক্ষ সমর্থনের "ওকালতী প্যাঁচ" ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না।

এখন দেখা যাউক, রিজলিউশনটী কি? এই রিজলিউশনের কথাগুলি নানা ভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ১১ ই জুনের Forwordএ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই মূল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। রিজলিউশনটী বাংলায় হইয়াছিল। তাহা এই :—

"এই সম্মিলনী সর্ব্বপ্রকার হিংসাভাব বর্জ্জন ও অহিংস ভাবকেই মূলনীতিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ও মৃত গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগের উচ্চ আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মাতৃভূমির স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াও যে মহান স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, তন্নিমিত্ত তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে।"

এই প্রস্তাবে অহিংসভাবকে বজায় রাখিবার জন্য এত বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে যে স্বতঃই মনে সন্দেহের ভাব উপস্থিত হয়।

গোপীনাথ সাহা দেশের উপকার করিব বলিয়া ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া একজন সাহেবকে হত্যা করিয়া আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সংক্ষেপতঃ ঘটনা এই—

প্রথমতঃ—সে কংগ্রেসের অহিংসনীতিতে বিশ্বাস করে নাই ও অহিংসনীতির বিপক্ষে কাজ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—সে হত্যার পর আত্মরক্ষার্থে পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কানাই লালের মত নিশ্চিত ধরা পড়িবে জানিয়া হত্যা করিতে যায় নাই। পলাইতে পারিলে আত্মত্যাগ করিতে হইবে না এ আশা বা সম্ভাবনা ছিল। এ স্থানে স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগের 'মহান" ভাব দেখা যায় নাই।

তৃতীয়তঃ—তাহার ব্যারিষ্টার যখন তাহার পক্ষ হইয়া Not guilty বলিয়া সাব্যস্ত করিতে "মানসিক বিকারের" আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন সে তাহাতে বাধা দেয় নাই। কানাই লালের মত বুকের পাটা শক্ত করিয়া Guilty বলে নাই।

চতুর্থতঃ—সাধারণ আততায়ীর মত তাঁহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ফাঁসির সময় সে ভীত হয় নাই, বা অত্যাচার সহিয়াও কোন কথা প্রকাশ করে নাই, ইহাই তাহার স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগ। এই ঘটনার পূর্ব্বে ও পরে অনেক আততায়ী নির্ভীক-চিত্তে ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে। সেই জন্য এই সাহসটাকে "মহান" বলা যায় না।

তবে তাহার উদ্দেশ্য ছিল দেশসেবা; দেশের নাম নিয়া ও দেশের জন্য এ পর্য্যন্ত যত জন প্রাণ দিয়াছে, বা প্রাণত্যাগের অপেক্ষা বেশী স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগ করিয়াছে তাহার ত কোন রিজলিউশন হয় নাই। যদি গোপীনাথের মত দেশের জন্য আরও শত শত যুবক এই পন্থা অবলম্বন করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মত্যাগ বা স্বার্থত্যাগের "মহান্" দৃষ্টান্ত দেখায়, তবে Congress বা Conference কি সেই যুবকদের "মহান্' আত্মত্যাগের প্রশংসা করিবেন? যদি তাই হয় তবে এই রিজলিউশনের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে এই রিজলিউশনের প্রবর্ত্তকগণ গোপীনাথের মতই বুকের পাটা শক্ত করিয়া অহিংস-নীতির আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া এই রিজলিউশনের সমর্থনজন্য আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তস্বরূপ দেশের সমক্ষে দণ্ডায়মান হউন। তাহা করিলে আর যাহাই হউক তাঁহাদের অকপটতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই যে শিখণ্ডিসুলভ কথার মারপ্যাঁচের মধ্যে আশ্রয়-গ্রহণ করার চেষ্টা, তাহা কোন মতেই বুঝিতে পারিতেছি না। কংগ্রেসের "অহিংসনীতি" সমস্ত আত্মত্যাগ বা স্বার্থত্যাগের উপর। যদি সেই অহিংসনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও কংগ্রেসের শ্রদ্ধা ও সমর্থন পাওয়া যায়, তবে "অহিংসনীতি"টাকে বড় গলায় "মূলমন্ত্র" করিবার সার্থকতা থাকে না। তখন হসরৎ মোহানীর ন্যায় যে কোন উপায়ে "দেশের সেবাকে"ই শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র বলিতে হয়। আইনের চক্ষে "অহিংসনীতির" দোহাই দিব, অথচ শত শত গোপীনাথের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিব, এই উভয় পন্থা চালাইতে চেষ্টা করা Politicsএর চাল হইতে পারে, কিন্তু উহা মহাত্মার দেশের Honest Politics নয়।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] শ্রাবণ, ১৩৩১ [৪র্থ সংখ্যা

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(৮)

অনেক লেখক আছেন, যাঁহাদের প্রতিভা বেশ ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া ক্রমশঃ চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয় ; তাঁহাদের ক্রমোন্নতির রেখাটী বেশ স্পষ্টভাবেই টানা যায়। ইঁহাদের রচনা সম্বন্ধে কালানুক্রমিক আলোচনাই প্রশস্ত , কালানুক্রমিক আলোচনার দ্বারাই ইঁহাদের প্রতিভার ক্রমবিকাশটী বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বোধ হয় এই প্রণালী তাদৃশ কার্য্যকরী হইবে না ; কেন না তাঁহার প্রতিভা সময়ানুবর্ত্তী হইয়া ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই, প্রায় প্রথম হইতেই একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কেবল এক 'দুর্গেশনন্দিনী'কেই তাঁহার অপরিপক্ক হস্তের রচনা বলা যাইতে পারে ; এক ইহার মধ্যেই কতকটা ক্ষীণতা ও অস্পষ্টতা, কতকটা গভীর অভিজ্ঞতার অভাব, কতকটা যৌবন-স্বপ্নাবেশের ছায়া অনুভব করা যায় ; নবীন লেখক যে তাঁহার বাস্তব-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাকে শব্দসম্পদ ও কল্পনারাগের দ্বারা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝিতে পারি। 'দুর্গেশনন্দিনী'র দুই বৎসর পরেই 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৭) প্রকাশিত হয় ; কপালকুণ্ডলাতে বঙ্কিম-প্রতিভা তাহার সমস্ত ধূমাবরণ ত্যাগ করিয়া একটী প্রদীপ্ত অনলশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে ; 'দুর্গেশনন্দিনী'র সমস্ত অনিশ্চয়, সমস্ত সঙ্কোচ, পুরাতন প্রথার সশঙ্ক অনুবর্ত্তন বঙ্কিম সবলে কাটাইয়া উঠিয়াছেন ; 'কপালকুণ্ডলা'র যে গুণটী খুব তীব্রভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা উহার অন্তর্নিহিত ভাবটীর অসামান্য মৌলিকতা ও সাহস। এখানে বঙ্কিমের প্রতিভা নিজ স্বরূপের পরিচয় পাইয়াছে, এবং সমস্ত অনুকরণ ত্যাগ করিয়া নিজের জন্য একটী সম্পূর্ণ নূতন পথ বাহির করিয়া লইয়াছে। অবশ্য এখন হইতে বঙ্কিমের প্রতিভা যে একেবারে নির্দ্দোষ ও প্রমাদশূন্য হইয়াছে, তাহা বলিতেছি না ; কিন্তু এ সময়ের ভুল ভ্রান্তি একটু নূতন রকমের ; অতিসাহসের ফল, ভীরুতার নহে। সময় সময় বঙ্কিম আপন প্রতিভার উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করিয়া তাহাকে গুরুভারপীড়িত করিয়া তুলিয়াছেন ; উপন্যাসের

মধ্যে এমন সমস্ত প্রকৃতি-বিরুদ্ধ উপাদানের সমাবেশ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রতিভাও সম্পূর্ণভাবে গলাইয়া মিশাইতে পারে নাই ; সময় সময় উপন্যাসকে তিনি নিজ আদর্শবাদের ছাঁচে ঢালিতে গিয়া উহার মৌলিক প্রকৃতিটী রক্ষা করিতে পারেন নাই, কল্পনার মুক্তপক্ষে উড়িয়া নীল আকাশের এমন সুদূর দেশে পৌছিয়াছেন, যেখানে আমাদের সহজ বুদ্ধি ও বিশ্বাস পায়ে হাঁটিয়া তাঁহাকে অনুসরণ কবিতে পারে নাই! কিন্তু এই সমস্ত ক্রটীবিচ্যুতি দুঃসাহসের ফল, অক্ষমতার নহে ; সুতরাং ইহারা 'দুর্গেশনন্দিনী'র ক্রটিবিচ্যুতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে বঙ্কিমের প্রতিভা দুর্গেশনন্দিনীর পরেই একেবারে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, ক্রম বিকাশের মন্থর পথে অগ্রসর হয় নাই ; সেইজন্য কালানুক্রমিক সমালোচনা ঠিক তাঁহার পক্ষে উপযোগী হইবে কিনা সন্দেহ।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি আর এক দিক দিয়া আলোচিত হইতে পারে। স্থূলতঃ ইহারা দুইভাগে বিভক্ত—এক শ্রেণী সম্পূর্ণ বাস্তব, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় শ্রেণী ঐতিহাসিক বা অসাধারণ ঘটনাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ ইংরাজী উপন্যাসে 'novel' ও 'romance' বলিয়া যে দুইটী প্রধান বিভাগ আছে, বঙ্কিমের উপন্যাসেও সেই দুইটী বিভাগ বর্ত্তমান এবং ইহাদের স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়া উচিত।

এখন 'novel' ও 'romance' এর মধ্যে যে লৌকিক প্রভেদটুকু আছে, তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রধানতঃ উহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা বাস্তব-গুণের আপেক্ষিক প্রাধান্য লইয়া। 'Novel' অবিমিশ্রভাবেই বাস্তব ; ইহার মধ্যে কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগসমাবেশের অবসর অত্যন্ত অল্প। ইহার প্রধান কাজ সমসাময়িক সমাজ ও পারিবারিক জীবন চিত্রণ ; সত্য পর্য্যবেক্ষণও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই ইহার প্রধান গুণ। যতদূর সম্ভব সমস্ত অসাধারণত্বই ইহার বর্জ্জনীয় ; কেবল আমাদের জীবন প্রবাহের মধ্যে যে সমস্ত দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি উচ্ছ্বসিত, যে সমস্ত সংঘাত বিক্ষুব্ধ ও মুখরিত হইয়া উঠে, সেই অবিসংবাদী অথচ রহস্যমণ্ডিত সত্যগুলির দ্বারাই ইহা অসাধারণত্বের সাময়িক স্পর্শলাভ করিতে পারে। 'Romance'এর বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরণের ; ইহা জীবনের সহজ্ প্রবাহ অপেক্ষা তাহার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্ত্তগুলির উপরেই অধিক নির্ভর করে। জীবনের বীরোচিত বিকাশগুলি, মনের উঁচুসুরে বাঁধা ঝঙ্কার গুলি, জীবনের বর্ণবহুল শোভাযাত্রা-সমারোহ—ইহাই মুখ্যতঃ রোমান্সের বিষয় বস্তু। সেইজন্য সূর্য্যালোক-দীপ্ত, অতিপরিচিত বর্ত্তমান অপেক্ষা কুহেলিকাচ্ছন্ন, অপরিচিত অতীতের দিকেই ইহার স্বাভাবিক প্রবণতা। অতীতের বিচিত্র বেশ-ভূষা, ও আচার ব্যবহার, অতীতের আকাশ-বাতাসে লঘু মেঘখণ্ডের মত যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও কবিত্বময় কল্পনা ভাসিয়া বেড়ায়, রোমান্সলেখক সেই-গুলিকেই ফুটাইয়া তুলিতে যত্ন করেন। অবশ্য এই সমস্ত অসাধারণত্বের মধ্যেও রোমান্স বাস্তব জীবনের সহিত একটী নিগূঢ় ঐক্য হারায় না ; জীবনের সহিত যোগসূত্র হারাইলেই ইহা একটী সম্পূর্ণ অসম্ভব পরীর গল্পের মত অশরীরী হইয়া পড়িবে। মধ্যযুগের রোমান্স এইরূপ সম্পূর্ণ বাস্তব-সম্পর্কশূন্য ছিল বলিয়া তাহার উপন্যাসশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইবার স্পর্দ্ধা ছিল না ; তাহাদের অন্তহীন মায়াঘন অরণ্যানীর মধ্যে আমাদের বাস্তব জীবনের প্রতিধ্বনি বড়

একটা শুনা যাইত না। কিন্তু আধুনিক যুগের যে বর্দ্ধমান বাস্তব-প্রবণতার মধ্যে সামাজিক উপন্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা রোমান্সের উপরও নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে নাই। আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রোমান্সের জগতেও আর অতিপ্রাকৃত বা অবিশ্বাসের কোন স্থান নাই। রোমান্সলেখককেও এখন বাস্তব বা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হয়; মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দ্বারা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিতে হয়; ইহার বাতাসে যে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে, তাহাকে মৃত্তিকার সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে হয়। তবে সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে ইহার এই মাত্র প্রভেদ যে বাস্তবতার বন্ধন ইহাকে একেবারে নাগপাশের মত সুদৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে নাই, ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর আছে; এবং সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবী এত প্রবল বা সর্ব্বগ্রাসী নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলি আলোচনার সময় সামাজিক উপন্যাসের সহিত রোমান্সের এই মৌলিক প্রভেদটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

বঙ্কিম চন্দ্রের নিম্নলিখিত উপন্যাসগুলিকে রোমান্স-শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। (১) দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫); (২) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৭), (৩) মৃণালিনী (১৮৬৯), (৪) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), (৫) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫); (৬) রাজসিংহ (১৮৮২), (৭) আনন্দমঠ (১৮৮২); (৮) দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪); ও (৯) সীতারাম (১৮৮৭)। অবশ্য এই সমস্ত উপন্যাসে রোমান্সের উপাদান সমানভাবে ঘনসন্নিবিষ্ট নহে—কোথাও বা রোমান্স উপন্যাসের আকাশ বাতাসে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা সামাজিক জীবনের রন্ধ্রপথে মেঘান্তরালবর্ত্তী বিদ্যুৎশিখার ন্যায় একটা অনৈসর্গিক দীপ্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আবার তাহাদের সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যও সকল ক্ষেত্রে সমান হয় নাই; কোথাও বা বাস্তবতার সহিত অসাধারণত্বের একটী চমৎকার সমন্বয় সাধিত হইয়া, উপন্যাসখানি অনিন্দনীয় সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে; কোথাও বা অসামঞ্জস্য প্রকট হইয়া উঠিয়া উপন্যাসকে অবাস্তবতাদুষ্ট করিয়াছে ও আমাদের বিচারবুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যবোধকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্ত দিক্ দিয়া আমাদিগকে উপন্যাসগুলির বিচার করিতে হইবে।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে রোমান্স ঐতিহাসিক যুদ্ধ বিগ্রহ ও সাহিত্য-সুলভ প্রেমের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তাহা 'কপালকুণ্ডলা'তে একেবারে সমস্ত বাহ্য অবলম্বন ত্যাগ করিয়া নিজ অন্তর্নিহিত রসের দ্বারাই পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে গতানুগতিকতার যে একটা জড়তা ছিল, তাহা 'কপালকুণ্ডলা'য় কল্পনা-শক্তির অসামান্য সাহসিকতায় সতেজ ও লীলাচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সাগরতীরবাসিনী, কাপালিক-প্রতিপালিতা চির সন্ন্যাসিনী কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তিকল্পনায় বঙ্কিম যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একজন বাঙ্গালী উপন্যাসিকের পক্ষে বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আমাদের রুদ্ধ-দ্বার সঙ্কীর্ণ-পরিসর বাস্তব জীবনে রোমান্সের উদার আলোক ও মুক্ত বায়ু নিতান্তই বিরল-প্রবেশ। সময় সময় আমরা বৈদেশিক সাহিত্যের অনুকরণ করিয়া বিদেশপ্রচলিত প্রণালীর

দ্বারা আমাদের বাস্তবজীবনে রোমান্সের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ বহাইতে চাহি ; কিন্তু এই চেষ্টা, বাস্তব জীবনের সহিত অসামঞ্জস্যের জন্য, সার্থক ও শোভন হইয়া উঠে না। যেমন প্রত্যেক দেশের মাটীতে এক এক বিশেষ রকম ফুল রঙ্গীন হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রত্যেক দেশেই রোমান্স তথাকার বাস্তবজীবনের সহিত এক নিগূঢ় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, সেই বাস্তবজীবনেরই একটা উচ্চতর বিকাশ। যেমন যে জিনিষ আমরা পারিবারিক জীবনে ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে মনপ্রাণ দিয়া খুঁজি, তাহাই সাহিত্যে গানের সুর হইয়া বাজিয়া উঠে, সেইরূপ রোমান্সের স্বপ্নও আমাদের বাস্তব-জীবন-বৃন্তের রঙ্গীন ফুল মাত্র। ইউরোপীয় সাহিত্যে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের, বা বিচিত্র, বিরোধ-জটিল প্রেমের অপ্রত্যাশিত বিকাশের মধ্য দিয়া রোমান্সের অনুসন্ধান হয় ; ইউরোপীয় সভ্যতার এই স্বাভাবিক বিকাশের পথেই রোমান্স জীবনে প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু আমাদের উপন্যাসে ইতিহাস বা প্রেমের মধ্যে যে রোমান্সকে পাওয়া যায়, তাহা ঠিক স্বাভাবিক হয় না ; বাস্তব-জীবনের ঠিক অনুবর্ত্তন করে না। কেননা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে ইউরোপের মত আমাদের দেশে ইতিহাস বা রাজনৈতিক সংঘর্ষ সাধারণ জীবনের উপর তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করে না। প্রেমের চিরন্তন লীলা যে আমাদের সাহিত্য বা জীবনে ছিল না তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে ; কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে প্রেমের বিচিত্র ধারা যেরূপ নূতন নূতন বিস্ময়ের মধ্যে বিকশিত হইয়াছে, আমাদের দেশে সামাজিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ঠিক তাহা হইতে পারে নাই, প্রেম বাহিরের দিকে বৈচিত্র্য ও বিস্ময়কর উন্মেষ লাভ না করিয়া, অন্তর্মুখী, গভীর ও একনিষ্ঠ হইবার দিকে চলিয়াছে। অবশ্য আমাদের অতীত যুগের সামাজিক অবস্থা যে ঠিক বর্ত্তমানের মত নীরস ও বৈচিত্র্যহীন ছিল তাহা নহে ; আমাদেরও একটা বীরত্বমণ্ডিত, গৌরবময় যুগ ছিল, আমাদেরও জীবন এককালে দুঃসাহসিকতার রুদ্রতালে আবর্ত্তিত হইত, আমাদেরও প্রেম হয়ত একটা গভীর ও প্রবল আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজকাল আমাদের জীবনের ধারা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে, পুরাতন প্রণালী হইতে এতদূর সরিয়া গিয়াছে, যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিকল্পনা দ্বারাও সেই পুরাতন দিনের জীবনযাত্রা পুনর্জ্জীবিত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই পুরাতন আবেগ কোন চিরবিস্মৃতির মরুভূমে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাই উপন্যাসে আমাদের অতীত যুগের কাহিনী নিশীথ স্বপ্নের কুহেলিকাজড়িত বলিয়া মনে হয় ; আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা একটা ইন্দ্রজালরচিত আকাশসৌধের ন্যায় বাস্তবসংস্পর্শশূন্য হইয়া পড়ে, আমাদের যুদ্ধজয় একটা মত্ত আস্ফালন ও অর্থহীন কোলাহলে পরিণত হয় ; আমাদের প্রেমাভিব্যক্তি একটা বহুপুরাতন মন্ত্রের প্রাণহীন আবৃত্তির মতই শুনায়। 'আনন্দমঠ,' 'মৃণালিনী,' 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রতিভা এই কেন্দ্রস্থ ও অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজকে ব্যথিত করিয়াছে, অসাধারণ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মধ্যেও একটী গূঢ় ব্যর্থতার বীজ রাখিয়া গিয়াছে।

কপালকুণ্ডলার রোমান্টিক আবেষ্টন রচনায় বঙ্কিম অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন ; তিনি ইতিহাস ও প্রেমকে যতদূর সম্ভব পশ্চাতে রাখিয়া রোমান্সের এমন একটি উৎস

আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আমাদের বাস্তবজীবনের কঠিন মৃত্তিকা হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইতে পারে। আমাদের শান্ত, ধর্ম্মাভিভূত জীবনের উপর যদি কখন কল্পলোকের আলোকপাত সম্ভব হয়, তবে তাহা একটা প্রবল ধর্ম্মোন্মাদের দিক হইতেই আসিতে পারে, যুদ্ধের উদ্দীপনা বা প্রেমের উচ্ছ্বাস হইতে নহে। এই জন্যই কপালকুণ্ডলার জীবনের উপর যে একটা অসাধারণত্ব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা তান্ত্রিকপ্রথার ভীষণতা ও সহজ ধর্ম্মপ্রবণতা হইতে উদ্ভূত বলিয়া আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত একটা সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। আবার এই উপন্যাসের রোমান্টিক উপাদানগুলি—বিজন সমুদ্রতীরের অতুলনীয় মহিমা, কাপালিকের নির্ম্মম ধর্ম্ম-সাধনা—কেবল মাত্র একটা বাহ্যবৈচিত্র্যের উপায়মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই; ইহারা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর একটী গভীর অনপনেয় প্রভাব অঙ্কিত করিয়া একটা অসাধারণ সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।* কেননা ইহার সমস্ত রোমান্সের সার, এই সৌন্দর্য্য জগতের মধ্যমণি হইতেছে কপালকুণ্ডলার চরিত্র। সুকোমল মাধুর্য্যের চারিদিকে একটা অনমনীয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বেড়া, গার্হস্থ্য সুখভোগের মধ্যে একটা অক্ষুণ্ণ উদাসীনতার সংযম, সামাজিক বিধি নিষেধের মাঝখানে একটা শান্ত অথচ অদম্য স্বাধীনতা; অথচ কোথাও পুরুষোচিত কঠোরতা বা পরুষতার লেশমাত্র নাই, সর্ব্বত্রই একটা রমণীর কোমলতা; শিক্ষা দীক্ষায় বিভিন্ন, কিন্তু অন্তরে একটী চিরন্তনী স্ত্রীমূর্ত্তি (eternal feminine)—এরূপ অতুলনীয় চরিত্র-কল্পনা শুধু বঙ্গসাহিত্যে কেন, ইউরোপীয় সাহিত্যেও বিরল।

সামাজিক জীবনে প্রবেশের পরেও কপালকুণ্ডলার বাল্যকালের রোমান্টিক প্রতিবেশ তাহাকে বেষ্টন করিতে ছাড়ে নাই। পারিবারিক জীবনের নিয়মশৃঙ্খল, স্বামীর অপরিমিত ভালবাসাও তাহার নয়নের অপার্থিব স্বপ্নঘোর ঘুচাইতে পারে নাই। সমুদ্রতীরে বন্যলতাটী গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণে রোপিত ও অজস্রস্নেহধারাসিক্ত হইয়াও নূতন স্থানে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই, খুব আল্‌গা হইয়াই লাগিয়া ছিল; পুরাতন জীবন হইতে একটী তরঙ্গ আসিয়াই তাহাকে একেবারে উন্মূলিত করিয়া লইয়া গেল। তাহার অন্তরমধ্যে যে একটি চিরউদাসিনী আলুলায়িতকুন্তলা অতীত স্বাধীনতার দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহাকে সংসার তাহার শত আদর প্রলোভনেও পোষ মানাইতে পারিল না। অথচ তাহার মধ্যে একটা অসামাজিক বন্যতা, বা রমণীসুলভ কোমলতার অভাব কিছুই নাই। বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' নামক গল্পের নায়ক 'তারাপদ'ই 'কপালকুণ্ডলা'র একমাত্র তুলনাস্থল; অথচ আবেষ্টনের অসাধারণত্বে ও প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যে উহাদের মধ্যে কত প্রভেদ। তারাপদের ঔদাসীন্য একটী চিরচঞ্চল, ক্রীড়াশীল হরিণশিশুর বন্ধন-ভীরুত্বের ন্যায়, দিগন্তরেখাস্থিত নীল-মায়ার প্রতি একটা নামহীন, রহস্যময় আকর্ষণমাত্র; কিন্তু কপালকুণ্ডলার সংসার-বিরক্তির পশ্চাতে আমরা একটী বিশেষ ধর্ম্মসাধনার, একটী অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার সমস্ত দুর্ণিবার শক্তি অনুভব করি। তাহাছাড়া, 'তারাপদ' 'কপাল-কুণ্ডলার' একটা অপেক্ষাকৃত শান্ত, ও বাস্তব সংস্করণ; পল্লীর সাধারণ জীবনযাত্রার সহিত তাহার মুক্ত, বন্ধনহীন

* The beauty born of murmuring sounds
Has passed into her face

জীবন একটা ক্ষণিক, অথচ নিগূঢ় একাত্মতা লাভ করিয়াছে; 'কপালকুণ্ডলার' নিঃসঙ্গতা আরও প্রগাঢ়তর। এক দয়া ও সমবেদনা ছাড়া সাধারণ সামাজিক জীবনের সহিত তাহার আর কোন যোগসূত্র নাই।

সাধারণতঃ উপন্যাসে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা, স্বপ্নদর্শন ইত্যাদি অবতারণা করা হয়, তাহার প্রায়ই বাহ্য বৈচিত্র্যবৃদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়; কদাচিৎ, খুব বড় কলাবিদের হাতে তাহাদের মধ্যে একটা গূঢ় সাঙ্কেতিকতা থাকে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে যে সমস্ত অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহারা কবিকল্পনার ন্যায় কেবল সৌন্দর্য্য-মাত্রাত্মক নহে। পরন্তু কপাল-কুণ্ডলার চরিত্রের সহিত একটা নিগূঢ় ও সুসঙ্গতসম্বন্ধবিশিষ্ট। নবকুমারের সহিত আগমনকালে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানিবার জন্য দেবী-পদে বিল্বপত্রার্পণ কেবল একটা পূজার বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র নহে; ইহা কপালকুণ্ডলার ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া ফেলিয়া তাহার নূতন জীবনের প্রতি অনাসক্তি বাড়াইয়া তুলিয়াছে, ও ভবিষ্যৎ বিপৎপাতের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণে সাহায্য করিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলার কথোপকথনের মধ্যে এই আপাত-তুচ্ছ ব্যাপারটা ধর্ম্মপ্রাণ কপালকুণ্ডলার অন্তর্জগতে কিরূপে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে আবার চতুর্থ খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা যে আকাশপটলিখিতা নীল-নীরদ-নির্ম্মিতা ভৈরবীমূর্ত্তিকে মরণের পথে নীরবে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাও অদ্ভুত মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দ্বারা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্মমোহের সহিত একাঙ্গীভূত হইয়াছে। এই কুশল মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের সঙ্গে অসাধারণত্বের গভীর সামঞ্জস্য সাধনেই কপালকুণ্ডলার বিশেষত্ব।

এই চরিত্রবিশ্লেষণ স্বল্প অথচ গভীরার্থক কয়েকটী কথার দ্বারা সুনিপুণ ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। কোন বাস্তবতাপ্রধান লেখকের হাতে পড়িলে এই অর্থপূর্ণ মিতভাষিতা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাপী সুদীর্ঘ বাক্‌বিন্যাসে পরিণত হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ক্ষমতার দুই একটী মাত্র উদাহরণ দিব। যখন কপালকুণ্ডলা সাংসারিক হিতাহিতের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল, তখন লেখক কয়েকটী মাত্র পংক্তিতে তাহার এই অসাধারণ সঙ্কল্পের মূলীভূত কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

"কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তি রূপরাশি দর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, নৈশ বনভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসিপালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানী-ভক্তিভাববিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন; জলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন। (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।)

অল্প কথায় গভীর বিশ্লেষণের আর একটী উদাহরণ পাই, কপালকুণ্ডলার প্রতি নব-কুমারের প্রথম প্রণয় প্রকাশের বর্ণনায়।

"যখন নবকুমার দেখিলেন যে কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন,

তখন তাঁহার আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিল ; অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলা লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। ... ...এই আশঙ্কাতেই তিনি কপাল-কুণ্ডলার পাণিগ্রহণপ্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হন নাই : এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহ গমন পর্য্যন্ত বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করেন নাই ; পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র নিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল।...

এই প্রেমাবির্ভাব সর্ব্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না. কিন্তু নবকুমার কপাল-কুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমিষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত। যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত ; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত ; যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত। সর্ব্বদা অন্যমনস্কতাসূচক পদবিক্ষেপেও প্রকাশ পাইত।"

কপালকুণ্ডলার আর একটি গুণ সমালোচকের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তাহা উপন্যাসটীর অনবদ্য গঠনকৌশল। উপন্যাসখানি ঠিক একটী গ্রীক ট্র্যাজেডির মত সরল রেখায় অবিসর্পিত গতিতে সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জ্জিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির দিকে অনিবার্য্যবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায় এক নিগূঢ়-কলাকৌশল-নিয়ন্ত্রিত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হইয়াছে। এমন কি সুদূর মোগল রাজধানীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অন্তঃপুরিকাদের ঈর্ষ্যাদ্বন্দ্ব পর্য্যন্ত বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার নিয়তির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, যে অগ্নিতে সে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে তাহার ইন্ধন যোগাইয়াছে। চারিদিকের সমস্ত শক্তি যেন দৈববলে সংহত হইয়া কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টরথকে এক অন্তহীন অতলের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহার সংসারানাসক্তি, স্বামিপ্রণয়বঞ্চিতা শ্যামার প্রতি সমবেদনা, কাপালিকের অতন্দ্র প্রতিহিংসা, নবকুমারের আশঙ্কা-দুর্ব্বল গভীর প্রেম, পদ্মাবতীর পাষাণ প্রাণে প্রেমমন্দাকিনী ধারার অতর্কিত আবির্ভাব, সর্ব্বোপরি এক ক্রুদ্ধ দৈবশক্তির সুস্পষ্ট অঙ্গুলিসঙ্কেত—এই সমস্ত শক্তি, মানুষ এবং দৈব, সৎ ও অসৎ একসঙ্গে ভিড় করিয়া যেন রথরজ্জুর আকর্ষণে হাত দিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র জীবনের বিরুদ্ধে এতগুলি প্রচণ্ডশক্তির সমাবেশ—আমাদের মনকে এক গভীর সমাধানহীন রহস্যের বেদনায় ব্যথিত করে এবং কপালকুণ্ডলার রহস্যময় অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনেতিহাসটি আমাদিগকে নিয়তির দুর্জ্ঞেয় লীলার একটা বিস্ময়কর বিকাশের ন্যায় অভিভূত করিয়া ফেলে।

কপালকুণ্ডলার দুই বৎসর পরে মৃণালিনী প্রকাশিত হয় (১৮৬৯)। মৃণালিনীতে বঙ্কিম আবার ইতিহাস ও প্রেমের ক্ষেত্র হইতে রস ও বর্ণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার রোমান্সে যে একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাধুর্য্য ও সুসঙ্গতি আছে, মৃণালিনীতে অবশ্য তাহা নাই ; তথাপি দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে তুলনা করিলে বঙ্কিম উন্নতির পথে যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। চরিত্র-চিত্রণ এবং ঘটনাবিন্যাস উভয় দিকেই বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীর সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। জগৎসিংহ, ওসমান, তিলোত্তমা

প্রভৃতি চরিত্রগুলিতে বাস্তবতার ভাগ একটু অল্প আছে বলিয়াই মনে হয়; বিচিত্র ঘটনাস্রোতে তাহাদের ব্যক্তিত্ব খুব ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। মৃণালিনীর চরিত্রগুলিতে বাস্তবতার চিহ্ন প্রকটতর হইয়া উঠিয়াছে। হেমচন্দ্র জগৎসিংহের মত কেবল একটা বীরোচিত আদর্শের ম্লান ছায়া মাত্র নহে, তাহার ব্যক্তিত্ব আরও সুস্পষ্ট। হেমচন্দ্রের দুর্জ্জয় ক্রোধ ও অভিমান, তাহার চিত্তচাঞ্চল্য ও পরিবর্ত্তনশীলতা ও অন্যায় হঠকারিতাই তাহাকে জগৎসিংহ অপেক্ষা স্ফুটতর বৈশিষ্ট্য দিয়াছে ও আদর্শ লোক হইতে নামাইয়া ভ্রান্তি প্রমাদ সঙ্কুল রক্তমাংসের মানুষের মধ্যে স্থান দিয়াছে। জগৎসিংহ-তিলোত্তমার প্রেমের সহিত তুলনায় হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেম আরও একটু জটিলতর, বাস্তবতার আরও একটু গভীরতর স্তর স্পর্শ করে। মৃণালিনী নিতান্ত শান্তপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীলা হইলেও তিলোত্তমার অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব হইয়াছে। দুঃখের অভিজ্ঞতা ও বিপদে তেজস্বিতা তাহাকে একেবারে মোমের পুতুল হইতে দেয় নাই। গিরিজায়া বিমলার একটী অধিকতর স্বাভাবিক সংস্করণ; একজন পৌর মহিলার মুখে যে ব্যবহার একটু অশোভন ও অসংযত বলিয়া বোধ হয়, তাহা ভিখারিণীর পক্ষে সুসঙ্গত ও উপযুক্তই হইয়াছে। বিশেষতঃ মনোরমার চরিত্র কল্পনায় বঙ্কিম যে মৌলিকতা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন চিহ্ন দুর্গেশনন্দিনীতে পাই না; ইহার অনুরূপ কোন চরিত্র পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসে যে কয়েকটী অবাস্তব কবি কল্পনানুযায়ী স্ত্রী চরিত্র পাই, মনোরমা তাহাদের অগ্রবর্ত্তিনী। 'দেবী চৌধুরাণী'তে দিবা নিশা ও সীতারামে জয়ন্তী এই জাতীয় চরিত্র—বাস্তব বন্ধনহীন কাল্পনিক, আমাদের সামাজিক অবস্থার সহিত সম্পর্ক রহিত,যেন লেখকের কতগুলি প্রিয় theoryর মূর্ত্ত বিকাশ মাত্র। কেবল অসাধারণ বাক্ পটুতা ও রসিকতার গুণেই তাহারা আমাদের নিকট জীবন্ত মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাদের বাক্যের সরসতা তাহাদের ব্যবহারের অবাস্তবতাকে অনেকখানি ঢাকিয়া দেয়। মনোরমা ইহাদের মত এতটা কাল্পনিক নহে; তাহার রহস্যময় দ্বৈতভাবের কোন মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই বটে, এই অদ্ভুত প্রকৃতি বৈষম্যের উদ্ভব কখন এবং কি প্রকারে হইল সে সম্বন্ধে লেখক আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করেন নাই বটে; কিন্তু যেরূপ আশ্চর্য্য দক্ষতা ও সুসঙ্গতির সহিত তাহার কার্য্যে ও ব্যবহারে এই দ্বৈতভাবটী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অবিশ্বাস আর মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না। বিশেষতঃ পশুপতির সহিত তাহার প্রেমের অসাধারণত্ব বাহ্য বিরোধ ও ঔদাসীন্যের মধ্যে গোপন আকর্ষণ—হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সাধারণ উচ্ছ্বসিত প্রেমের সহিত একটী সুন্দর বৈপরীত্যের (contrast) হেতু হইয়াছে।

কিন্তু মৃণালিনীর প্রকৃত ত্রুটি হইতেছে ইহার ঐতিহাসিক আবেষ্টনে ও ইতিহাসের সহিত প্রেমকাহিনীর সামঞ্জস্য-স্থাপনে। বঙ্কিম মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গজয়ের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা কতদূর ইতিহাস-সম্মত তাহা বলিতে পারিনা; তবে তাহাকে উচ্চ অঙ্গের ঐতিহাসিক কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করিতে আমাদের বিশেষ দ্বিধা হয় না। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গজয়ের যে একটা প্রবাদ মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে,

তাহাতে পশ্চাতে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্ধ কুসংস্কার উভয়েরই অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়; এবং বঙ্কিম পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতা ও বৃদ্ধ গৌড় রাজের অন্ধধর্ম্মবিশ্বাসের বর্ণনা দ্বারা এই বিরাট বিপর্য্যয়ের একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ও প্রকৃত ইতিহাসজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তবে ঐতিহাসিক উপাদান ও প্রকৃত তথ্যের অভাব বশতঃ এই ব্যাখ্যা নিতান্ত কাল্পনিক, ফাঁকা ফাঁকা রকমের বলিয়া ঠেকে। তথ্যের যে পরিমাণ ঘনসন্নিবেশ হইলে একটা বৃহৎ ঐতিহাসিক ব্যাপার আমাদের চক্ষে সত্য ও জীবন্ত হইয়া উঠে, তাহা বঙ্কিমের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব ছিল; সেইজন্য তথ্যের অভাব কল্পনার বাষ্প-স্ফীতি দ্বারা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হেমচন্দ্র, মাধবাচার্য্য, পশুপতি, লক্ষ্মণসেন, শান্তশীল—একটা বিশাল রাজনৈতিক সঙ্কটের সন্ধিস্থলে এই সমস্ত অশরীরী প্রেতমূর্ত্তিই জাতির ভাগ্য-নিয়ন্তা, ইহা ভাবিতে মন একটা ক্ষুব্ধ অতৃপ্তি ও অবিশ্বাসের ভারে পীড়িত হইতে থাকে—তাহারা বিশাল যবন-প্লাবন-তরঙ্গের উপর ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদের মতই প্রতীয়মান হয়। এক জপসাধনা-রত ব্রাহ্মণ ও এক রাজচ্যুত প্রণয়োন্মত্ত রাজপুত্র—যাহাদের পিছনে অর্থ ও লোকবলের কোনই পরিচয় পাই না—ইহারাই মুসলমান সাম্রাজ্যধ্বংসের প্রধান ও একমাত্র উদ্যোগী, ইহা মনে করিলে ডন্ কুইক্সোট ও সাঙ্কোপাঞ্জার কথাই মনে পড়ে। বিশেষতঃ যে হেমচন্দ্রের উপর মাধবাচার্য্য এত গভীর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, যাহাকে যবনজয়ের একমাত্র উপায় বলিয়া সমস্ত প্রণয় বিলাস হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কার্য্য কলাপ আলোচনা করিলে এই গভীর দায়িত্বের জন্য তাহার অনুপযুক্ততার কথাই আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। আবার পশুপতির প্রায় অননুমেয় নির্ব্বুদ্ধিতা, সম্পূর্ণভাবে উদ্যোগহীন অবস্থায় আপনাকে এবং দেশকে শত্রুহস্তে সঁপিয়া দেওয়া, আমাদের অবিশ্বাসকে একেবারে কাণায় কাণায় ভরিয়া তোলে। লেখক নিজেও এই ত্রুটি, এই অবিশ্বাস্যতাব বিষয়ে বেশ সচেতন ছিলেন, এবং পাঠকের বিদ্রোহ পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া একটা যেমন তেমন রকমের কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—'ঊর্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না'। বস্তুতঃ রাজনৈতিক সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই একটা অভিনয়োচিত অবাস্তবতা, একটা তীব্র-শ্লেষাত্মক (ironic) অসঙ্গতি ছায়াপাত করিয়াছে।

পক্ষান্তরে অবিশ্বাসের চরম সীমা অতিক্রমের পরে আমাদের মনে একটা বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। ভাবিয়া দেখিলে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই, যে আমাদের দেশে ইতিহাসের ধারাই এরূপ কয়েকটী ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, কোন যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস সমসাময়িক কয়েকটী প্রধান ব্যক্তির কার্য্যাবলীর সমষ্টি মাত্র। জনসাধারণ নামে যে ব্যক্তিটী, ইউরোপীয় ইতিহাসে তাহার প্রভাব প্রতি পদক্ষেপেই ব্যক্ত করিয়াছে, সে আমাদের দেশের ইতিহাসক্ষেত্র হইতে একেবারে নিশ্চিহ্নভাবেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের অতীতযুগের কোন গুরুতর রাজনৈতিক ঘটনার আলোচনা করিতে গেলেই, কয়েকটী ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত

বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাই আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, এবং ইহা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যে জনসাধারণের জাগ্রত, সচেষ্ট মনোভাব এই বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাগুলিকে ঐক্য-সূত্রে গাঁথিতে পারিত, তাহারা তাহাদের সমস্ত জীবনটাই এক অবিচ্ছিন্ন নিদ্রাঘোরে কাটাইয়া দিয়াছে; বিনীতভাবে আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছে, নিশ্চেষ্টভাবে মার খাইয়াছে, কিন্তু কোনও প্রকারে নিজেদের ইচ্ছাশক্তি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে নাই। আবার কবিকল্পনা যখন ইতিহাসকেই অনুসরণ করিয়া চলে, তখন কাল্পনিক চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের অপেক্ষা সজীবতর দেখিতে কিরূপে আশা করিতে পারি? ঐতি-হাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণসেনই যখন এত ক্ষীণজীবী, কেবল কুসংস্কার ও অক্ষমতার একটা মাংসপিণ্ড মাত্র, তখন কাল্পনিক চরিত্রগুলির মধ্যে দ্রুততর জীবন স্পন্দন ও গভীরতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আশা করা অনুচিত বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক চিত্রের যে অসম্পূর্ণতা আমাদের অসন্তোষ উৎপাদন করে, তাহার জন্য বঙ্কিম অপেক্ষা আমাদের ইতিহাসধারার বিশিষ্টতাই দায়ী।

কেবল কল্পনাশক্তির দ্বারা গুরুতর ঐতিহাসিক সংঘটনের যতদূর মর্ম্মোদ্ঘাটন করা যায়, তাহাতে বঙ্কিম কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মহম্মদ আলির সহিত পশুপতির গুপ্ত পরামর্শ, ও বক্তিয়ার খিলিজির শাঠ্য প্রকৃত ঐতিহাসিক spiritএর দ্বারা অনুপ্রাণিত। যবন বিপ্লব নামক অধ্যায়টী (চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ) উচ্চাঙ্গের বর্ণনা শক্তির পরিচয় দেয়। কিন্তু বঙ্কিমের কল্পনাশক্তির চরম বিকাশ, মানসিক বিপ্লব ও অন্তঃক্ষেপ ফুটাইয়া তুলিবার অতুলনীয় ক্ষমতার পরিচয়স্থল—'ধাতুমূর্ত্তির বিসর্জ্জন' নামক অধ্যায়টী (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ)। এই অধ্যায়টী জীবন্ত বর্ণনাশক্তিতে ও জ্বালাময় শব্দপ্রয়োগে Dickensএর সহিত তুলনীয়। 'মৃণালিনীতে' বঙ্কিমের কলাকৌশল ও চরিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব্বানুবৃত্তি

পঞ্চমশতাব্দীর ইউরোপ রোমীয় সাম্রাজ্য ও খৃষ্টীয় চার্চ্চের নিকট কি কি সভ্যতাসূত্র লাভ করিল, তাহা এতক্ষণ আলোচনা করা গেল। রোমীয় জগতের এই অবস্থায় টিউটন বর্ব্বরেরা আসিয়া রোমসাম্রাজ্য অধিকার করিল। সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবাবস্থায় যে যে উপাদান একত্র মিলিত ও মিশ্রিত হইল তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে এখন কেবল দেখিতে হইবে এই বর্ব্বর আগন্তুকেরা কি আনিয়া দিল।

মনে রাখিবেন যে বর্ব্বরদিগের ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, আমরা এখানে ঘটনাপরম্পরার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হই নাই। আপনারা অবশ্য জানেন যে, যে সকল বর্ব্বর জাতি এই সময় রোমসাম্রাজ্য জয় করিয়া লইল, তাহারা প্রায় সকলেই এক মূল জাতির শাখাপ্রশাখা। আলানাই (Alanai) প্রভৃতি দুই একটী স্লাভনিক জাতি ব্যতীত তাহারা সকলেই জর্ম্মান। তাহারা সকলেই প্রায় সভ্যতার একই স্তরে উপনীত। তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি রোমীয় জগতের সহিত অল্পবিস্তর সংস্পর্শে আসায় তাহাদের মধ্যে অবশ্য সভ্যতার কিছু তারতম্য ঘটিয়াছিল। যেমন গথ জাতি ফ্রাঙ্কদিগের অপেক্ষা নিশ্চয়ই উন্নততর ও শিষ্টতর ছিল। কিন্তু সাধারণ ভাবে বিচার করিতে হইলে, ইউরোপীয় সভ্যতার উপর প্রভাবের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, বর্ব্বরদিগের মধ্যে এই তারতম্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বিবেচনা করিতে হয়।

বর্ব্বর সমাজের সাধারণ অবস্থাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা বড়ই কঠিন। রোমীয় পৌরতন্ত্র বা খৃষ্টীয় চর্চ্চের স্বরূপ বুঝিতে আমাদের কোনই কষ্ট হয় না, কারণ তাহাদের প্রভাব এখনও পর্য্যন্ত চলিতেছে। বর্ত্তমান কালের বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, বহু ঘটনার মধ্যে এই প্রভাবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই সকল চিহ্ন চিনিয়া বা বুঝিয়া লইবার সহস্র উপায় আছে। কিন্তু বর্ব্বরদিগের রীতিনীতি ও সামাজিক অবস্থা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সেগুলিকে উদ্ধার করিতে হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন অথবা কল্পনার সাহায্য লইতে হয়।

বর্ব্বর প্রকৃতির যথাযথ স্বরূপ কল্পনা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে একটি মূলভাব, মূলতথ্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সেটী হইতেছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আনন্দ, সংসারের ও জীবনের নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে সতেজে ও স্বাধীনভাবে স্ফূর্ত্তি করিবার আনন্দ—শ্রান্তিবিরহিত কর্ম্মস্ফূর্ত্তির আনন্দ; সংশয়বৈষম্যবিপদসঙ্কুল জীবনযাত্রার যে আনন্দ তাহাই বর্ব্বরসমাজের প্রধান ভাব ছিল, এই আকাঙ্খার তাড়নায় বর্ব্বরেরা ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর বর্ব্বরদিগের মধ্যে এই ভাব যে কত প্রবল ছিল, তাহা আজকালকার সুনিয়ন্ত্রিত বিধিবদ্ধ সমাজপিঞ্জরের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন।

আমার মতে কেবল মাত্র একখানি গ্রন্থে বর্ব্বর জাতির এই বিশেষ লক্ষণ জীবন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ব্বরধর্ম্মী সমাজে মানুষ যে যে আকাঙ্খা উদ্দেশ্য ও প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় তাহা একমাত্র থিয়েরীপ্রণীত "নরমান কর্ত্তৃক ইংলণ্ডবিজয়ের ইতিহাস" নামক গ্রন্থেই হোমারসুলভ সজীবতার সহিত উপলব্ধ ও চিত্রিত হইয়াছে। বর্ব্বরপ্রকৃতি ও বর্ব্বরজীবনের এমন সুস্পষ্ট চিত্র আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমেরিকার অসভ্য জাতিদের লইয়া কুপার যে সব উপন্যাস লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও কতকটা এই ধরণের জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু আমার বোধ হয়, সেগুলি থিয়েরীর গ্রন্থের মত এত উৎকৃষ্ট নয়, এত সত্য নয়, এত সরল নয়। আমেরিকার অরণ্যচারী অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে, তাহাদের লোক-